শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

(১২৯৭ সালের ডায়েরী)

ধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত অবস্থার
কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত

তদীয় কৃপাভাজন
লদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক যথাযথভাবে লিখিত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—শ্রীমহানন্দ নন্দী
২০, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

ভাদ্র জন্মাষ্টমী,—১৩৩৩

দেড় টাকা মাত্র

শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গেণ্ডারিয়া-আশ্রম

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অসহ্য রোগযাতনা। জীবনে বিতৃষ্ণতা ; পরোক্ষে গুরুদেবের আহ্বান।

অহর্নিশ অবিচ্ছেদে নিদারুণ পিত্তশূল বেদনার অসহ্য যাতনায় আমার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মিল।

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ ১২৯৭।

ক্রমশঃ যন্ত্রণার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ সঙ্কল্প আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। শুনিয়াছি গুরুদেব এ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। স্থির করিলাম—তাঁহার কলুষনাশন মনোমোহন মূর্ত্তি চিরকালের মত একবার দেখিয়া, তাঁহার সেই স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া, পুণ্যতোয়া যমুনার সলিলে এই পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিব। জীর্ণ শরীরে এখন আর চলাফেরা করিবারও সামর্থ্য নাই ; অথচ শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে অস্থির হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে বিছানা হইতে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেও কেহ আমাকে উৎসাহ দেন না। তার পর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার খরচাদি কাহার নিকটেই বা চাহিব ? এই সময়ে পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল গুরুদেব দয়া করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইবে। অচিরে যে কোন প্রকারে আমার যাওয়ারও যোগাড় হইবে—এই ভরসায় কাতর প্রাণে তাঁহাকেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া! অভাবনীয়রূপে আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। জয় গুরুদেব! জয় গুরুদেব!

শ্রীযুক্ত মথুর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীমান সুরেন্দ্র বিলাতে যাইবেন বলিয়া, হায়দারাবাদে তাঁহার খুড়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে পড়াশুনা করিতেছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার পিতার নিকটে আসা আবশ্যক হওয়ায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের (রিটার্ণ) টিকিট করিয়া সম্প্রতি ভাগলপুরে আসিয়াছেন। আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া, গোপনে আমাকে টিকিটখানি দিয়া বলিলেন—"এখন আমার হায়দারাবাদে যাওয়া হইল না। মামা, আপনি এ টিকিটখানা নিন্। ইহাতে আপনি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন।" আমি টিকিটখানি পাইয়া, প্রকারান্তরে ইহা গুরুদেবেরই সস্নেহ আহ্বান ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অমনই শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এ সময়ে আমাকে বাধা দেওয়া বিফল বুঝিয়া, শ্রীযুক্ত মথুর বাবু

১০৲ টাকা ও মহাবিষ্ণু বাবু ৩৲ টাকা দিলেন। আমি দু'খানা জীর্ণ বস্ত্র, গামছা, একটি ঘটী এবং ডায়েরী লেখার সাজ-সরঞ্জাম ও একখানা হরিবংশ ঝোলায় বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলাম।

আমার স্বর্গীয়া ভগিনীর শিশু পুত্র-কন্যাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এতকাল আমারই উপরে ছিল। আজ তাহাদের ফেলিয়া চলিলাম ; বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা।

মনের উৎসাহে সারাদিন কাটাইয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, গাড়ীর সময় বুঝিয়া ষ্টেশনে রওয়ানা হইলাম। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া পদবিক্ষেপমাত্রেই সেই নিরুপম কাল রূপ বহুকাল পরে 'ঝিকিমিকি' করিয়া প্রকাশিত হইল। চার পাঁচ হাত অন্তরে, শূন্যে রহিয়া, ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপ সমান গতিতে আমার অগ্রে অগ্রে চলিল। দেখিয়া আনন্দে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌছিলাম। খালি গায়ে, কম্বল লইয়া, ভিখারী বেশে, ছেঁড়া ঝোলা হাতে লইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। জানি না সকলে আমাকে কি ঠাহরাইয়া হাঁ করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক আসিয়া টিকিট চাহিল এবং টিকিটখানা দেখিয়া, আমাকে এক সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে গাড়ী ছাড়িল। শ্রান্ত ছিলাম ; অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার নিদ্রার আবেশ হইল। এই সময়ে সেই কাল মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন। রাত্রিটি আজ বেশ আরামেই কাটাইলাম।

১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১২৯৭।

প্রয়াগধামের প্রভাব-অনুভূতি।

স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতেছি, গাড়িখানা প্রয়াগধামের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পূর্ব্ব দিকে বহুবিস্তৃত একটি ময়দানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ময়দানের দিকে দৃষ্টিমাত্র আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, উদাসভাবে প্রাণটিকে আমার অবসন্ন করিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে স্পষ্টরূপে আপনা আপনি 'অগস্ত্য' 'অগস্ত্য' শব্দ উঠিতে লাগিল। ভরদ্বাজ বশিষ্ঠাদি মহাতপা ঋষিগণ এক সময়ে এই স্থানেই ছিলেন, এই প্রকার ভাব মনে উদিত হওয়ায়, তাঁহাদের জন্য একটা শোক আসিয়া পড়িল। এই শোকে ক্রমে আমাকে এতই অভিভূত করিল যে, আমি কোন মতেই আর কান্না সংবরণ করিতে পারিলাম না। খালি গাড়িতে সুবিধা পাইয়া, ঋষিদের নাম লইয়া কতক্ষণ কাঁদিলাম। মনে হইল, যেন ঋষিগণ এই স্থানে থাকিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমি কারতভাবে তাঁহাদের চরণোদ্দেশে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে আর্য্য ঋষিগণ,আজ তোমরা আমাকে এভাবে কেন এত কৃপা করিলে ? আজ অকস্মাৎ তোমাদের কথা মনে পড়ায়, তোমাদের জন্য প্রাণ আমার এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল কেন ? আমি এ জীবনে কখনও তো তোমাদের কথা একবার ভাবি নাই। তোমাদের স্মরণ করিয়া মস্তক অবনত করি নাই। বোধ হয়, এই প্রান্তরই তোমাদের পুণ্য আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল ; তাই,

১৯শে আষাঢ়, ১২৯৭।

তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর নাই। অনন্ত স্তরবিশিষ্ট জগতের কোন এক সূক্ষ্ম স্তরে—এই প্রয়াগে তোমাদের পরম আদরের বস্তু, সাধনের ফলকে অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করিয়া, অদৃশ্য শরীরে অবস্থান পূর্ব্বক বুঝি এ স্থানেই তাহা সম্ভোগ করিতেছ। তোমাদের এই সাধের পুণ্য সাধনক্ষেত্রে আজ আমি শ্রদ্ধাশূন্য অন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশমাত্র আমার প্রতি তোমরা কৃপাদৃষ্টি করিলে, দয়া করিয়া তোমাদের কথা আমার চিত্তে উদিত করিয়া দিলে। আজ আমি চিরকালের মত ধন্য হইলাম। হে মূর্ত্তিমান্ দয়ারূপী ঋষিগণ, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাদের অনুগত হইতে পারি; অবিচলিত মনে তোমাদের সনাতন নির্ম্মল পথের অনুসরণ করিতে পারি; প্রাণের ঠাকুর গুরুদেবের শ্রীচরণে একনিষ্ঠ হইয়া যেন অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। আর কিছু চাই না। এই শুভ মুহূর্ত্তে তোমাদের কৃপায় শুভমতি হওয়ায়, আমার দুর্ব্বিনীত, উদ্ধত মস্তক তোমাদের চরণরেণুতে বিলুণ্ঠিত করিতেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।" ভাবুকতাই হউক বা কল্পনাই হউক, আমার মনে হইল, যেন ঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি স্থির হইয়া নাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেণ প্রয়াগধামে পৌঁছিল।

অতঃপর গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসন করিয়া আপন মনে নাম করিতে করিতে আশ্চর্য্য প্রকারে আমার ভিতরে একটা ভাবের স্রোত আসিয়া পড়িল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"আহা! আজ আমি কোথায়? এই সেই প্রয়াগধাম। এক সময়ে এই স্থানে কত কি হইয়াছিল! কত যোগী কত ঋষি এক সময়ে এই পুণ্য ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জলিত রাখিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কত সহস্র সহস্র ঋষি-মুনি-তপস্বী এক সময়ে এই স্থানে ধ্যান ধারণা সমাধিতে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া, যুগযুগান্তকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তীব্র তপস্যা ও একান্ত সাধন-ভজনদ্বারা অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সহিত সংযোগ হেতু অসীম শক্তি লাভ করিয়া কত দীর্ঘতপা যোগী ঋষি এই পুণ্য ভূমিতে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ সাধনশক্তি এই স্থানে সঞ্চারিত হইয়া ইহার প্রতি অণু-পরমাণুকে জীবন্ত শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে। এই পবিত্র ক্ষেত্রের সংস্পর্শে, বুঝি ঋষিদের অসাধারণ সাধনশক্তির বীজ অলক্ষিতভাবে জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়; এবং সেই অমোঘ শক্তির অঙ্কুরোদ্গমে জীব কোন না কোন কালে উদ্ধার হইয়া যায়। তাই ঋষিরা এই ভূমিকে মুক্তিধাম বলিয়াছেন। হে দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণের অপ্রাকৃত সাধনশক্তির খণ্ডিত ভাণ্ডার তীর্থরাজ প্রয়াগ, আমি অনুভব করি আর নাই করি, তোমার এই আনন্দঘন ধূলিকণা স্পর্শ করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম। তীর্থরাজ, আশীর্ব্বাদ কর, আজ পর্য্যন্ত তোমার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলের পদধূলি আমার মস্তকে পড়ুক।" এই ভাবে অভিভূত হইয়া, মাটিতে পড়িয়া প্রয়াগধামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। অমনি ভাবোচ্ছ্বাসের একটা প্রবল বন্যা কিছুক্ষণের জন্য আমার ভিতরে বহিয়া গেল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে একটি প্রয়াগবাসী ভদ্রলোক আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে আমি স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া যথাসময়ে ষ্টেশনে আসিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। গাড়িতে আমার কোনও কষ্ট হইল না; বেশ আরামে চলিলাম। জয় গুরুদেব!

জ্যোতির্ম্ময় শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিতি। গুরুদেবের দয়া।

সকাল বেলা হাত-মুখ ধুইয়া গাড়ির এক কোণে বসিয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণোদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া, খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। যতই মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম দু'দিকের বিস্তৃত ময়দান ও ঘন বন সকল দেখিয়া ততই প্রাণ যেন আমার কেমন হইতে লাগিল। যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায়, নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, একাকী, মাঠে ময়দানে, নির্জ্জন স্থানে আকুলভাবে কত কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি, যাঁহার বসতিস্থল শুনিয়া, লোকসঙ্গে এই স্থানে আসিতে কত আবদার করিয়াছি—আজ আমার ছেলেবেলার মানস-কল্পনার সেই শ্রীবৃন্দাবনে আসিলাম; ইহা মনে করিতেই আমার কান্না আসিয়া পড়িল। এই সময়ে দেখিলাম, দুই ধারের বনে ও ময়দানে অত্যুজ্জ্বল, নীলাভ, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড খণ্ড জ্যোতিসকল অসংখ্য বিদ্যুদাকারে ক্ষণে-ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া সুস্নিগ্ধ প্রভা বিকীর্ণ করিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই আবার বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই নয়নাভিরাম, মনোমোহন, কৃষ্ণবর্ণের তুলনা জগতে আর নাই। সে যে কি সুন্দর, মনোমোহন তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই! সেই বিচিত্র জ্যোতি বারংবার দর্শন করিয়াও, অন্তর্দ্ধানের পর আর কিছুতেই তাহা স্মরণে আনা যায় না। এই অনুপম দিব্য জ্যোতির খেলা দেখিতে দেখিতে আমি ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিলাম।

২০শে আষাঢ়।

বেলা প্রায় একটার সময়ে বৃন্দাবন-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় অনাহার ও অনিদ্রায় শরীর আমার অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল; বুকের বেদনাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে বেশী দূর চলিতে পারিলাম না; ২।১ মিনিট চলিয়াই রাস্তার একধারে ছায়া পাইয়া বসিয়া পড়িলাম। এই সময় চলন্ত গাড়ি হইতে একটি ভদ্রলোক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মহাশয় কোথায় যাবেন?" আমি বলিলাম—"গোপীনাথের বাগে।" ভদ্রলোকটি এই কথা শুনিয়া, গাড়ি থামাইয়া বলিলেন,—"আসুন, আপনি এই গাড়িতে উঠুন, আমিও সেইদিকেই যাব।" আমি গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি গোপীনাথের বাগে আসিয়া থামিল। আমি অমনই নামিয়া পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একজন ব্রজবাসী বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্যা বাবু, গোঁসাইজী কা পাছ যাওগে? চল, হামবি উহাঁই যাতা হ্যায়।" আমি ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ব্যস্ততাবশতঃ উঁহার পরিচয় নিতে বুদ্ধি আসিল না। একটি গলির মধ্যে কিছু দূর গিয়া একখানা বাড়ী দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যাও ওহি কুঞ্জমে গোঁসাইজী হ্যায়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ

অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। আমি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখি, আমার গুরুদেব কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"কি কুলদা এসেছ ? বেশ বেশ ! এসো। ঝোলা নিয়ে একেবারে উপরে এসো।"

আমি গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া দোতালায় উঠিলাম। ঝোলা রাখিয়া গুরুদেবের শ্রীচরণে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"শরীর অসুস্থ ; একটু বিশ্রাম কর। পরে, যমুনায় গিয়ে স্নান ক'রে এসো। আমাদের সকলের আহার হয়েছে। তোমার জন্যও প্রসাদ রয়েছে।" এই বলিয়া, গুরুদেব আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম ঠাকুরের সে আকৃতি আর নাই। সুবিশাল দেহটি শুকাইয়া গিয়া অসম্ভব দীর্ঘ দেখাইতেছে। সুন্দর নধর কান্তি এখন অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া, অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে শরীরের চর্ম্ম লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুগোল, সুন্দর, মুখমণ্ডল মাংসাভাবে 'চুপসিয়া' গিয়া দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। পূর্ব্বের সেই উজ্জ্বল বর্ণ আর নাই ; একেবারে কাল হইয়া গিয়াছেন। মস্তকে জড়ানো দীর্ঘ কেশরাশি একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ও কণ্ঠে তুলসী, পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহের কৃশতা দেখিয়া আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং অবাক্ হইয়া ঠাকুরের নূতন বেশ ও শীর্ণ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরের দেহের এইরূপ দুর্দ্দশা আর কখনও আমি দেখি নাই। একটু পরে গোঁসাই কুঞ্জের অধিকারী দামোদর পূজারীকে ডাকিয়া বলিলেন—"এঁকে, যমুনায় স্নান করায়ে নিয়ে এসো। পরে, খাবার যা আছে দিয়ে দাও।"

আমি 'ঝোলাঝুলি' আসন-কম্বল প্রভৃতি পাশের ঘরে রাখিয়া স্নান করিতে চলিলাম। এগারোটি টাকা ছিল ; তাহা খোলা ঘরে 'আল্‌গা' ভাবে রাখিয়া যাইতে ভরসা হইল না ; ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইলাম। যমুনার শীতল নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া বড় আরাম পাইলাম। আমার সঙ্গে যে টাকা আছে তাহা দামোদর দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি আমার কোমরের প্রতি টাকার দিকে ঘন ঘন লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, "এ এক বেশ উৎপাত হইল। যতকাল এই টাকা কয়টি আমার পুঁজি থাকিবে নানাপ্রকার অভাব জানাইয়া, এ ততদিন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। সুতরাং এই আপদ হইতে নিস্তার পাওয়াই ভাল। আমাকে তো এখন কিছুদিন এখানে থাকিতেই হইবে ; সুতরাং, এই এগারোটি টাকা ইহাকে দিয়া যদি আমার খাওয়া দাওয়ার একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লই, তাহা হইলে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি।" এই মতলব করিয়া, আমি টাকা কয়টি 'ট্যাঁক' হইতে খুলিয়া লইলাম ; এবং দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম, "পূজারীজী, আপনি এই টাকা কয়টি নিন। ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়া দিবেন ; আর

যতদিন আমি এখানে থাকিব, আমাকে একমুঠো প্রসাদ দিবেন। আমার আর একটি পয়সাও নাই।” টাকা পাইয়া পূজারীজী খুব খুসী হইলেন; এবং আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “আরে, তু তো বড়া ভকত্ হ্যায়! সব দে দিয়া! যেত্‌না দিন মন হোয়, রহো। খুব আচ্ছা আচ্ছা খিলাউঙ্গা। তেরা উপর রাধারাণীকা বহুৎ কৃপা।” আমি একটু হাসিলাম। অতঃপর, আমরা কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম।

দাউজীর মন্দিরের সংলগ্ন রান্নাঘরে দামোদর আমাকে বসিতে দিলেন। পরে, একখানা শালপাতায় সাজানো ডাল, ভাত, রুটি আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “গোঁসাই বাবা প্রসাদ পাওতে পাওতে এত্‌না সব উঠাকে রাখ দিয়া।” শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আহা, ঠাকুরের এত দয়া! আজই আমি যথার্থ প্রসাদ পাইলাম। এ প্রসাদ আমার পক্ষে অতিরিক্ত হইলেও, খুব আনন্দের সহিত রুচিপূর্ব্বক সমস্তটাই খাইলাম।

দণ্ডাঘাত।

আহারান্তে গোঁসাইয়ের নিকটে গিয়া বসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার দাদা কেমন আছেন? তাঁর সেই বন্ধু দেবেন্দ্র এখন কোথায়?

আমি বলিলাম—দাদা ভাল আছেন। সেই হ’তে দেবেন্দ্রের সহিত দাদার আর দেখাসাক্ষাৎ নাই। আপনার দণ্ডাঘাত না পড়্‌লে দাদাকে দেবেন্দ্র মেরেই ফেল্‌ত মনে হয়।

গোঁসাই। উঃ! কি ভয়ানক লোক! আর কিছুদিন ওখানে থাক্‌তে পেলে সে বিষম বিপদই ঘটাত, তোমার দাদার দফা শেষ কর্‌ত। জঘন্য মতলব সাধনের জন্য সে ওখানে ছিল। তোমার দাদা এ পৃথিবীর লোক নন; সংসারের কোন ধার ধারেন না; তিনি এ যুগেরই নন; সত্যকালের লোক। দেবেন্দ্রের সঙ্গে তোমার দাদার কোন ঝগড়া হয় নাই তো?

আমি। ঝগড়া কিছুই হয় নাই। আপনি দাদার নিকট হ’তে চলে আসার পর ল্যাঙ্গা বাবা ও পতিতদাস বাবা দাদাকে দেবেন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে বলেছিলেন। কিন্তু, দেবেন্দ্রের গুণে দাদা এত মুগ্ধ হ’য়েছিলেন, তার ধার্ম্মিকতা দেখে এতই ভুলেছিলেন যে, মহাত্মাদের আদেশ প্রতিপালনেও দাদার প্রবৃত্তি হ’ল না। দেবেন্দ্রের বশীকরণ বিদ্যা খুব অভ্যাস ছিল; তাতেই, বোধ হয়, দাদাকে একেবারে হাতের মুঠোয় ক’রে নিয়েছিল। পরে, আপনি যে দিন কাণপুর হ’তে তাহার উপর দণ্ডাঘাত কর্‌লেন, সেই দিনই দেবেন্দ্র অকস্মাৎ কেমন যেন হ’য়ে গেল; একেবারেই নিস্তেজ ও শক্তিহীন হ’য়ে পড়ল। ভিতরে তার যে কি হ’য়েছিল তা কেহই জানে না। সে দাদাকেও কিছু না বলে সেই সময়েই পালাল। শুন্‌লাম ফয়জাবাদ হ’তে ৫।৬ ক্রোশ দূরে, যমুনাতীরে একটা গ্রামে গিয়ে সে ছিল। ওখানে তার কঠিন রোগ হয়, অত্যন্ত ক্লেশ পায়। পরে নাকি উন্মাদ হ’য়ে কোথায়

চলে যায়। এখন সে মারা গিয়েছে না বেঁচে আছে, জানি না। কেহ কেহ বলে বেঁচে নাই। রোগের সময়ে ইচ্ছা করলেই তো সে দাদার কাছে আসতে পারত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে মতিও তার হয় নাই। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে হাজার হাজার টাকা দাদাকে ঠকিয়ে নিয়েছে। এমন কি, আমরা দাদার জীবনের পর্য্যন্ত আশঙ্কা করেছিলাম।

দাদার কথা গোঁসাই অনেকক্ষণ বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি নীচে যাইয়া দেখি, দাউজীর মন্দিরের সম্মুখে গুরুভ্রাতারা বসিয়া দাদারই কথা বলিতেছেন। ওসব বিষয় আমার পূর্ব্বে জানা ছিল; এখনও আবার সকলের মুখে শুনিলাম। গোঁসাই ফয়জাবাদ হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিবার সময়ে শিষ্যগণসহ কাণপুরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় কয়েক দিন ছিলেন। এক দিন সকালে চা-পানের পর গুরুভ্রাতারা সকলে গোঁসাইয়ের কাছে বসিয়া আছেন, কয়েকটি গুরুভ্রাতার নজরে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য পড়িল। তাঁহারা দেখিলেন, সাপের বেঙ গেলার মত, একটা পিশাচ ধীরে ধীরে দাদার পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল, আরও গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী (হরিমোহন) অমনই গোঁসাইয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"দয়া ক'রে রক্ষা করুন। হরকান্তকে পিশাচে গ্রাস করল।" গোস্বামী মহাশয় একই অবস্থায় স্থিরভাবে থাকিয়া একটু মৃদু মৃদু হাসিলেন। পরে বলিলেন— "আচ্ছা, আমার দণ্ডখানা এনে দাও তো!" একটি গুরুভ্রাতা তখনই দণ্ডখানি আনিয়া গোঁসাইয়ের সম্মুখে ধরিলেন। গোঁসাই দণ্ডখানা হাতে লইয়া, একবার মাটিতে একটু আঘাত করিয়া বলিলেন—"যাক, নিশ্চিন্তি।" ঠিক সেই দিন, সেই সময়েই দেবেন্দ্র হঠাৎ নির্ব্বিষ সর্পের মত একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। দাদা লিখিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবেন্দ্রের ভিতরে কি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। সে ক্লেশের হেতু আমাদের নিকটে প্রকাশ না করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছাতেই দেবেন্দ্রের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই সে আর এ মুখো হয় নাই। ইত্যাদি।

আমার উভয়সঙ্কট।

গুরুভ্রাতারা আমাকে বলিলেন—"ভাই, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছ, খুবই আনন্দের কথা। এখন কিছুদিন এখানে থাকিতে পারিলেই ভাল। যাঁর কাছে আসা, যাঁকে নিয়া থাকা, তিনি আর সেইমত নাই; সে গোঁসাই আর নাই; এখন তিনি অন্য প্রকার হইয়াছেন। সর্ব্বদাই বিষম উগ্রভাব ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছু বলুন আর নাই বলুন, বসার ঢং আর চোখের চাহনি দেখিলেই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সারাদিনেও একটিবার কাছে ঘেঁষিতে পারি না, কাছে বসিতে পারি না। যদি কখনও আমাদের কাহাকেও ডাকেন—ডাক শুনিলেই চমকিয়া উঠি। একবার পিছনে একবার সামনে তাকাইয়া, অবশেষে ধীরে ধীরে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গিয়া উপস্থিত হই। তার পর

কিসে কি হয় বুঝি না ; কথা তাঁহার সঙ্গে যাহাই হোক না কেন, পরিণামে বিষম ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসি। কাহারও সামান্য একটু ত্রুটি দেখিলে আর রক্ষা নাই—ভয়ানক শাসন করেন, কখনও কখনও কুঞ্জ হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তাই, ভয়ে ভয়ে আমরা প্রয়োজনমত কুঞ্জে থাকিয়া, অবশিষ্ট সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরি। তুমি, ভাই, একটু সাবধান হইয়া থাকিও। গোঁসাইয়ের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বদাই আমরা সশঙ্কিত আছি। পাছে ধাক্কা খাইয়া শীঘ্রই তোমাকে সরিয়া পড়িতে হয়, এই জন্যই এসব কথা বলিয়া রাখিলাম।" আমি বলিলাম—"কেন ? তোমরা গোঁসাইয়ের শান্তরূপ কি কখনও দেখ না ?" শ্রীধর বলিলেন—"তা দেখব না কেন ? শান্তভাবে যখন থাকেন তখন আবার এতই গম্ভীর হন যে, কাহার সাধ্য কাছে যায় ? অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। দু'টি ভাবই অতিরিক্ত। পূর্ব্বে কখনও গোঁসাইকে এই প্রকার অবস্থায় থাকিতে দেখি নাই। তাই বলি—সাবধান !"

গুরুভ্রাতাদের কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বেগে পড়িলাম। আমার বেদনার ব্যারাম, উঁহাদের মত বাহিরে বাহিরে ঘুরিবার আমার সামর্থ্য নাই ; চেষ্টা করিতে গেলেও অমনই শয্যাগত হইয়া পড়িব। সুতরাং আমার পক্ষে সেটি একেবারেই অসম্ভব। ভাবিলাম—

"না যাইলে বধে রাজা, যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের সনে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

আমার দশাও এই প্রকারই হইল, আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। যাহাই হউক, আমি গোঁসাইয়ের আসনের নিকটে গিয়া বসিলাম। এই সময়ে দামোদর পূজারী আসিয়া করযোড়ে গোঁসাইকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"বাবা, আপ্‌কা বচন সিদ্ধ্‌ হ্যায়। আপ্‌ সবিরে য্যায়সা কহা—ত্যায়সাহি হামারা মিল্‌ গিয়া। এই বাবু বড়া ভকত হ্যায়, বড়া সুপাত্র হ্যায়—হামকো এগারো রূপিয়া দিয়া।" গোঁসাই বলিলেন—দাউজী বড়ই দয়াল ! বেশ ক'রে প্রাণ ভ'রে তাঁর সেবা কর, দেখ্‌বে তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্‌বেন না। তা না হ'লেই মুস্কিল।

শুনিলাম, আজ ভোরবেলা দামোদর পূজারী গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—"বাবা, ভাণ্ডার শূন্য, আজ দাউজীর ভোগ কি প্রকারে হবে ?" গোঁসাই তখন বলিয়াছিলেন—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হ'য়ো না ; আজ তুমি কিছু পাবে।

শ্রীবৃন্দাবন বাসের বিধি।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর নিজ হইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে এসেছ, বেশ হ'য়েছে। এখানে তো কোন কাজকর্ম্ম নাই। এখন সারাদিন খুব সাধন ভজন কর। রাত্রে আহারান্তে তিন চার ঘণ্টা ঘুমায়ে নিও ; পরে, গভীর রাত্রে উঠে নাম ক'রো। গভীর রাত্রে সাধন ভজনের একটা বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই অনুভব করা যায়। এস্থানের তো কথাই নাই। কিছুদিন নিয়মমত বস্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, এই স্থান পৃথিবীর আর আর

স্থানের মত নয় একে অপ্রাকৃত ধাম বলে। এই ধামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে হ'লে, এস্থানের জন্য যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, তা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হয়। কোন তীর্থে বাস কর্‌তে হ'লেই সে স্থানের জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ বিধি নিষেধ আছে, তা প্রতিপালন ক'রে না চল্‌লে সে স্থানের যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। এস্থানে বাস কর্‌তে হ'লে, (১) হিংসা ত্যাগ কর্‌তে হয়, (২) পরনিন্দা বিষবৎ ত্যাগ কর্‌তে হয়, (৩) বৃথা কালক্ষেপ কর্‌তে নাই, (৪) অনিবেদিত বস্তু কখনও খেতে নাই, (৫) সর্ব্বদা সাধন ভজনে থাক্‌তে হয়। এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে কিছুকাল চল্‌লেই, এধাম যে কি, ধীরে ধীরে তা টের পাবে। দু'পাঁচ দিন এখানে থেকে যাঁরা চ'লে যান, তাঁরা আর এস্থানের মাহাত্ম্য কিরূপে বুঝ্‌বেন? গর্ভবতী স্ত্রী যেমন সুস্থ শরীরে নিয়মে থেকে দশ মাস পরে সন্তান প্রসব করেন, এসব স্থানেও সেইরূপ দীর্ঘকাল থাক্‌তে হয়। অন্ততঃ একটি বৎসরও নিয়মমত থাক্‌লে ধামের একটা প্রভাব বুঝ্‌তে পারা যায়। আমি তো এসব কিছুই জান্‌তাম না। পরমহংসজীর আদেশমত কিছুকাল এখানে বাস ক'রেই এখন দিন দিন স্থানের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ক'রে অবাক্ হচ্ছি। নিয়মমত খুব সাধন কর—বিশেষ উপকার পাবে। এ ধামের প্রভাব বড়ই চমৎকার।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"গর্ভধারণ ক'রে সুস্থ শরীরে থাক্‌লে দশ মাস পরে যেমন সন্তান প্রসব হয়, তীর্থের নিয়ম যথারীতি প্রতিপালন ক'রে দীর্ঘকাল তীর্থবাস কর্‌লে, তীর্থদেবতাই কি পুত্ররূপে প্রকাশিত হন?"

ঠাকুর বলিলেন—পুত্ররূপে ব'লে কথা নয়; তাঁর রূপেই তিনি প্রকাশ পান। গর্ভধারণের মত নিয়ম ধারণ ক'রে তীর্থবাস কর্‌তে হয়, তবে তো?

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আক্ষেপ ও শেষ কথা।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অকস্মাৎ দেহত্যাগের কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ব্রহ্মচারী মহাশয় আরও একশত বৎসর থাকিবেন, বলিয়াছিলেন। এত শীঘ্র তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন কেন? কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল?'

গোঁসাই। মৃত্যু কি আর মহাপুরুষদের হয়? রোগ—তা'ও একটা দেখাবার জন্য। ইচ্ছা ক'রেই তিনি দেহ ছেড়েছেন। বল্‌লেন—এখন তাঁর আর থাক্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁর থাকায় বরং আরও লোকের ক্ষতি হবে।

আমি বলিলাম—'ইচ্ছা ক'রে দেহ ছাড়্‌লেন কেন? দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

গোঁসাই। হাঁ, ঢের বলেছিলেন। দেহ ত্যাগ করার পূর্ব্ব রাত্রিটি তিনি এখানেই ছিলেন। সারা রাত আমার সঙ্গে তাঁর ঝগ্‌ড়া হ'ল। আমাকে বার বার জেদ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তুই আমার আসনে গিয়ে বোস্; আমি আর দেহে থাক্‌ব না।" আমি বল্‌লাম—'এক বৎসর এখানে থাক্‌ব সঙ্কল্প ক'রে আমি আসন ক'রেছি; আমার এধাম ছেড়ে যাবার যো নাই।' তিনি বল্‌লেন—"তবে আমি এ দেহ ছেড়ে দি?" আমি বল্‌লাম—'আপনার যা ইচ্ছা করুন। আপনার দেহের জন্য আমার একটুকুও মায়া নাই।'

আমি গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া বলিলাম—'আপনার সঙ্গে ঝগড়া হইল কোন বিষয় নিয়ে?'

গোঁসাই। আর কিছু নয়, তোমাদেরই বিষয় নিয়ে। ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে তাঁর কথা-বার্ত্তা শুনে তোমাদের মধ্যে কারো কারো ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়েছে। তাই তাঁকে বল্‌লাম যে, আপনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়ে কারোকে কারোকে অদৃষ্ট প্রারব্ধ ব'লে, ব'লে, তাদের মন বিগ্‌ড়িয়ে দিয়েছেন। তারা সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে অন্যপ্রকার হ'য়ে গেছে। এখন তাদের সংশোধন হওয়া শক্ত। লোকের তো এইরূপ উপকারই কর্‌ছেন! তিনি বল্‌লেন,—"আরে, যার যেমন সংস্কার, সে আমার কথা তেমনই বুঝে। আমি কি কর্‌ব? এক একজনে আমাকে এক একপ্রকার বলে। আমাকে কিন্তু কেউ বুঝ্‌লে না, চিন্‌লে না। আমার নিজের তো কোনও প্রয়োজন নাই, তাদেরই জন্য থাকা। তারাই যখন আমাকে চিন্‌লে না, আমার দ্বারা তাদের কোন উপকারই আর হবে না, তখন আর থেকে লাভ কি? আমি দেহ ছেড়ে দিই।" আমি দেখ্‌লাম, এবার বাস্তবিকই আর তাঁহার দ্বারা কারো কোন উপকার হবে না। তাঁর কথা সত্যই লোকে বুঝে না; তাঁর ভাব ও ভাষা অন্যপ্রকার। তাই তাঁকে থাক্‌তে আর অনুরোধ কর্‌লাম না।

আমি। ব্রহ্মচারীর ভাব আমরা বরং না বুঝ্‌তে পারি—কথাও কি বুঝ্‌তাম না?

গোঁসাই। বুঝ কোথায়? একটি লোক ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বল্‌লেন, 'মশায়, শাস্ত্র-বিধি অনুসারে স্ত্রীসঙ্গ কর্‌তে বলেছিলেন, তা তো আমি পারি না। আমার কাম অত্যন্ত বেশী। এখন আমি কি কর্‌ব? ব্রহ্মচারী তাঁকে বল্‌লেন, "যদি নাই পারিস, কি আর কর্‌বি? বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে, ব্যভিচার কর্ গিয়ে।" সেই লোকটি আমাকে এসে বল্‌লেন—"মশায়, ব্রহ্মচারী আমাকে বেশ্যাগমন কর্‌তে বলেছেন। মহাপুরুষের

কথামত কাজ করলে কখনই তো পাপ হবে না।” ও-কথা শুনে আমার সন্দেহ হ’ল। ‘ব্রহ্মচারী কখনও কি এমন কথা বল্‌তে পারেন ? ব্রহ্মচারীর কথার কখনও ঐ প্রকার ভাব নয়।’ আমি এই বলাতে সেই ভদ্রলোক পুনঃপুনঃ জেদ ক’রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—“মশায়, আমি মিথ্যা বল্‌ছি না। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, বেশ্যাগমন কর্‌ গিয়ে।” ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ’তে আমি তাঁকে বল্‌লাম, “আপনি এ সব কি করছেন ? আপনার উপদেশে যে লোকের সর্ব্বনাশ হবে, ধর্ম্মকর্ম্মে সকলে জলাঞ্জলি দিবে; স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে সমাজ উৎসন্ন যাবে। ‘বেশ্যা গমন কর্‌ গিয়ে’ ‘ব্যাভিচার কর গিয়ে’ ‘ঘুষ নে,’ আপনার এ সকল কথা ধ’রে লোকে যে বিষম কাণ্ড করবে!” শুনে ব্রহ্মচারী আমাকে বল্‌লেন, “আরে, তুই বলিস্‌ কি ? ও-শালারা আমার কাছে আসে কেন ? আমার কথা বুঝে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেন ? বিধিমত যারা স্ত্রীসঙ্গ করতে না পারে, তাদেরই ব’লে দি—‘ব্যভিচার কর্‌ গিয়ে’ ‘বেশ্যাগমন কর্‌ গিয়ে।’ তাই ব’লে কি অন্য স্ত্রীসঙ্গ করতে বলেছি, না বাজারের বেশ্যাগমন করতে বলেছি ? শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারই তো ব্যভিচার; শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ক’রে আপনার স্ত্রীগমনও বেশ্যাগমন। আমি তো এইপ্রকার ব্যভিচার, এরূপ বেশ্যাগমনের কথাই বলেছি।” একবার একটি ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়ে, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌লেন। ব্রহ্মচারী তাঁর সব কথা শুনে বল্‌লেন, “ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, তারই মুখে আমি মুতি।” এই কথা শুনে ব্রাহ্মটি অত্যন্ত বিরক্ত হ’য়ে চলে গেলেন। দশ জনার কাছে বল্‌তে লাগ্‌লেন, “ব্রহ্মচারী ভয়ানক পাষণ্ড, সে নাস্তিক। ঈশ্বরের মুখে হাগি মুতি এপ্রকার কথা সে বলে।” ব্রহ্মচারীকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন, “ওরে তিনি যে নিজেই খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলেছিলেন। তা হ’লে আমার ওকথা শুনে বিরক্ত হলেন কেন ? তিনি বল্‌লেন, ‘ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী।’ আমি বল্‌লাম, সেই ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, আমি মুতি। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হ’লে আমি হাগি মুতি কোথায়, তোরাই বল্‌ না ?” ব্রহ্মচারীর সকল কথাই এইপ্রকার ছিল। তাঁর কথা লোকে বুঝ্‌তে না পারায় অনেক গোল ঘটেছে।

আমি। তিনি আমাকে কত ভরসা দিয়াছিলেন! তিনি থাক্‌লে সে সব তো কর্‌তেন।

গোঁসাই। সেজন্য আর ভাবনা কি ? আমি আছি কেন ? তোমাদের যা বলি,

ক'রে যাও। তোমাদের যা কর্‌বার, আমিই তা কর্‌বো। সেজন্য আর কারো উপর তোমাদের ভরসা কর্‌তে হবে না। তোমাদের কিছুই অভাব থাক্‌বে না। সময়ে সবই পূর্ণ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রহ্মচারী মহাশয় কি আবার জন্মগ্রহণ কর্‌বেন?

গোঁসাই। হাঁ, তাঁর কাজ আছে। তিনি শীঘ্রই বুদ্ধদেবের মত পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে এই বুঝিলাম, যেন গোস্বামী মহাশয়ই ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সরাইয়া দিলেন। একটিবারও যদি ঠাকুর তাঁহাকে এ সংসারে থাকিতে বলিতেন, তাহা হইলে কখনও তিনি এত শীঘ্র দেহত্যাগ করিতেন না।

অবশেষে গোঁসাই বলিলেন—অনেকে তাঁর ভাব ও ভাষা না বুঝে বিপন্ন হয়েছেন। আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলেছিলাম, "যে ভাবে, যেরূপ কথা বল্‌লে সাধারণ লোকে আপনার যথার্থ ভাব বুঝ্‌তে পারে, সেই প্রকারে তাদের বলেন না কেন?" তাতে ব্রহ্মচারী বল্‌লেন—"বটে! এখন আমি তাদের ভাষা শিখ্‌তে যাব নাকি? ওসব লোক আমার কাছে আসে কেন? আমি তো কাউকে ডেকে আনি না।"

সদ্‌গুরুর কৃপা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

গুরুদেব আমাদের জীবনের অনন্ত উন্নতির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই পথে তিনি নিজেই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন, এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপরে যে নির্ভর করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার যথার্থই লজ্জা হইতে লাগিল। গোঁসাইকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ মনে আমি নাম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, "সমস্ত অভাব যদি গোঁসাই-ই পূর্ণ করিতে পারেন, তবে আর এত ভুগিতেছি কেন? যাঁর এত দয়া, তিনি কি কখনও অন্যের ক্লেশ দূর করিতে পারিলে তাহা না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন?" গোঁসাইকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম, এ সময়ে একবার আমার পানে তাকাইয়া নিজ হইতেই তিনি বলিতে লাগিলেন—খুব সাধন ক'রে যাও। এখন ফলাফলের দিকে মন রেখো না। সময়ে ফল পাবে। অসময়ে তো কিছুই হয় না। সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। দেখ, গাছে যে ফুল হয়, তার একটা সময় আছে। চাষারা যে চাষ করে, তারও একটা কাল ঠিক আছে; কাল অতিক্রম ক'রে কেহ কিছু করে না। দেখেছ তো—চাষারা বীজ বোন্‌বার পূর্ব্বে কত করে? সময় মত হালচাষ ক'রে ক্ষেতে আগাছা, গোড়া আবর্জ্জনা সকল পরিষ্কার

ক'রে বেছে ফেলে ; পরে বীজ বোনে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আবার সুন্দর ক'রে নিড়িয়ে দেয়। তবে সে সব গাছে তেজ হয়, ফসলও খুব সুন্দর হয়। যে সকল চাষা আগে ক্ষেত পরিষ্কার না করে, নানা প্রকার জঙ্গল আগাছা জন্মিয়া তাদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে। তখন চাষাদের আগাছা তুল্‌তে তুল্‌তে প্রাণ যায়, আর ওসব গাছের ফসলও ভাল হয় না ; চাষাদের তো দুর্দ্দশার একশেষ, ফসলের দফায়ও ইতি। সমস্তই এইপ্রকার জান্‌বে। যথাসময়েই চাষারা সমস্ত ক'রে নেয় ; অসময়ে কিছু কর্‌তে গেলে সেরূপ হয় না। যেমন বলা যায়, ক'রে যাও। অভাব কিছুই থাক্‌বে না। সময়ে সমস্তই হবে। খুব নাম কর।

গোঁসাইয়ের এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—তবে আর সদ্‌গুরুর আশ্রয় লোকে নেয় কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম—"সময়ে যার যা হবে তাহা তো হইবেই। সেজন্য চেষ্টা করি আর না করি, গুরুর সাহায্য হউক্ আর নাই হউক্ স্বভাবেই হবে। তা হ'লে আর সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে লাভ কি হ'ল? সদ্‌গুরু কৃপা ক'রে যখন তখনই কি একটা অবস্থা খুলে দিতে পাবেন না? সময়েই যদি সব হয় তবে আর 'কৃপা' শব্দের অর্থ কি?"

গোঁসাই বলিলেন—সদ্‌গুরুর কৃপায় সমস্তই হ'তে পারে ; আর গুরু যখন ইচ্ছা তখনই সব ক'রে দিতে পারেন—এ কথা যথার্থ। কিন্তু, তাতে লাভ কি? একটা বস্তুর মূল্য না জান্‌তে যদি তা সহজেই লাভ হয়, তা হ'লে সেজন্য যত্ন হয় না। যে বস্তুর জন্য যত অভাব-বোধ, তা লাভ হ'লে তাতে ততই দরদ ; যে বস্তুর অভাবে যত ক্লেশ, সে বস্তুর লাভে ততই আনন্দ। গুরু হঠাৎ একটা অবস্থা দিলে তার আর মর্য্যাদা বুঝা যায় না! এইজন্য সাধন ভজন করে, যখন লোকে বুঝে একটা অবস্থা লাভ করা কত শক্ত, উহা কত দুর্ল্লভ, তখন গুরু কৃপা করে ঐ অবস্থা দেন। বস্তুর মূল্য জানিয়ে গুরু তা শিষ্যকে দেন—এই-ই নিয়ম।

আমি বলিলাম—"বস্তুর মর্য্যাদা কর্‌তে না পারলে, বস্তুর মর্য্যাদা না বুঝ্‌লে তাহা আমি যেন পাই না। যে বস্তু পেয়ে আবার হারাতে হবে তাও আমি চাই না। আমার ভিতরে আবর্জ্জনা সব দূর করে দিন, তাহা হ'লেই বেঁচে যাই। গুরুর কৃপায় যখন সমস্তই হবে তখন আমার কি আর কিছু কর্‌বার আছে?"

গুরুদেব আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"যা বলি তা'ই ক'রে যাও। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে, খুব চেষ্টা কর। নামসাধনের মত এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আমার নিজের জীবনে নামসাধনের ফল পেয়েছি। একবার তেমন ভাবে নামসাধন ক'রে দেখ দেখি, কেমন ফল না পাও। প্রথম প্রথম নাম করতে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয় ; কিন্তু তাই ব'লে

ছাড়্তে নাই। বিরক্তি বোধ হয়, হ'লই বা ? তাতে কোনও ক্ষতি নাই। খুব নাম ক'রে যাও। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করায় বড় উপকার। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌লে প্রারব্ধ ক্রমে ক্রমে কেটে যায়। তখন ভাল ভাল অবস্থাও লাভ হ'তে থাকে। প্রারব্ধ ক্ষয়ের এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া, দাউজীর মন্দিরের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। একটু পরে দাউজী ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হইল। আমার ভাল লাগিল না। আমি আবার উপরে যাইয়া বসিলাম। বেদনার যাতনা খুব হইতে লাগিল।

গোপীনাথজীর মন্দিরে মহোৎসব। ঠাকুরের নৃত্য।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, কুঞ্জ হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হই নাই। শুনিলাম, আজ শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হইবে। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ সেই উৎসবে সম্মিলিত হইবেন। একটু বেলা হইলে, গুরুদেবের সঙ্গে আমরা মন্দিরের দিকে চলিলাম। রাস্তায় একটি বৃহৎ সঙ্কীর্ত্তন আসিতেছে দেখিলাম। গোঁসাই, সঙ্কীর্ত্তন উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, বিস্তৃত পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। করযোড়ে, সতৃষ্ণ নয়নে কীর্ত্তনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোঁসাইয়ের আপাদমস্তক থর থর কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিয়া কীর্ত্তনটি গোঁসাইয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবগণ গোঁসাইকে দর্শন করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোঁসাইকে পরিক্রমণ পূর্ব্বক মহা উল্লাসের সহিত, মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গোঁসাই তখন সম্মুখের দিকে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক, উচ্চৈঃস্বরে— "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন" বলিতে বলিতে পড়িয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তনের বহুসংখ্যক পৃথক্ দল মহা উৎসাহে মিলিত হইয়া, গোঁসাইকে বেষ্টন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। গোঁসাই ব্রজের রজে পুনঃপুনঃ গড়াইয়া, ধূলিধূসরিত অঙ্গে এই সময়ে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে, খোল করতালের তালে তালে দু'চার বার পা ফেলিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। "জয় হে! জয় হে!" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপন পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি মল্লবেশে নৃত্য করিয়া সেই জনসঙ্কুল, বিস্তৃত রাজপথে, বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। জানি না, কি প্রকারে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে গোঁসাইয়ের সেই প্রকাণ্ড দেহটি বায়ুভরে যেন উড়িতে লাগিল। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে যখন যে দিকে গোঁসাই ছুটিলেন, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবল তুফান উঠিয়া সে সকল দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোঁসাইয়ের ঘন ঘন হুঙ্কার ও মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি শুনিয়া সকলে যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ ভাবাবেশে 'বেহুঁস' হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে গোঁসাই কীর্ত্তনস্থলে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিয়া, স্থানে স্থানে এক একবার চকিতের মত দাঁড়াইয়া, অমনই সম্মুখের দিকে হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক,

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর পুরাতন মন্দির।

১৪ পৃঃ
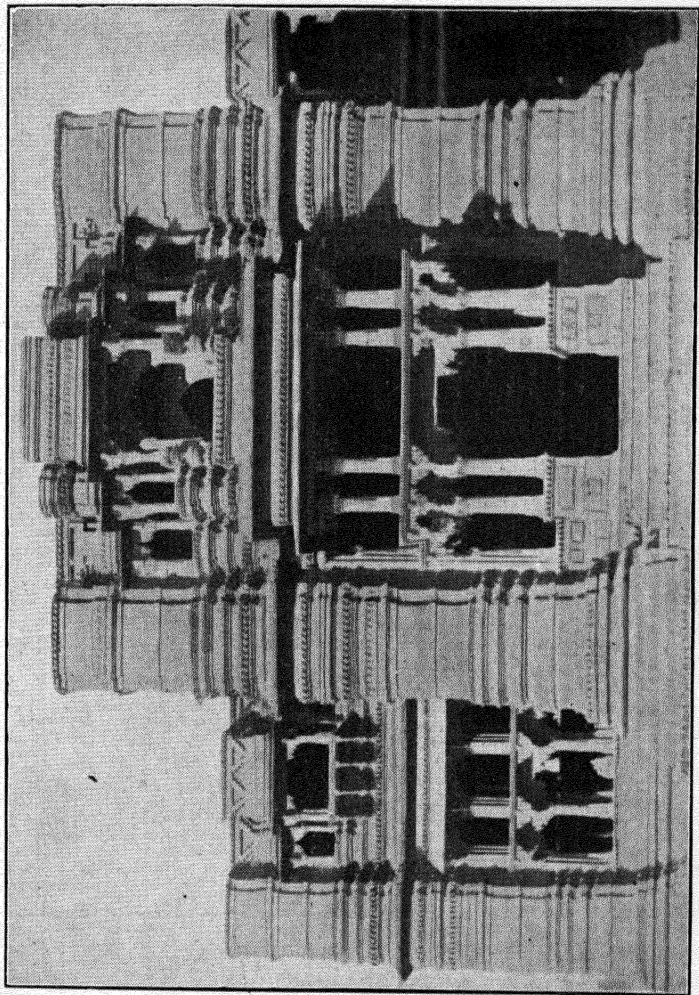
"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন !" বলিতে বলিতে ভূমিতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। ব্রজের রজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তখনই আবার লাফাইয়া উঠিলেন; এবং অধিকতর উদ্যমের সহিত হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবোন্মত্ত শ্রীধর উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বহির্ব্বাস কম্বল উড়াইয়া গোঁসাইয়ের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উঁহার হুঙ্কার গর্জ্জন ও অদ্ভুত আস্ফালনে বৈষ্ণব বাবাজীরাও মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিচিত্র ভাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি পশ্চাদ্দিকে সরিয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমার পিছন দিকে চাহিয়া দেখি গোঁসাই-নন্দন শ্রীমৎ যোগজীবন দৌড়াইয়া আসিতেছেন। যোগজীবন ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আছেন, ইহাই জানি; অকস্মাৎ তাঁহাকে এ সময়ে কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। সঙ্কীর্ত্তনস্থলে গোঁসাইকে দেখিয়া, যোগজীবন মত্ত হইয়া উঠিলেন। বহুদূর হইতেই ঠাকুরকে ধরিবার জন্য হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক বারংবার অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, মাতালের মত স্খলিত-পদে, চলিতে গিয়া পদে পদে দক্ষিণে বামে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমি যোগজীবনকে ধরিয়া রহিলাম। এই সময়ে গোঁসাই হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যোগজীবনের প্রতি ক্ষণকাল স্থির ভাবে দৃষ্টি করিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। যোগজীবন 'ঢুলু ঢুলু' নেত্রে গোঁসাইয়ের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র তাকাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

গোঁসাই সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভাববিহ্বল যোগজীবনকে লইয়া একটু পরে আমিও তথায় উপস্থিত হইলাম। মন্দিরাঙ্গনে যাইয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াই গোঁসাই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেলা ৩টা পর্য্যন্তও গোঁসাইয়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সমাধিভঙ্গের পর গোঁসাইকে লইয়া আমরা সকলে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম।

মাঠাকুরাণীর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন। দাউজীর মন্দির।

শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী তাঁহার ছোট ভগিনী কুতুবুড়ী (শ্রীমতী প্রেমসখী) ও জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী যোগমায়া দেবীকে লইয়া অদ্য শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই উঁহাদিগকে দেখিলাম। মাঠাকুরাণীকে পাইয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হইলাম। মা'ও আমাদের সকলকে খুব আদর করিলেন। গোঁসাই কিন্তু মাঠাকুরাণীর সঙ্গে তেমন ভাবে কোনও কথাবার্ত্তা বলিলেন না। সাধারণ ভাবে দু'চার কথায় গেণ্ডারিয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজ আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শুনিলাম, মাঠাকুরুণ এবার গোঁসাইকে কোন প্রকারে সংবাদ না দিয়াই এখানে আসিয়াছেন। গোঁসাইয়ের শরীরের দুরবস্থা মাঠাকুরুণ বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অনেক অসুবিধা ঘটিবে বুঝিয়াও, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। মাঠাকুরুণ গোঁসাইয়ের দেহের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীতে আমাদের থাকিবার সুব্যবস্থা গোঁসাই নিজেই করিয়া দিলেন। নাচে আমাদের থাকিবার স্থান নাই। বাড়ীটি খুব ছোট। সমস্ত বাড়ীতে আন্দাজ ৫।৬ কাঠা জমি। এই বাড়ীর পূর্ব্বদিকে সদর দরজা। এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখেই ১০।১২ হাত অন্তরে পূর্ব্বদ্বারী দাউজী ঠাকুরের মন্দির। সম্মুখে একটি বারেন্দা আছে। মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নতলে মাত্র দুই-খানি ঘর। একখানি ঘর অপেক্ষাকৃত একটু বড়; তাহাতেই ভোগরন্ধন ও প্রসাদ পাওয়া হয়; পশ্চাৎ দিকের ছোট ঘরে একটি ব্রহ্মচারী থাকেন। ব্রহ্মচারীর ঘরের পাশ দিয়াই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটি উপরের লম্বা বারেন্দার পশ্চিম দিকে উঠিয়াছে। বারেন্দার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিন-খানি ঘর। সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথম ঘরখানিতেই গোঁসাইয়ের আসন। কোনও জানালা না থাকায় এই ঘর দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার থাকে। এই ঘরের দরজার ঠিক পূর্ববারে উক্ত বারেন্দাতেই গোঁসাইয়ের আসন সারাদিন পাতা থাকে। উত্তরমুখী হইয়া গোঁসাই উদয়াস্ত এই আসনেই স্থির ভাবে বসিয়া থাকেন। বাড়ীর উত্তরাংশে যৎকিঞ্চিৎ খোলা জমি পড়িয়া থাকায় বারেন্দা হইতে দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। গোঁসাইয়ের আসনঘরের পূর্ব্ব দিকে, অর্থাৎ মধ্যের ঘরখানায়, আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। সর্ব্বশেষের পূর্ব্ব দিকের ঘরে কুতুবুড়ী ও যোগজীবনকে লইয়া মাঠাকুরাণী থাকিবেন। আমাদের ঘরেও তেমন আলো প্রবেশ করে না। এজন্য দিনের বেলায় মাঠাকুরাণীর ঘরে আমরা ইচ্ছামত থাকিতে পারিব। মাঠাকুরাণীর ঘরের পূবদিকে একটি বড় জানালা থাকায় ঘরখানা বেশ পরিষ্কার। এই ঘর গোঁসাইয়ের আসন হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ বলিয়া, আমাদের কথাবার্ত্তা বলিবারও বেশ সুবিধা হইয়াছে।

ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টিতে উৎকট রোগের শান্তি। নানাকথা।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আমার পিত্তশূল রোগের কিছুই উপশম বুঝিতেছি না। রাত্রে নিদ্রা না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষম যন্ত্রণাদায়ক শূলের বিরাম নাই। বিকালবেলাও গোঁসাইয়ের কাছে একটু বসিতে পারি না; বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয়। যেদিন বৃন্দাবনে আসিয়াছি সেইদিন হইতে এ বেদনার যন্ত্রণা আরও যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। গোঁসাই আমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল দেখিয়া, নিজের খাওয়ার সামান্য পরিমাণ দুধটুকুরও অর্দ্ধেকটা প্রতিদিন আমাকে দিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার খাওয়ার সামান্য পরিমাণ দুধের অর্দ্ধেকটা আবার আমাকে দেন কেন? আমার দুধের কোনও দরকার নাই।"

২২শে আষাঢ়,
রবিবার।

গোঁসাই বলিলেন—"ছেলেবেলা থেকে তোমার দুধ খাওয়া অভ্যাস। এখন না খেলে অসুখ হ'তে পারে।" আমি খাইতে না চাহিলেও, গোঁসাই জেদ্‌ করিয়া প্রত্যহ আমাকে দুধ দিতেছেন।

প্রত্যূষে যমুনায় স্নান করিয়া আসিয়া গোঁসাইয়ের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। একটু

বেলা হইতেই আমার বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। পাছে গোঁসাই জানিতে পারেন এই ভয়ে, বেশীক্ষণ দম ধরিয়া এক একবার ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। গোঁসাই সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি দু' তিনবার গা ঝাড়া দিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। পরে, সস্নেহে আমাব দিকে চাহিয়া, ছল ছল চক্ষে বলিলেন—“উঃ! তুমি এত ক্লেশ পাচ্ছ। আচ্ছা, তোমায় আর ভুগ্‌তে হবে না।” এইমাত্র বলিয়া তিনি দু' তিনবার আমার দিকে তাকাইয়া আবার চোখ বুজিলেন। গোঁসাইয়ের মুখটি এ সময়ে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তিনি আবার সমাধিস্থ হইলেন।

আমার বেদনার কথা এখানে কেহ জানেন না। গোঁসাই ইহা কি প্রকারে জানিলেন? এবং ‘আর ভুগিতে হইবে না,’ এ কথাই বা বলিলেন কেন? এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমি নীচে চলিয়া গেলাম।

আহারান্তে ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিতেছি, একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে ধীরে ধীরে, জানি না কখন, বেদনাটি আমার কমিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে, বেদনা একেবারে নাই দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, ‘এ আবার কি হইল? এতকাল যাবৎ যে দুঃসহ যন্ত্রণা অবিচ্ছেদে ভোগ করিয়া আসিতেছি, অকস্মাৎ তাহা কোথায় গেল?’ আমি এই অসম্ভব সংঘটন দেখিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মনে হইল, ‘বুঝি এ আমার গুরুদেবেরই কৃপা।’ যাহা হউক, যথার্থই বেদনা সারিয়া গেল কি না, পরিষ্কার বুঝিবার জন্য রাত্রিতে অতিরিক্ত মাত্রায় রুটি ও অড়হরের ডাল এবং প্রচুর পবিমাণে লঙ্কা ও টক খাইলাম। কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমার আরামে নিদ্রা হইল; বেদনার লেশও অনুভব করিলাম না।

২৪শে আষাঢ়, সোমবার; ৭ই জুলাই।

আজ সকালে যমুনায় স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, গুরুদেব স্বীয় আসনে স্থির ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেহারাটি একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মুখ-শ্রী দেখিয়া আমার বুক যেন ফাটিয়া গেল। অমনি হাতের বস্ত্র ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম। ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, “আমার রোগ নিয়া আপনি কাল হইয়া গেলেন! আমার রোগ আমাকেই দিন; উহা আমিই ভুগিব।” ঠাকুর আমার হাতখানা ছাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—“ও কি? অমন কর্‌ছ কেন? ভোগ-টোগ ও সব কিছুই তো নয়। কাহার ভোগ কে নেয়!”

এইমাত্র বলিয়া ঠাকুর চক্ষু বুজিলেন। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসরও পাইলাম না। বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, “আহা! ঠাকুর আমার জন্য কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!” ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন,—“এ রোগ প্রারব্ধের, ভোগেই শেষ হবে। এখন হাত বুলায়ে সারাইয়ে দিতে পারি; কিন্তু তা হ'লেও জন্মান্তরে আবার ভুগ্‌তে হবে।”

আহা। তখন আমি যদি ব্রহ্মচারীর কথায় রাজি হইতাম, বুকে হাত বুলাইতে দিতাম, তা হ'লে এখন আমার ঠাকুরের বুকে এই দারুণ শেল পড়িত না। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার এই ক্লেশ অধিক বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার এই দয়া জীবনে না ভুলি। আমাকে সুস্থ ও শীতল রাখিতে এই ভয়ঙ্কর ভোগ লইয়া নিজ বুকে আগুন ধরাইলে, এ কথা স্মরণে রাখিয়াই যেন আমার এ জীবন শেষ হয়।"

আহারান্তে কিছু সময় গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে গল্পে কাটিয়া যায়। প্রত্যহ ৩টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে হরিবংশ পাঠ করিয়া থাকি। ঠাকুর উহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হন। আমি পাঠের সময়ে ঠাকুরকে বড়ই বিরক্ত করি। হরিবংশের তত্ত্বকথা আমি কিছুই বুঝি না। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব কথা তো কিছুই বুঝি না। শুধু শুধু পড়িয়া গেলে লাভ কি?"

ঠাকুর বলিলেন—এখন শুধু পড়েই যাও। সাধনেতে ক'রে যখন এ সব তত্ত্ব প্রকাশ পাবে, তখন এ সব বুঝ্‌বে। একবার পড়ে রাখা ভাল।

আমি। তত্ত্ব প্রকাশ হ'লে তখনই তো সব জান্‌ব। তবে আর এখন পড়া কেন?

ঠাকুর বলিলেন—"না, পড়া থাকা ভাল। প্রত্যক্ষ হ'লে তখন এ সকল শাস্ত্র পুরাণের লেখা দেখে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।"

আমি। যদি বিশ বৎসর পরে একটা বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তা হ'লে তার প্রমাণ কোন্ গ্রন্থে কোথায় কোন্ অংশে আছে তাহা মনে হবে কিরূপে?

ঠাকুর—একবার পড়া থাক্‌লে, প্রত্যক্ষ বিষয়টি কোথায় পড়া হয়েছিল বিশ বৎসর পরেও তা স্মরণ হয়।

ঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। ঠাকুর প্রত্যহই বিকাল বেলা শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠ শুনিবার জন্ম শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী যান। উক্ত গোস্বামী মহাশয় স্বয়ংই উহা পাঠ করিয়া থাকেন। আমরাও সকলে ঠাকুরের সঙ্গে গিয়া থাকি। এরূপ ভাগবতপাঠ নাকি শ্রীবৃন্দাবনে কেহ শুনেন নাই। এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে উক্ত গোস্বামী মহাশয় একঘণ্টাও কাটাইয়া দেন। ঠাকুর বলিলেন—গ্রন্থপাঠের সময়ে ওঁর ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তি যেন মুর্ত্তিমান্ হ'য়ে প্রকাশ পায়। এরকম অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজকাল শুনা যায় না।

শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয় ঠাকুরকে কাকা বলিয়া ডাকেন, বড়ই ভক্তি করেন।

কথাপ্রসঙ্গে আজ এক সময়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, আমাদের বিষম মানসিক ভোগগুলি আপনি গ্রহণ করেন। প্রারব্ধের উৎকট দৈহিক ভোগও কি আপনাকে ভুগ্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওরে বাপু, সবই ভুগ্‌তে হয়।"

গোঁসাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ।

২৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার।

গোঁসাইয়ের শরীরের অবস্থা অতিশয় খারাপ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মাঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। গেণ্ডারিয়া ত্যাগ করিয়া মা-ঠাকুরাণী এ সময়ে যাহাতে এখানে না আসেন, এজন্য ঠাকুর পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও, মাঠাকৃরুণ না আসিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। গোঁসাইয়ের শরীরের অবস্থা অবগত হইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন! কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি মাঠাকৃরুণ যেন ভয়ে ভয়ে আছেন; গোঁসাইয়ের নিকটে যান না, বসেন না। ঠাকুরও মাঠাকৃরুণকে কোন প্রয়োজনে ডাকেন না। মাঠাকৃরুণ সারাদিন নিজের ঘরেই বসিয়া থাকেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন কথাবার্ত্তা বলেন না। আজ রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে মাঠাকৃরুণ সাহস করিয়া গোঁসাইয়ের আসনের নিকটে গিয়া বসিলেন; এবং ধীরে ধীরে গোঁসাইকে বাতাস করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে গোঁসাই দারুণ গরমে আসনঘরে থাকিতে পারেন না; দিনের বেলা যেখানে থাকেন, সেই বারেন্দার আসনে বসিয়াই রাত কাটাইয়া দেন। আমিও গরমে অন্ধকূপ ঘরে থাকিতে না পারিয়া বারেন্দায়ই থাকি। গোঁসাইয়ের আসন হইতে প্রায় তিন হাত অন্তরে আমার বিছানা। গোঁসাই-ই আমাকে ঐ স্থানে শুইতে বলিয়াছেন। আমি যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন একই ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, গোঁসাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ শুনিতে লাগিলাম। শ্রীমতী শান্তিসুধা (ঠাকুরের বড় কন্যা) গর্ভবতী; বুড়া ঠাকুরাণী (গোঁসাইয়ের শাশুড়ী ঠাকৃরুণ) অসুস্থা; যোগজীবনের স্ত্রীও ছেলে মানুষ; এ অবস্থায় উঁহাদিগকে গেণ্ডারিয়ায় রাখিয়া মাঠাকুরাণীর আসা ঠিক হয় নাই, গোঁসাই পুনঃপুনঃ এ কথা বলিতে লাগিলেন, এবং মাঠাকুরাণীকে অবিলম্বে আবার ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার জন্য 'জেদ্' করিতে আরম্ভ করিলেন। মা-ঠাকৃরুণ বলিলেন যে গোঁসাইয়ের শরীর এখন যে প্রকার অসুস্থ ও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, গোঁসাইকে এ ভাবে রাখিয়া কিছুতেই তিনি এখন অন্যত্র যাইবেন না। তিনি শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া তীর্থ করিতে আসেন নাই, ঠাকুরের সেবা করিতেই আসিয়াছেন এবং সেবাই করিবেন। এইপ্রকার কথা কাটাকাটিতে ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইল। গোঁসাই তখন একটু তেজের সহিত মাঠাকৃরুণকে বলিলেন—

আমি যে আশ্রম নিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌লে সে আশ্রমের মর্য্যাদা থাকে না। তোমার শ্রীবৃন্দাবনে থাক্‌তে হ'লে, অন্যত্র গিয়ে থাক। এ কুঞ্জে থাক্‌তে পার্‌বে না। এতে তুমি যদি জেদ কর, আমি অন্যত্র চলে যাব, উত্তর কুরুতে চলে যাব।

মাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান।

ভোর বেলা যথাসময়ে ঠাকুর উঠিয়া শৌচে গেলেন, আমরাও সকলে নীচে আসিলাম। যোগজীবন, সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি একে একে সকলেই স্নানে গেলেন। আমিও মুখ ধুইয়া যমুনায় যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময়ে মাঠাকুরুণ নীচে আসিলেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কি কুলদা, যমুনায় যাবে না?" আমি বলিলাম—"হাঁা যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?" মাঠাকুরুণ বলিলেন—"আমি যাব। তা তুমি যাও না? তোমার ঘটীটি আমাকে দাও।" এই বলিয়া, মা আমার হাত হইতে ঘটী নিয়া, ৮।১০ হাত অন্তরে কূয়ার পাড়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে কুলকুচি করিতে করিতে এক একবার আমার পানে তাকাইতে লাগিলেন। আমি স্নানে যাইব; ৫।৬ সেকেণ্ডের জন্য একটিবার ঠাকুর প্রণাম করিয়া, মাথা তুলিয়া দেখি, মাঠাকুরুণ নাই! কূয়ার পাড়ে ঘটীটি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঠাকুরাণীকে না দেখিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল; ভাবিলাম। 'এত শীঘ্র মা কোথায় গেলেন? এই তো তিনি এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। যাওয়ার পথও তো কোন দিক্ দিয়াই নাই! দেওয়াল ঘেরা বাড়ী, চারিদিক পরিষ্কার! সদর দরজা দিয়া যাইতে হইলেও তো আমারই পাশ দিয়া যাইবেন।' আমি ঘটীটি তুলিয়া লইয়া, এই সব ভাবিতে ভাবিতে যমুনায় চলিয়া গেলাম। যমুনায় স্নান করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র যোগজীবন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি! তুমি মাকে কোথায় রেখে এলে, মা এলেন না?"

২৬শে আষাঢ়
বুধবার।

আমি বলিলাম—"কৈ, মা আমার সঙ্গে যান নাই তো। তিনি কি আমাদের কুঞ্জে নাই?" যোগজীবন "না" বলিয়া, অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন গত রাত্রির কলহ-বিবরণ সকলকে বলিলাম। সকলেই অনুমান করিলেন—ঠাকুরের প্রতি রাগ করিয়া মাঠাকুরুণ কোন কুঞ্জে হয় ত গিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমরা যখন দেখিলাম মা আসিলেন না, তখন শ্রীধর, সতীশ, স্বামিজী, যোগজীবন এবং আমি অস্থির হইয়া মাঠাকুরুণকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। সকাল ৬।। টা হইতে বেলা ১ টা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, রাস্তায়, ঘাটে, মন্দিরে, বাগানে ও যমুনাতীরে সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া মাঠাকুরুণকে তল্লাস করিলাম; কিন্তু, কোথাও তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। পরিচিত সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। বেলা ১টা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃন্দাবনে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ক্লান্ত হইয়া আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। নীচে বসিয়া সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, 'এখন কি করা যায়?' যোগজীবন ও শ্রীধর পুনঃপুনঃ আমাকে জেদ করিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি গিয়ে মা'র বিষয় গোঁসাইকে বল। আজ তিনি এমন গম্ভীর হইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছে যাইতে আমাদের একেবারেই সাহস হয় না।" আমি অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া, ধীরে ধীরে ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিলাম, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর
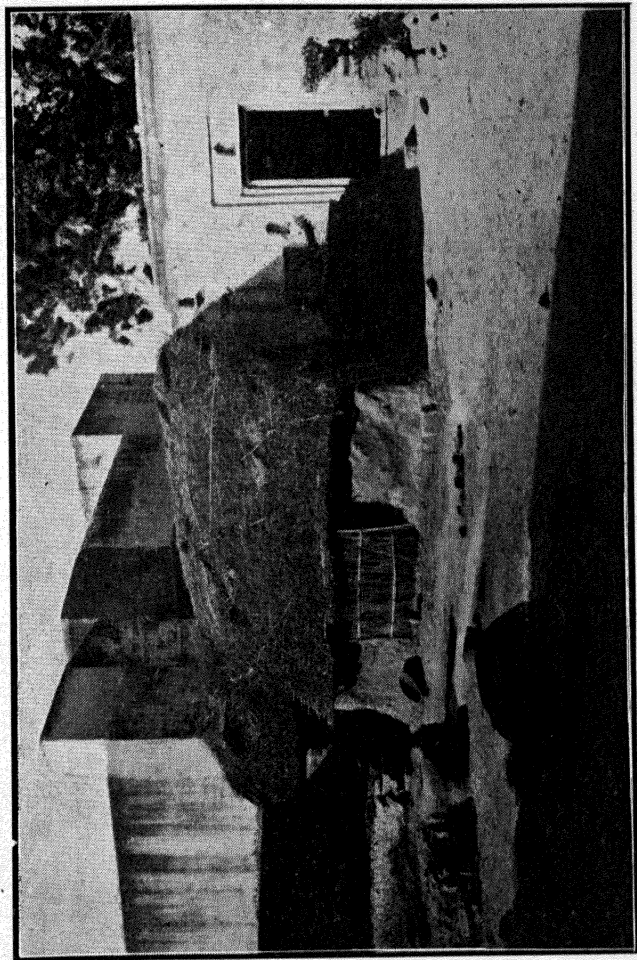
দাউজী ঠাকুরের মন্দির—দামোদর পূজারীর কুঞ্জ। ২০ পৃঃ

চোখ মেলিলেন। আমিও অমনি বলিলাম—"মাঠাকৃরুণকে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি তো একাকী কখনও কুঞ্জ হইতে কোথাও যান না। কিন্তু জানি না আজ কোথায় চলে গেছেন। আমরা সেই সকাল হ'তে এপর্য্যন্ত সারা বৃন্দাবন তাঁহার সন্ধানে ঘুরেছি; কোথাও পেলাম না।" ঠাকুর, বিন্দুমাত্রও ব্যস্ততা না দেখাইয়া, সহজভাবে বলিলেন—"কোথায় যাবেন? তালাস ক'রে দেখ। যমুনাতীর দেখেছ?"

আমি বলিলাম—'কোন স্থানই বাকি রাখি নাই। রাস্তার লোকদেরও জিজ্ঞাসা করেছি।' ঠাকুর মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে বলিলেন—"তাঁকে এখন খুঁজে আর পাবে না। পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গেছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'পরমহংসজী মাকে নিয়া গেলেন কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—"কাল যখন ওঁকে অন্যত্র থাকৃতে ব'লা হ'ল, অস্বীকার করলেন। অনেক বুঝায়ে বল্‌লাম, কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। তখন আমি পরমহংসজীকে স্মরণ করলাম। তিনি তখনই আমাকে বল্‌লেন, 'এজন্য ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? কোনও চিন্তা নাই! কালই ওঁকে আমি অন্যত্র নিয়ে যাব।' তিনি ওঁকে নিয়ে গেছেন; খোঁজ করা বৃথা।"

আমি। মা'র কি আর তবে এখানে আস্‌বার সম্ভাবনা নাই?

ঠাকুর। তাঁর কোন দিকেই আর মায়া নাই; শুধু কুতুর উপরে একটু আকর্ষণ আছে। তাই কুতুর জন্য আবার আস্‌তেও পারেন। এখন সে বিষয়ে পরিষ্কার কিছু বলা যায় না। আসা না আসা তাঁর ইচ্ছা।

আমি। পরমহংসজী নিয়া গেলেন কিরূপে? তাঁকে তো সেখানে দেখি নাই। মা আমা হ'তে মাত্র ৮।৯ হাত তফাতে ছিলেন। ৫।৬ সেকেণ্ডের জন্য শুধু একটিবার আমার অন্য দিকে চোখ ছিল। মুখ ফিরায়ে দেখি, মা নাই। পরমহংসজী এলে তো তাঁকে দেখ্‌তে পেতাম।

ঠাকুর। পরমহংসজী সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন; তাঁকে দেখ্‌বে কি ক'রে? তিনি যে সূক্ষ্ম শরীরে এসে নিয়ে গেছেন।

আমি। পরমহংসজী তো সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন, কিন্তু মা তো আর সূক্ষ্ম শরীরে যান নাই। মা'র স্থূল শরীর মুহূর্ত্তমধ্যে কি প্রকারে পরমহংসজী অন্যত্র নিলেন?

ঠাকুর। তাঁরা সবই পারেন। যোগীরা ইচ্ছামাত্র এই স্থূল ভূতকে সূক্ষ্মে পরিণত করতে পারেন। সূক্ষ্ম ভূতকেও স্থূল করতে পারেন। শরীরের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চ ভূতে মিলায়ে, স্থূলকে সূক্ষ্ম ক'রে, মুহূর্ত্তমধ্যে ওঁকে নিয়ে গেছেন।

আমি। পরমহংসজী মাকে কোথায় নিয়ে গেলেন? শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁকে কি সূক্ষ্ম শরীরে রেখেছেন—না, আর কোথাও নিয়ে গেছেন?

গোঁসাই। শ্রীবৃন্দাবনে আর রাখ্‌বেন কেন? পরমহংসজী তাঁকে একেবারে মানস-সরোবরে নিয়ে গেছেন।

আমি। মানসসরোবরেও মা কি সূক্ষ্ম শরীরে আছেন?

ঠাকুর। তা কেন? সেখানে গিয়ে আবার যেমন তেমনই হয়েছেন।

আমি। মানসসরোবরে পরমহংসজী আছেন; ওখানে আরও কি কেউ আছেন—না, পরমহংসজী একাকীই থাকেন?

ঠাকুর। আরও কত আছেন! কত ঋষি, কত মুনি, কত দেবদেবী আছেন।

আমি। এখন সেখানে থেকে মা কি কর্‌বেন?

ঠাকুর। সাধন ভজন কর্‌বেন, কত আনন্দ কর্‌বেন! সেখানে গেলে আর কি আস্‌তে ইচ্ছা হয়?

আমি। মানসসরোবর তো তিব্বতে। সেখানে দেবদেবী, মুনি ঋষিরা থাকেন?

ঠাকুর। না, না, এ সে মানসসরোবর নয়। ভূগোলে যে মানসসরোবর পড়েছ, তা নয়।—সে তো 'মানতলাও'। মানসসরোবর বহু দূরে—হিমালয়ের উপরে।

আমি। আমরা কি মানসসরোবরে যেতে পারি না?

ঠাকুর। এই শরীর নিয়ে কি প্রকারে যাবে? পথ যে অতিশয় দুর্গম। খুব যোগৈশ্বর্য্য না হ'লে সেখানে যাওয়া যায় না। সাধারণে যাকে মানসসরোবর ব'লে জানে, সেখানে সহজেই যাওয়া যায়। সে তো আর মানসসরোবর নয়। মানসসরোবর কৈলাস যাবার পথে।

আমি। মা তা হ'লে কুতুর জন্য আবার আস্‌তে পারেন?

ঠাকুর।—তা বলা যায় না। ঐটুকু মায়া ইচ্ছা কর্‌লেই তাঁরা কাটায়ে দিতে পারেন।

ঠাকুরের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। বিকাল বেলা আর আর দিনের মত আজও ঠাকুরের সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনিতে গেলাম। কুঞ্জে ফিরিতে রাত্রি হইল।

যোগজীবনকে সংসার করিতে আদেশ।

২৭শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১২৯৭।

মাঠাকুরাণীর অন্তর্দ্ধানে সকলেরই প্রাণে একটা খুব আঘাত লাগিল। যোগজীবন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। আর গেণ্ডারিয়া যাইবেন না, সংসার করিবেন না—বলিলেন। যোগজীবন একেবারে উদাসীনই হইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অতি স্নেহ ভাবে মিষ্টি উপদেশ দিয়া স্থির রাখিতে লাগিলেন। যোগজীবন আজ

বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করিলেন। ঠাকুর শেষকালে কহিলেন, "আর অধিক দিন তোর সংসার কর্‌তে হবে না, নিশ্চয় জানিস্। শীঘ্রই তোর সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তবে তা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুকাল সংসার কর্‌তে হবে। ওটুকু কর্ম্ম শেষ না কর্‌লে চল্‌বে না। এখন ঢাকায় গিয়ে থাক।" নিতান্তই নির্ব্বন্ধ বুঝিয়া যোগজীবন অগত্যা শীঘ্রই আবার ঢাকায় যাইতে সম্মত হইলেন।

বিকাল বেলা যখন আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনিতে যাই, রাস্তার দুই দিকে ও সম্মুখে আমরা কেবল মাঠাকুরাণীকেই অনুসন্ধান করিতে থাকি। মাঠাকুরুণের অন্তর্দ্ধানের পর ঠাকুর আমাকে বলিলেন—কুতুর প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রেখো। পাঠ শুন্‌তে যখন যাবে, কুতুকে হাতে ধ'রে নিয়ে যেও। পাঠ শুন্‌তে যখন বস্‌বে, কুতুকে কাছে বসাইও। ওকে আবার নিয়ে না যান।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুতুকেও নিতে পারেন কি ?"

ঠাকুর। তা আর পারে না ? খুব পারেন।

আশ্চর্য্য এই যে মাঠাকুরাণীর জন্য কুতুর একটুও বিমর্ষ ভাব দেখিতেছি না। কুতু সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকেন ; ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় হাসিগল্পে দিন কাটাইয়া দেন ; একটিবারও মা'র কথা মনে করেন না ; কাহারও কাছে মা'র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। এমন একটা ব্যাপার হইয়া গেল, কুতু যেন কিছুই জানেন না। কুতুকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা'র অভাবে কি কারো কারো কোনও ক্লেশ হয় নাই ?" ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, ক্লেশ সকলেরই হয়েছে ; তবে কারো কারো ধৈর্য্য খুব বেশী।

বানর 'কৃষ্ণদাস'।

অতি প্রত্যূষে, প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে ঠাকুর বারেন্দায় আসিয়া নিজ আসনে বসেন। এই সময়ে 'কৃষ্ণদাস' আসিয়া হাজির হন। 'কৃষ্ণদাস' একটি ছোট বানর। ঠাকুর আদর করিয়া ইহার নাম 'কৃষ্ণদাস' রাখিয়াছেন। ঠাকুর আহার করিবার পূর্ব্বে প্রতিরাত্রে 'কৃষ্ণদাসের' জন্য অন্ততঃ একখানি রুটি রাখিয়া দেন। সকাল বেলা প্রত্যহই কৃষ্ণদাস আসিয়া উহা সেবা করেন। কৃষ্ণদাসের এখানে অবারিত দ্বার। ভোর বেলা আসিয়াই কৃষ্ণদাস বাহিরে থাকিয়া দুই তিনবার চিঁ চিঁ করিয়া শব্দ করেন। ঠাকুর তখন হাতে ধরিয়া উহাকে খাবার দেন। দু' চারবার আওয়াজ করিয়া কৃষ্ণদাস খাবার না পাইলে বরাবর ঠাকুরের আসনঘরে প্রবেশ করেন ; যেখানে খাবার রাখা হয় সেখান হইতে খাবার লইয়া, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া বসেন ; পরে ধীরে ধীরে ৫।৭ মিনিট বসিয়া খাবারটি শেষ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যদি কোনও আকস্মিক কারণে কৃষ্ণদাস আসিয়াও খাবার না পান, তাহা হইলে ঠাকুরের হাত পা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকেন—কখন কোলে, কখনও একেবারে ঠাকুরের

থাড়ে, উঠিয়া বসেন। কৃষ্ণদাসকে থাবার না দেওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুর স্থির হইয়া আসনে বসিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস বড় শান্তপ্রকৃতি নন; তবে ঠাকুরের বড় আদুরে।

ভক্ত বুড়ো বানরের কার্য্য।

ঠাকুরের ভক্ত আর একটি বুড়ো বানর আছেন। ইনি বেশ বিজ্ঞ। যেদিন হইতে ঠাকুর এই স্থানে আসিয়া আসন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই ইনি ঠাকুরের নিত্য সঙ্গী। সকালে চা-সেবার পরে কিছুক্ষণ শ্রীধর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পরে বেলা ৯ টার সময়ে ঠাকুর শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ঠিক সেই সময়েই বুড়ো বানর আসিয়া ঠাকুরের 'বরাবর', ঝাপের বাহিরে, বসেন এবং স্থির ভাবে গালে হাত দিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া থাকেন; মনে হয় যেন ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বুড়ো কিছুতেই নিজ আসন ত্যাগ করেন না। যদি কোনও দুষ্ট বানর আসিয়া পাঠের সময়ে গোলমাল করে, বুড়ো এমন ভাবে তাহার দিকে একবার দৃষ্টি করেন, যে সে চীৎকার করিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। পাঠের সময়ে বুড়োকে কিছু থাবার দিলে বুড়ো কিছুতেই উহা খান না, রাখিয়া দেন, পাঠ শেষ হইলে ধীরে ধীরে উহা সেবা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একটি দিনের জন্যও বুড়োর এই ভাগবতশ্রবণ বন্ধ হয় না। সারাদিন বুড়ো যেখানেই থাকুন না কেন, বেলা ৯ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত বুড়ো নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া থাকেন না। বুড়ো এ পাড়ার বানরদের দলপতি। বুড়োর শরীরটি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ। দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। বুড়োর আরও অদ্ভুত ব্যাপার ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। সমস্ত বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে বানরের উৎপাত অত্যন্ত অধিক। বুড়োর জন্যই বোধ হয়, আমাদের কুঞ্জে তেমন বানরের উপদ্রব নাই। একদিন ভোর বেলা অকস্মাৎ এক মর্কট আসিয়া আমাদের একটি ঘটী লইয়া গেল। শৌচে যাওয়ার বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। বুড়ো একটু পরেই আমাদের কুঞ্জে আসিলেন। ঠাকুর বুড়োকে বলিলেন—"বুড়ো, তোমার দলের একটি এসে আমাদের একটি ঘটী নিয়ে গেছেন। আমাদের বড় অসুবিধা হচ্ছে। ঘটিটা এনে দিবে ?" ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অমনি বুড়ো একটি উচ্চ স্থানে লাফাইয়া উঠিলেন, সেখানে দুপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যে মর্কটটি আমাদের ঘটী নিয়া পলাইয়াছিল সে ৩।৪ খানা বাড়ী তফাতে জনৈক ব্রজবাসীর ঘরের ছাদে গিয়া বসিয়াছিল। বুড়ো একবার তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিলেন যে, সে ঘটী ফেলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। বুড়ো তখন ধীরে ধীরে যাইয়া ঘটীটি ধরিলেন, এবং উহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরের নিকটে রাখিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বানরের এইপ্রকার বুদ্ধি ইতিপূর্ব্বে আমি কল্পনাও করি নাই। বানরটি পোষা নয় অথচ এমন বুদ্ধিমান ও বশগামী ইহাই আশ্চর্য্য! ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন—ইনি কোনও বৈষ্ণব মহাত্মা—ব্রজবাস আকাঙ্ক্ষায় বানরদেহ ধারণ ক'রে রয়েছেন।

ঠাকুরের আহারের দারুণ দুরবস্থা।

প্রত্যূষে ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া শৌচে যান। শ্রীধর, জল কৌপীন ও বহির্ব্বাসাদি লইয়া, দাঁড়াইয়া থাকেন। মুখ প্রক্ষালনের পর ঠাকুর উপরে আসিয়া 'কৃষ্ণদাস' কে খাবার দেন। পরে নিজ আসনে গিয়া বসেন। শ্রীধর এই সময়ে চা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

চা'এর দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। এক পয়সার একটু বাসি দুধ ও সামান্য পরিমাণ একটু চিনি কোন প্রকারে জুটে। অর্থাভাববশতঃ, অতি সাধারণ শ্রেণীর চা সস্তা দরে খুচরা খরিদ করিয়া আনা হয়। এক দিনের প্রস্তুত করা চা'এর পাতাগুলি ফেলিয়া না দিয়া উহাই আবার শুকাইয়া রাখিতে ঠাকুর বলিয়াছেন। অভাব হইলে সেই সব পাতাই জলে সিদ্ধ করিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হয়। ম্যালেরিয়ার জন্য বহুকাল হইতেই ঠাকুরের চা খাওয়া অভ্যাস। সময়মত উহা না পাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হয়। কিন্তু, এই প্রকার অসার চা কি করিয়া যে ঠাকুর সেবা করেন, বুঝি না। চা'এর এইরূপ অনটনের খবর একবার কলিকাতায় গেলে, শত শত গুরুভ্রাতা কত উৎকৃষ্ট চা আগ্রহের সহিত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, ঠাকুরের অনিচ্ছায় কাহারও কিছু করিবার যো নাই। ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমি দাদাকে উৎকৃষ্ট চা পাঠাইতে লিখিলাম।

ঠাকুরের চা-সেবার পর শ্রীধর এক অধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরে, বেলা নয়টার সময়ে ঠাকুর স্বয়ং শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন।

মধ্যাহ্নে কোন কোন দিন ঠাকুর যমুনায় স্নান করেন। পরে বারটার সময়ে সকলকে লইয়া নীচে রান্নাঘরে গিয়া প্রসাদ পান। ঠাকুরের সেই শরীর এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন, প্রসাদের রূপ দেখিলেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বহু অবস্থাপন্ন ভক্ত লোক ঠাকুরকে উৎকৃষ্ট বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেবা করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দামোদর গরীব বলিয়াই, তাহার প্রার্থনা ও 'জেদে' ঠাকুর তাহারই কুঞ্জে আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের সেবার জন্য যাহা কিছু মাসে মাসে আসে, ঠাকুর তাহার একটি কপর্দ্দকও না রাখিয়া দাউজী ঠাকুরের ভোগার্থে দামোদরের হাতে দিয়া দেন। দামোদর প্রথম প্রথম ২।৩ মাস দাউজীর ভোগ নাকি ভালরূপেই দিয়াছিল। পরে, ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে অর্থশালী বড়লোক এই খবর পাইয়া, অদ্ভুত বিষম 'ফিকির-ফন্দি' আরম্ভ করিয়াছে। ঠাকুরের আহারাদির অতিশয় ক্লেশ হইতেছে শুনিতে পাইলে, ভক্ত শিষ্যেরা নিশ্চয়ই মুঠো মুঠো টাকা পাঠাইবে, ইহাই দামোদরের স্থির বিশ্বাস। তাই এখন দামোদর, দাউজীর সেবার জন্য টাকা পাইলে, তাহা দ্বারা সর্ব্বাগ্রে তাহার বাড়ীর মাসিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে; পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা কোন মতে দাউজীর সেবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় তিন মাস যাবৎ রুটি, অন্ন ও কুমড়া-সিদ্ধ দাউজীর ভোগে লাগিতেছে। লবণ ও মসলা বর্জ্জিত মাত্র জলে সিদ্ধ কুষ্মাণ্ড, প্রস্তর মূর্ত্তি দাউজীরই ভোগে অনন্তকাল চলিত পারে; কিন্তু, রক্ত মাংসের শরীরে, যাহারা উহা প্রসাদ পায়, তাহারা আর কত কাল উহাতে রুচি ও ভক্তি রাখিবে?

পেট ভরিয়া আহার ঠাকুরের একটি দিনও হইতেছে না। কোন প্রকারে সামান্য পরিমাণ দুধে এক মুঠো অন্ন ফেলিয়া তাহাই ঠাকুর খাইয়া উঠেন। সস্তা মূল্যের কদর্য্য মোটা আটার রুটি কেবল মাত্র লবণ ও কুম্‌ড়া-সিদ্ধ দিয়া দু'একখানার বেশী কোন দিনও ঠাকুর খাইতে পারেন না। রাত্রের ব্যবস্থা আরও বিষম। মধ্যাহ্নের কুম্‌ড়া সিদ্ধ এবং মোটা রুটি অল্প পরিমাণে রাত্রের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। যাহার পেট তেমন জ্বলিয়া উঠে সেই মাত্র সেই পচা দুর্গন্ধ কুম্‌ড়া ও খড় খড়ে রুটি, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গলাধঃকরণ করিয়া চলিয়া আসে। অনুনয় বিনয় করিয়া দামোদরকে ভোগের একটু ভাল বন্দোবস্ত করিতে বলিলে, দামোদর টাকার জন্য 'বাঙ্গলা মুল্লুকে' গোঁসাইয়ের 'চেলাদের' নিকটে 'খৎ ভেজিতে' উপদেশ দেয়। তাহা আমরা করি না; সুতরাং 'গোঁসাইয়ের ক্লেশ আমাদের প্রাণে লাগে না' বলিয়া দামোদর আমাদিগকে "পাখণ্ডী" (পাষণ্ড) বলিয়া গালি দেয়। মাসে মাসে এত টাকা পাইয়াও দামোদর ভোগের ভাল ব্যবস্থা করিতেছে না কেন, দু'চার জন মিলিয়া আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, দামোদর মালা নাড়িতে নাড়িতে তত্ত্বকথা বলে; বলে—"আরে, ভালা ভোজন ভজনবাধা। ভকত্‌কা লোভ নেহি চাহি।" হাতে পায়ে ধরিয়া সকলে মিলিয়া দামোদরকে আহারের একটুকু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে, দামোদর কুমড়া-সিদ্ধ না দিয়া উহার বাকল সিদ্ধ দেয়। 'টাকা পয়সা নিজেদের হাতে রাখিয়া, নিজেরাই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিব।' ভয় দেখাইলে, দামোদর মহা উৎসাহ দেখাইয়া বাজার করিতে যায়; বাজারের বাছা বাছা শুষ্ক ও পোকা-ধরা, সাধারণের পরিত্যক্ত বেগুন ও 'বারো মিশালো' শাক আনিয়া তাহাই সিদ্ধ করিয়া দেয়; আর ক্যায়সা খিলায়া, ক্যায়সা খিলায়া বলিয়া দশ পনের দিন ধরিয়া তাহারই বড়াই করে। পেটের জ্বালায় সর্ব্বদা আমাদের ভিতরে "পালাই পালাই" ডাক ছাড়িতেছে। হা ভগবান্! কতকাল আর এ ভোগ! আহার করিতে বসিয়া, প্রতিদিনই দামোদরকে প্রহার করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একদিনও কিছু বলিবার যো নাই। "দামোদরের এই অতিরিক্ত অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না" ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর মিষ্টি মুখে একটু হাসিয়া বলিলেন—"দাউজী জাগ্রত দেবতা। তিনি সবই দেখ্‌ছেন। সময়মত দাউজীই দামোদরকে শাসন করবেন। তোমরা দামোদরকে কিছুই ব'লো না।" ভাল, ঠাকুরের পাল্লায় পড়িয়া দেখিতেছি, এবার 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতে হইবে।

দামোদরের উপর দাউজী ঠাকুরের শাসন।

আজ সকালে ঠাকুরের চা সেবার পরে অসময়ে দামোদর পূজারী কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩১শে আষাঢ়, ১২৯৭। মুখ ভার, কাহারও সঙ্গে কথাটি নাই। দামোদর কাঁপিতে কাঁপিতে ঠাকুরের সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি দামোদর, কি হয়েছে ?

দামোদর তাহার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ দুই গালে, প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল—"বাবা, দাউজী হামকো বহুত মারা হ্যায়।" দাউজী মহারাজ কেন মারিলেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায়, দামোদর এইপ্রকার কহিলেন—"বাবা, শেষ রাত্রে আমি নিদ্রিত আছি, স্বপ্ন দেখিলাম দাউজী আসিয়া অকস্মাৎ আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। দুই হাতে আমার দুই গালে ভয়ানক চাপড় মারিতে লাগিলেন। পরে আমার সর্ব্ব শরীরে বিষম কীল ও গুঁতা মারিতে মারিতে বলিলেন, 'পাষণ্ড, তোর এত সাহস? ভাল করে ভোগ দিস না; গোঁসাই খেতে পারেন না। তাঁকে খাবার ক্লেশ দিচ্ছিস! আজ তোকে কীলিয়ে মেরে ফেল্‌ব।' দাউজীর দারুণ প্রহারের ঘায়ে আমি চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলাম কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের বেদনা আমার কমিল না। এই দেখুন, বাবা, আমার গাল দুটি ফুলিয়া রহিয়াছে। এই সব স্থানের যন্ত্রণা এখনও আমি ভোগ করিতেছি।"

ঠাকুর দামোদরকে বলিলেন—দাউজী মহারাজ তোমাকে শাসন ক'রেছেন—তুমি ভাগ্যবান্। ভক্তি ক'রে দাউজী মহারাজের সেবা কর। তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্‌বেন না।

আমরা দামোদরের গালের অবস্থা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। স্বপ্নের প্রহার শরীর ফুটে—ইহা আর কখনও দেখি নাই। দাউজী ঠাকুরের অনুশাসন ব্যাপার কি, তাহা বিচারবুদ্ধি দ্বারা কিছুই বুঝি না। সে যাহা হউক, দামোদরের গুরুতর দণ্ডভোগ দেখিয়া মনে মনে খুব খুসী হইলাম; ভাবিলাম—এইবার হইতে পেট ভরিয়া দুটি খাইয়া শ্রীবৃন্দাবন বাস করিতে পারিব।

কুতুর কথা। মাঠাকুরাণীর প্রত্যাবর্ত্তন।

আজ মধ্যাহ্নে অবকাশ পাইয়া ঠাকুরকে মাঠাকরুণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "এতদিন হ'লো মা চলে গিয়েছেন, তাঁর কোনও খোজ খবর তো এ পর্য্যন্ত পেলাম না। তিনি কি যথার্থই আর আস্‌বেন না?"

১লা শ্রাবণ, ১২৯৭।

ঠাকুর। তা ব'লেছি তো, কুতুর প্রতি একটু আকর্ষণ আছে। যদি আসেন, কুতুর জন্যই আস্‌বেন। যেসব মহাত্মা ওঁকে নিয়ে গেছেন, তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লেই ঐ আকর্ষণটুকুও কাটায়ে দিতে পারেন। তাই ওঁর আসা সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।

আমি। মহাত্মারা মা'র আকর্ষণই না হয় কাটাবেন। কুতু ছেলেমানুষ, তার তো মা'র প্রতি একটা মায়া আছে।

ঠাকুর। কুতুর কি মা'র জন্য কষ্ট হচ্ছে?

আমি। তা কিছু বুঝি না। কুতুর কথাবার্ত্তা, হাসি গল্প, চলা ফেরা দেখে, কুতু একবারও যে মাকে মনে করেন, এমন বোধ হয় না। মা এখানে থাকবেন ব'লে আশা ক'রে এসেছিলেন। তাঁর এ ভাবে যাওয়ায় সকলেরই একটা খুব কষ্ট হয়েছে।

ঠাকুর। ওঁর এ ভাবে যাওয়া ভালই হয়েছে। এ যাওয়ায় কোন ক্ষতিই হবে না, মঙ্গলই হবে। এবারে শ্রীবৃন্দাবনে এলে ওঁকে কখনই ফিরায়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। ওঁরই স্থানে উনি থেকে যাবেন। এই সব কারণেই ওঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আস্‌তে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলাম।

এই সময়ে কুতু আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, মা যে পাঠ শুন্‌তে আসেন। প্রায়ই মাকে দেখ্‌তে পাই। আজও মাকে ওখানে দেখ্‌লাম।"

ঠাকুর। তিনি কোথায় ছিলেন? কেমন দেখ্‌লি?

কুতু। "কেন? মা আমাদের কাছেই তো বসেছিলেন। এই শরীরে নয়। আজ বোধ হয় মা আমাদের কুঞ্জে আস্‌বেন।"

ঠাকুর। তা আস্‌তে পারেন।

আমি কুতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুতু, মা'র জন্য কি তোমার কষ্ট হয়?"

কুতু বলিলেন—"কষ্ট হবে কেন? মাকে দেখ্‌তে না পেলে কষ্ট হ'ত। মাকে তো অনেক সময়েই দেখ্‌তে পাই। দেখ্‌বে এখন, মা আজ আস্‌বেন।"

আমি বলিলাম—"তা তুমি কিসে বুঝ্‌লে?"

কুতু আমার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আবার বুঝাবুঝি কি? শুন্‌তে পেলে না—বাবাও যে বল্‌লেন।" হঠাৎ এ সময়ে কুতু ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, আমার এমন হয় কেন? দিনের বেলায়ও যখন জেগে থাকি, তখনও স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।"

ঠাকুর। কি বল্‌ছিস্—একটু পরিষ্কার ক'রে বল্ না?

কুতু। "সর্ব্বদাই থেকে থেকে আমার মনে হয়, যা কিছু দেখ্‌ছি, শুন্‌ছি, কর্‌ছি, এসব কিছুই নয়, সব মিথ্যা, সমস্তই যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি মনে হয়। এমন হয় কেন?"

ঠাকুর। তোর খুব সৌভাগ্য, তাই। যথার্থই এসব কিছুই কিছু না। সমস্তই মিথ্যা। স্বপ্ন তো বটেই। এসব স্বপ্ন ব'লে পরিষ্কার জান্‌লেই তো হ'ল। আর কি?

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে কুতুর সঙ্গে ঠাকুরের এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা আসিয়া, নীচে থাকিয়া, আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো, কে আছ গো? তোমাদের মা-গোঁসাই যে আমাদের কুঞ্জে। তোমাদের খবর দিতে এসেছি। এই মাত্র দেখ্‌লাম মা-গোঁসাই আমাদের ঘরে ব'সে রয়েছেন। কখন্ এলেন, কোথা হ'তে এলেন—কিছুই জানি না। ঘরে তাঁকে দেখেই তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

ঠাকুর যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—যোগজীবন, এখনই চলে যা। নিয়ে আয় গিয়ে।

আমাদের কুঞ্জের দুইখানা বাড়ীর পরেই একটি গরীব গৃহস্থঘরে মাঠাকরুণ বসিয়া ছিলেন।

যোগজীবন যাইয়া মাকে লইয়া আসিলেন। মা'র শরীরের বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিধানে মাত্র গৈরিক বসন। মাঠাকরুণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও খুব সন্তুষ্টভাবে মাঠাকরুণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু, এতদিন মাঠাকুরাণী যে কোথায় কিভাবে ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রে আহারান্তে ঠাকুরের আসনের পাশে শুইয়া রহিলাম। ঠাকুর সারা রাত্রি বারেন্দাতেই থাকেন। মশার বিষম উপদ্রব। মাঠাকুরাণী পাখা লইয়া পূর্ব্ববৎ ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যোগজীবন, শ্রীধর প্রভৃতি মাঠাকরুণের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের বিষয় জানিতে চাহিলে, মা বলিলেন—পরমহংসজী পাঁচটি মহাপুরুষ সঙ্গে লইয়া এসেছিলেন। তাঁহারা ছয় সাত হাত লম্বা; সকলেরই মাথায় পাগড়ী আছে। তাঁহারা আমাকে যমুনায় নিয়ে গেলেন। বল্লেন, "এখানে স্নান কর।" আমি স্নান কর্‌লাম। পরে তাঁহারা আমাকে কোথায় কিভাবে নিয়ে গেলেন—কিছুই জানি না। একটু পরে দেখি পাহাড়ে র'য়েছি। বড়ই চমৎকার স্থান। পরমহংসজী আমার রক্ষকরূপে ঐ মহাপুরুষ পাঁচটিকে নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাক্‌তেন; আমি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বেড়াতে পার্‌তাম। সে স্থানই এমন যে কোনপ্রকার উদ্বেগ অশান্তি মনে আসে না। বড়ই আনন্দের স্থান। তাঁরাই আবার আমাকে এখানে এনে রেখে গেলেন।

প্রশ্ন। আপনি কি আস্‌তে চেয়েছিলেন?

মাঠাকুরাণী। সেখান থেকে কি আর আস্‌তে ইচ্ছা হয়? তবে সময়ে সময়ে কুতুর কথা মনে হ'ত।

আমার কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষাপ্রকাশ।

২রা শ্রাবণ, ১২৯৭।

পিত্তশূল বেদনা আমার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। এই রোগের উপশমে আমার একটি উদ্বেগ জন্মিয়াছে। শরীর সুস্থ হইল, এখন আর ঠাকুর হয় ত বেশীদিন আমাকে তাঁহার সঙ্গে রাখিবেন না। দেশে গেলেই দাদারা আমাকে পড়াশুনা করিতে বলিবেন; সে তো আমার পক্ষে যমযাতনা অপেক্ষাও কষ্টকর। লেখাপড়া না করিলেও, চাকরী তো আমার করিতেই হইবে। তখন সকলে আবার আমাকে বিবাহ করিতে অবশ্যই বাধ্য করিবেন। এসকল উৎপাত হইতে কি উপায়ে রক্ষা পাই?

হরিবংশপাঠের পর আজ ঠাকুরকে বলিলাম—"কয়দিন ধরিয়া আমি বড় উদ্বেগ ভোগ করিতেছি আপনাকে সব বলিতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—উদ্বেগ কেন? খুলে বল।

উৎসাহ পাইয়া আমি প্রাণ খুলিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলাম—"আমার শরীর বেশ সুস্থ

হয়েছে, এখন আমি কি করব ? দেশে গেলেই তো দাদারা আমাকে স্কুলে দিবেন ; কিন্তু লেখাপড়া অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি, নূতন করে আবার যে পড়াশুনা করে পরীক্ষা পাশের চেষ্টা করা, সে আমার বড়ই কষ্টকর মনে হয়। সেদিকে আমার রুচিও একেবারেই নাই। তার পর, তাঁরা যদি আমাকে চাক্‌রী জুটায়ে দেন, তাতেও আমার যাতনার একশেষ হবে। লেখাপড়া কিছু শিখি নাই ; চাক্‌রী কর্‌তে হলে খুব সামান্য আয়ের চাক্‌রীই করতে হবে। চাক্‌রী হলে তখন আবার সকলে আমাকে বিবাহ করতে বাধ্য করবেন। বিবাহ করলে অল্প আয়ে নিজপরিবার ভরণ পোষণই আমার পক্ষে শক্ত হবে ; পরিবার ক্রমে বৃদ্ধি হলে তখন যে কি করব, বুঝি না। তার পর, চাক্‌রী করলেই দশজনে কিছু না কিছু আমার নিকটে প্রত্যাশা করবে। আমার অবস্থা কেহই ভাববে না ; অথচ আকাঙ্ক্ষামত প্রাপ্ত না হলে সকলেই বিরক্ত হবে। যাঁরা আমাকে এখন এত ভাল বাসেন, এই চাক্‌রী করার দরুণই আমার উপরে তাঁদের অসদ্ভাবের সৃষ্টি হবে। বহুকাল আমি রোগশূন্য অবস্থা ভোগ করি নাই। যদিও এখন আমার শরীর সুস্থ আছে, সামান্য অনিয়মে আবার ব্যাধিগ্রস্ত হতে পারে। আমার ভিতরের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয়, তাতে বিবাহ করলে কিছুতেই আমি আর আত্মরক্ষা করতে পারব না। সংযমের দিক্ শিথিল হলে তখন আমি কোথায় যে গিয়া পড়ব বলতে পারি না। তখন কদাচার ব্যভিচারে চলতে ঐ পয়সাই আমার পরম সহায় হবে। হাতে পয়সা পেয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারলে আমি যে কোন্ বিষম নরকে গিয়ে পড়ব তাহা কিছুই জানি না। এই সব কারণে চাক্‌রী ও বিবাহ আমার পক্ষে নরকের দ্বার বলে মনে হয়। এসব আপদ্ হতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তাহা না হলে আর উপায় নাই।"

ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন—"শরীরের অবস্থা তোমার যেরূপ, তাতে বিবাহ করা তো কিছুতেই ঠিক নয়। শরীরটি বেশ সুস্থ হ'লে চাক্‌রী ক'রে দাদাদের তো সেবা কর্‌তে পার।" ঠাকুরের কথায়, বিবাহ করিতে হইবে না বুঝিয়া প্রাণ আমার ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম— 'এখন চাক্‌রীও করিতে হইবে না, ঠাকুর এরূপ একবার বলিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।' আমি আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম—'অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া চাক্‌রী করা কি আমার পক্ষে নিরাপৎ হবে ? আমার মনে হয়, সাধারণ লোক অপেক্ষা আমার কুবৃত্তির উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক। শুধু সুবিধা তেমন ঘটে না বলেই এখন পর্য্যন্ত আমি ভাল আছি ; সাধন ভজনের নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ থাকাতেই আমি রক্ষা পেতেছি। এদিকে একটু "আল্‌গা" হলে আমার দশা যে কি দাঁড়াবে, নিশ্চয় নাই। চাক্‌রী করলেই তো বিষয় নিয়ে থাকতে হবে ; মতি গতি সমস্তই বহির্ম্মুখ হয়ে পড়বে, সাধনের এসব আঁটাআঁটি নিয়ম প্রণালী তখন আর কিছুই থাক্‌বে না ; তখন একটা প্রলোভন উপস্থিত হ'লে তা হতে রক্ষা পাওয়ার সামর্থ্য আমার থাকবে না। বরং হাতে টাকা পয়সা হলে, স্বেচ্ছাচারে চলবার পথ পরিষ্কার হবে। দস্তুরমত আমাকে আপনি বাঁধিয়া না রাখিলে, রক্ষা পাওয়ার

আমার আর উপায় নাই। চাক্‌রী করলে অধিকাংশ সময়েই আপনার সম্বন্ধচ্যুত হয়ে থাকব। তখন ভিতরে সমস্ত কুভাব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে। আমি রক্ষা পাব কি প্রকারে? এজন্য মনে হয়, শুধু চাক্‌রী হতেই আমার এ জীবন নরকগ্রস্ত হবে। আমি যে কি করব, কিছুই বুঝিতেছি না। আমার ভবিষ্যতের কল্যাণ অকল্যাণ কিসে, আপনিই জানেন। যাহাতে আমার যথার্থ মঙ্গল হবে, আপনি আমাকে বলে দিন। আমি তাহাই করব। তবে আমার ইচ্ছা হয়, আমি অবিবাহিত অবস্থায় চিরকাল থাকি, সাধন ভজন করি। তাহা হলে চাক্‌রীর জন্যও আমাকে কেহ জেদ্ করবে না; কারণ, আমাদের সংসারে তেমন কোনই অভাব নেই। আপনি যদি বলেন, তাহা হলে আমি চিরজীবন কুমার হয়ে থাকি।"

ঠাকুর বলিলেন—শুধু বল্‌লেই কি আর কুমার থাক্‌তে পার্‌বে? সে কি হয়? তুমি এক কাজ কর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নেও। কৌমার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেরই অন্তর্গত। তবে ব্রহ্মচর্য্যে আরও কতকগুলি নিয়ম আছে, তা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হয়। একটা ব্রতের কুণ্ডলীতে না থাক্‌লে শুধু এমনি ঠিক থাক্‌তে পার্‌বে না। কুমার অবস্থায় থাক্‌তে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর। একটা ব্রতের বন্ধনে পড়্‌লেই নিরাপদ। তিন দিন তুমি গিয়ে এ বিষয়ে বেশ ক'রে চিন্তা কর। ব্রত নিয়ে উহা ঠিকমত প্রতিপালন কর্‌তে হয়, না হ'লে অপরাধ হয়; এ সব ভালরূপ চিন্তা ক'রে আমাকে ব'লো, পরে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়া যাবে।

ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণসম্বন্ধে আলোচনা; ঠাকুরের অনুমতি।

৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার; ১২৯৭।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিব কিনা, এ বিষয়ে তিন দিন চিন্তা করিয়া ঠাকুর আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন। তিনি আমাকে এই ব্রত দিতে যে ইচ্ছুক, তাঁহার কথার ভাবেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি। তথাপি ঠাকুরের আদেশমত ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে আমি অনেক ভাবিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। গোপনে যোগজীবন ও শ্রীধরকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। শ্রীধর শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"ভাই তোমার দীক্ষার দিনে আমি এই সঙ্কল্পেই একান্ত প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আজও আমার তাহা পরিষ্কার মনে আছে। তুমি বীর্য্যধারণ কর, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া সাধন ভজনে অতিবাহিত কর, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করি। ব্রত পালন করিতে না পারিলে তোমার ইচ্ছায়ই কি আর উনি এ ব্রত দিবেন? গোঁসাই যদি তোমাকে এই দুর্লভ ব্রত দেন, দ্বিধাশূন্য হইয়া এই মুহূর্ত্তেই গিয়া গ্রহণ কর।" যোগজীবন বলিলেন —"তুমি তো মহাসৌভাগ্যবান্ দেখ্‌ছি। কেহ ইচ্ছা করিলেই কি এই ব্রত পায় নাকি? গোঁসাই তোমার প্রতি খুবই প্রসন্ন, তিনি তোমাকে বিশেষ ভাবেই কৃপা কর্‌বেন। সংসারের নানাপ্রকার

জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অনায়াসে রক্ষা পাইবে। ব্রত রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, সে ভাবনা তোমার হয় কেন? মহাপুরুষেরা কখনও অপাত্রে এই ব্রত দেন না—পাত্র বুঝিয়াই কৃপা করেন। উনি যদি দয়া করিয়া তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য দেন, এখনই গিয়া গ্রহণ কর।"

মাঠাকৃরুণকে এই বিষয় বলাতে তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন; এক ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন—"সে কি? ব্রহ্মচর্য্য নেবে কি রকম? এ বুদ্ধি কেন? শরীর যতদিন অসুস্থ থাকে, বিবাহ নাই কর্‌লে। এম্‌নিই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে চল। শরীর নীরোগ হ'লে দস্তুরমত সবই কর্‌বে। বিয়ে কর্‌লে কি আর ধর্ম্ম হয় না? সাধ ক'রে ওসব কঠোরতার প্রয়োজন কি? ব্রত নেওয়া অত সহজ নয়, বড় কঠিন। শেষে যদি ব্রত ভঙ্গ ক'রে ফেল, অপরাধ হবে না? অনর্থক এ মতি কেন?

মাঠাকুরাণীর কথায় আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইল; মনটিও একেবারে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আমি বিষম সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম—"ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত লইয়া যদি তাহা যথারীতি প্রতিপালন করিতে না পারি, ব্রতভঙ্গজনিত অপরাধে আমাকে পড়িতে হইবে। তাহা অপেক্ষা এই কঠোর ব্রত গ্রহণ না করাই ভাল। কিন্তু এই ব্রত অবলম্বন না করিলে বিবাহ ও চাক্‌রীর অনর্থ হইতে অব্যাহতি পাইবারও তো আর উপায় নাই। এই উভয়সঙ্কটের অবস্থায় আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল ব্রত গ্রহণ করিলে আমি ঠাকুরের বিশেষ শাসনাধীনেই থাকিব, ব্রতভঙ্গ করিলে আমার দয়াল ঠাকুরই আমাকে শাস্তি দিবেন। দণ্ডভোগ করিলেও উহা আমার ঠাকুরেরই কার্য্য মনে করিয়া অনেকটা শান্তি পাইব, বিবিধ দুর্দ্দশায় পড়িয়া উৎকট ভোগের উৎপত্তি হইলেও উহা তাঁহারই বিধান বলিয়া মনে হইবে। নরকেও যদি ডুবি, ঠাকুরের সঙ্গে অন্ততঃ ভাবেরও একটা যোগ থাকিবে। কিন্তু বিবাহ করিলে যে অশান্তিপূর্ণ আবর্জ্জনাময় সংসারের সৃষ্টি হইবে, এবং চাক্‌রী করিলে টাকার গরমে যে দুর্নীতি পরিপূর্ণ নরককুণ্ডে ডুবিয়া যাইব, উহা সর্ব্বথা আমার আত্মকৃত বলিয়া মনে করিব, উহার সঙ্গে ঠাকুরের কোনপ্রকার সম্বন্ধ, ভাবে বা কল্পনাতেও আনিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং আমার ঐহিক ও পারলৌকিক স্বার্থ ও সুবিধার দিকে তাকাইয়া কার্য্য করিলে ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণই আমার পক্ষে লাভজনক মনে হয়। কিন্তু আবার যখন ভাবি 'আমার নিজের এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের আরামের জন্য পরমারাধ্য ঋষিগণের বিশুদ্ধ আশ্রম কলুষিত হইবে; বিশেষতঃ আজন্ম সত্যসঙ্কল্প পুণ্যমূর্ত্তি গুরুদেবের পরমপাবন নাম আমি কলঙ্কিত করিব,' তখন আর আমার ব্রতগ্রহণের প্রবৃত্তি হয় না। আমার অদৃষ্টের ভোগ আমিই ভুগি। শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ শ্রীশ্রীগুরুদেবের অমল শুভ্র রূপে বিন্দুমাত্র কালিমা নিক্ষেপ করিতে কিছুতেই আমি পারিব না। সুতরাং নিজের এই হীন ও অসার সামর্থ্যে নির্ভর করিয়া কখনই আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব না।

আজ মধ্যাহ্নে আহারান্তে, হরিবংশ পাঠ করিতে ঠাকুরের কাছে গিয়া বসিলাম। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি? তুমি কি স্থির কর্‌লে? ব্রহ্মচর্য্য নিবে?' আমি বলিলাম—'এ সম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করতে পারব না। আপনি যেমন বল্‌বেন, তেমনই করিব। দুর্লভ ব্রত

অনায়াসে গ্রহণ করে প্রকৃতিদোষে শেষে উহা অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালন করতে না পারলে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম আমার দ্বারা কলুষিত হবে। আমার ভিতরের অবস্থা ত আপনি সমস্তই জানেন; কামভাব আমার অত্যন্ত অধিক। তেমন ভাবে প্রলোভন উপস্থিত হলে নিজ শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে পারব বলে ভরসা করি না। এরূপ অবস্থায় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য চা'ব কোন্ সাহসে? ব্রতগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আমার খুব আছে; কিন্তু উহা রক্ষা করার আমার সামর্থ্য নাই। আমি দুর্ব্বল বলে আপনি যদি দয়া করে নিজ শক্তিতে আমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করেন তাহা হ'লেই আমি উহা গ্রহণ করতে পারি; নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই।' এই বলে আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। ঠাকুর তখন এক দৃষ্টিতে সস্নেহে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে হাসিমুখে, প্রসন্নভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, তাই হবে। একটা ভাল তিথি দেখে এই ব্রত গ্রহণ কর। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কারোকে কিছু ব'ল না। এখন পড়।"

আমি তখন নিশ্চিন্ত মনে হরিবংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। আজ আমার প্রাণে মহা আনন্দ। মনে হইল—'আজই ঠাকুর আমার সমস্ত ভার নিজের উপর নিয়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিরাপৎ করে দিলেন; আজ আমি উদ্ধার হ'লাম।' এই ব্রতগ্রহণের কথা আমি আর কাহাকেও বলিব না, স্থির করিলাম। কিন্তু মাঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, ভাবনা হইল। তিনি আমার এই ব্রতগ্রহণের বিরোধী। কুতুকে আমার হাতে অর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা মাঠাকুরাণীর বহুকালযাবৎই আছে। কাহারও কাহারও কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্তও করিয়াছেন। আকারে প্রকারে আমাকেও যে তাহা জানান নাই, এরূপ নহে। কে জানে? বোধ হয় এই জন্যই মা আমার ব্রহ্মচর্য্য ইচ্ছা করেন না। যে দিনে ইচ্ছা ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিবেন; আমি দিন ক্ষণ কিছুই জানি না। জয় গুরুদেব! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ঠাকুরের সঙ্গে মহাপুরুষদর্শন।

৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১২৯৭, ২০শে জুলাই।

বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা দর্শনে বাহির হইলাম। ঠাকুর অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলেন। মাঠাকরুণ, কুতু, শ্রীধর প্রভৃতি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। আমি ঠাকুরের কমণ্ডলুটি হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম। ঠাকুর সোজাসুজি কালীদহের দিকে চলিলেন। শুনিলাম, আজ কালীদহে খুব বড় মেলা, সহস্র সহস্র লোক কালীদহে উপস্থিত হইয়াছে। রাস্তায়ও লোকের ভিড় বড় কম নয়। মেলাস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া চলিতে চলিতে ঠাকুর থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটি লোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে সেই লোকটির দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। উঁহার বেশভূষা কিছুই নাই, সামান্য কৌপীনের উপরে মাত্র একখানা জীর্ণ মলিন বহির্ব্বাস; বর্ণ শ্যাম; আকৃতি দীর্ঘ ও অতিশয় শীর্ণ; গায়ে ধূলাবালি অথবা ব্রজের রজ (তাহাতে

আরও যেন কদাকার দেখাইতেছে)। অঙ্গে মালা বা তিলকের নাম গন্ধও নাই, মাথায় লম্বা লম্বা পিঙ্গলবর্ণ জটিল চুল, দেখিতে ঠিক যেন রাস্তার মুটে মজুরের মত। কিন্তু চোখে অসাধারণ জ্যোতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। মনে হইল যেন উঁহার ঘনঘন পলকে উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে।

ঠাকুরকে দেখিয়াই ইনি প্রায় একশত গজ দূরে থাকিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং সমান গতিতে ঠাকুরের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। একটিবার "হরেকৃষ্ণ"-ও বলিলেন না। ঠাকুর আর পশ্চাদ্দিকে না তাকাইয়া কালীদহের দিকে চলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই আমি তখনই পিছন দিকে চাহিয়া আর ঐ লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না।

মেলা দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে ফিরিলাম। রাত্রে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, ঠাকুর বলিলেন—মেলার মধ্যে আজ একটি মহাপুরুষ দর্শন হ'ল। এরূপ মহাত্মারা লোকালয়ে প্রায় আসেন না, পাহাড়েই থাকেন।

আমি বলিলাম—আমি তো আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম; মহাপুরুষ কোথায় দেখ্‌লেন? আমাকে দেখালেন না কেন?

ঠাকুর। অবিশ্বাসপূর্ণ সংসার! এতবড় মহাত্মাকে বিশ্বাস কর্‌তে পারবে কেন? হিমালয়ের উপরেই থাকেন, নীচে বড় এরূপ মহাপুরুষেরা আসেন না। যখন আসেন, তখনও এইরূপ ছদ্মবেশেই তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে চলে যান। পূর্ব্বে আর একবার এই মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবার মুহূর্ত্তমাত্র আলো বিস্তার ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্তর্দ্ধান হলেন। অতি আশ্চর্য্য! যথার্থ মহাপুরুষ!

আমি বলিলাম—অত লোকের মধ্যে আপনি একটি লোকের দিকে চেয়ে রইলেন, দেখেছিলাম। তাঁর কোন বেশই ছিল না, ঠিক সাধারণ মুটে মজুরের মত; তিনিই কি সেই মহাপুরুষ?

ঠাকুর। হবেন—তিনিই হবেন। তাঁর পাদুটি ভূমি হ'তে আধহাত উপরে ছিল, রজে তিনি চরণ স্পর্শ করান নাই। পায়ের দিকে তো কেহ দৃষ্টি কর না। পায়ের দিকে দৃষ্টি কর্‌লেই অনেক সময়ে ধরা যায়।

আমি। তিনি তো দাঁড়ালেন না, আপনার সঙ্গে কোন কথাও বল্‌লেন না?

ঠাকুর। যা কিছু বলার সবই ব'লেছেন। তাঁরা কি আর আমাদের মত শুধু মুখেই কথা বলেন? আকার ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে নানা উপায়ে তাঁরা সমস্ত ব'লে থাকেন।

আমি। আকার ইঙ্গিতে এবং দৃষ্টিতেও কি কথা বল্‌তে পারে?

ঠাকুর। তা আবার পারে না? খুব পারে! এমন প্রাণী ঢের আছে, যারা মুখে বলে না, আকার ইঙ্গিত দৃষ্টি দ্বারাই সমস্ত ব্যক্ত করে।

কালীদহর ঘাট—বৃন্দাবন।

৩৬ পৃঃ
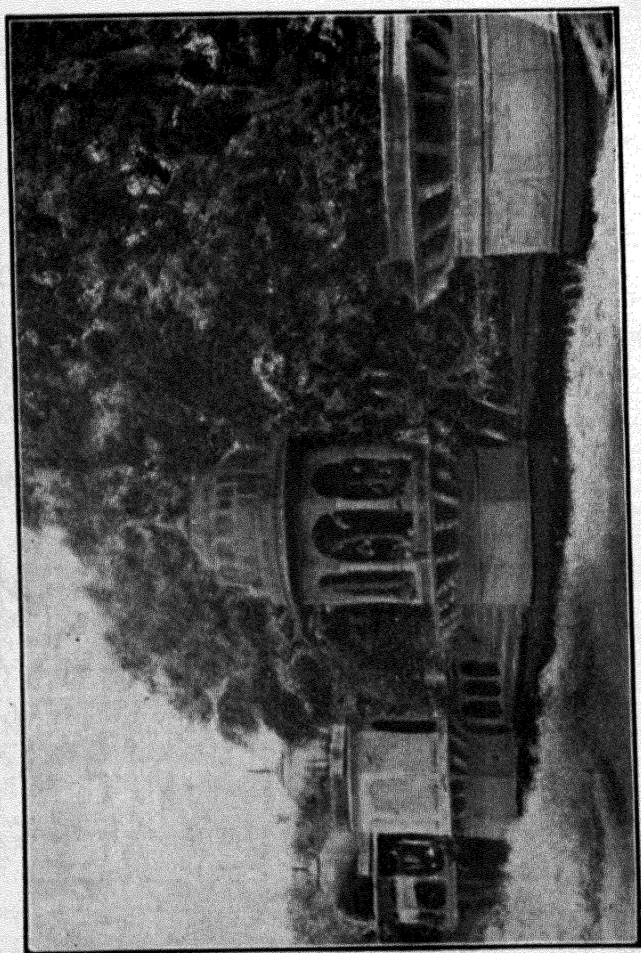
ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের দিননির্দ্দেশ।

আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুর সদাচারসম্বন্ধে অনেক উপদেশ করলেন। ব্রাহ্মণদের আচার, নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা তর্পণাদি যে কতদূর উপকারী, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন।

৬ শ্রাবণ, ১২৯৭।

কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করলে আজ কাল কি কেহ ঋষিদের মত হতে পারে? এখনও কি বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যাদির মত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

ঠাকুর বলিলেন—বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আজ কাল বড়ই শক্ত, সহজ নয়। যদি কেহ সেইমত অনুষ্ঠান করতে পারেন, হবে না কেন? অনেক সময় লাগে।

আমি। বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে প্রাচীন ঋষিদের মত ব্রাহ্মণ হতে ইচ্ছা হয়। আমাকে আপনি দয়া ক'রে সেইমত ব্রাহ্মণ ক'রে নিন্।

ঠাকুর। তাই ত ঠিক। তা হ'লেই এখন বৈদিক ব্রহ্মচর্য্য নিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে ঠিক সেই নিয়মমত চল, তা হ'লে ঠিক হবে। একটা দিন দেখে ব'লো, ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে দিব।

আমি। দিন দেখ্‌তে আমি জানি না।

ঠাকুর। পঞ্জিকাখানা নিয়ে এস না।

আমি পঞ্জিকাখানা আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম।

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন। ১২ই শ্রাবণ দিন ভাল। ঐ দিনে নির্জ্জনে এসে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রো। সে দিন আমি বরং সময়মত তোমায় ডেকে নিব। এখন কারোকে কিছু ব'লো না। হরিবংশপাঠের পর ঠাকুর বলিলেন—পাঠের একটা নিয়ম থাকা ভাল। সময় নির্দ্দিষ্ট রেখে নিয়মমত ভাল ভাল পুস্তকই পাঠ ক'রো।

আমি। আমার পাঠের পক্ষে উপযুক্ত কি কি পুস্তক তা ত আমি জানি না। আপনি আমাকে ব'লে দিন্।

ঠাকুর। গীতাখানা নিয়মমত নিত্য পাঠ ক'রো; মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, আর শ্রীমদ্‌ভাগবত প'ড়ো।

কেলিকদম্ব বৃক্ষে রাধাকৃষ্ণ নাম।

বিকাল বেলা আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। শ্রীমদনমোহন ঠাকুর দর্শন করিয়া কালীদহের দিকে চলিলাম। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধিবেদী দর্শন করিয়া যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কালীয় হ্রদের উপরে একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে আমরা বসিলাম। ঠাকুর

বলিলেন—এটি সেই কেলিকদম্বের গাছ, বহু প্রাচীন। প্রবাদ এই যে এই বৃক্ষটির উপরে দাঁড়ায়েই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমনের সময়ে যমুনায় ঝাঁপায়ে প'ড়েছিলেন। এই বৃক্ষে আপনা আপনি 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম', রাধাশ্যাম'—এই সব নাম লেখা হ'য়ে রয়েছে। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে দেখে নাও।

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়াই আমরা বৃক্ষের গোড়ায় যাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাছের গুঁড়িতে ও শাখা প্রশাখায় ঐসকল নাম পরিষ্কাররূপে বাকলের শিরাদ্বারা সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা হইয়া রহিয়াছে। দুই এক স্থানে দুই চারিটি নয়, বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে এরূপ অসংখ্য নাম দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমার চিত্ত ভয়ানক সন্দেহপূর্ণ, সহজে কিছুই বিশ্বাস করে না। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুষ্ট পাণ্ডারা পয়সা রোজগারের লোভে ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া এই সব নাম লেখে নাই ত?" ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—"তুমি যা বল্‌লে তাও ঠিক। পাণ্ডারাও দু' চার স্থানে ছুরি দিয়া কেটে ওসব নাম লিখেছেন। কিন্তু দেখামাত্রই তা বুঝা যায়। স্বাভাবিক নাম ছিল ব'লেই তো তা পাণ্ডারা লিখেছেন।" এই বলিয়া ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৃক্ষের নিকটে যাইয়া ৪।৫টি নাম দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখ, এসব পাণ্ডাদের কারিকরী। অর্থোপার্জ্জনের লোভে পাণ্ডারা এসব স্বাভাবিক বস্তুর নকল করতে গিয়া মূল জিনিসের উপরে লোকের সন্দেহের সৃষ্টি ক'রেছেন। এসব মহা অপরাধ। কত দেবদেবী ঋষি মুনি বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ পাইতে বৃক্ষলতা রূপে রয়েছেন; তাঁদের এই প্রকার ক্ষতবিক্ষত করা মহা অপরাধ। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ, স্বাভাবিক আর নকল বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

আমি বলিলাম—এসব দেখে স্বাভাবিক কি না, কি প্রকারে বুঝ্‌ব? ছুরিতে কাটা অক্ষরও তো বেশীদিন জীবন্তগাছে থাক্‌লে স্বাভাবিকেরই মত দেখাবে।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—তা বটে। আচ্ছা, এক কাজ কর, গাছের যে সকল পুরু পুরু ছাল শুকিয়ে একটা দিক্ ছেড়ে গিয়ে আল্‌গা হ'যে আছে, তারই ভিতরে দৃষ্টি ক'রে দেখ। সেখানে তো আর লেখা চলে না।

আমি অমনি পুরাতন সেই বৃক্ষটির ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা আল্‌গা বাকল (ছাল) দুই খানা চট্ চট্ করিয়া টানিয়া তুলিলাম। ঠাকুর তখন—'উঃ! উঃ! কি কর্‌লে?' বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। আমি আর ছাল না ছিঁড়িয়া খুব মনোযোগপূর্ব্বক তাহার ভিতরের দিক্‌টা দেখিতে লাগিলাম। 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম' নাম পরিষ্কাররূপে বৃক্ষের শিরায় শিরায় লেখা হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। উঁচুতে গাছের শাখা প্রশাখায় আগায় ডালায় নিম্নদিকেও সুস্পষ্ট ঐ সব নাম দেখিতে পাইলাম। সে সব

স্থানে কোন প্রকারেই কেহ নাম লিখিতে পারে না, বুঝিলাম। দেবদেবী বা মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপে আছেন, অথবা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এসকল কথা আমার বিশ্বাস করিবার অধিকার নাই ; তবে এই বৃক্ষটি যে অসামান্য সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ঠাকুরের সঙ্গে সকলেই বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আমিও নমস্কার করিলাম।

***

মনোরম বনশোভা ; হিংসাশূন্য বৃন্দাবন।

কালীদহ দর্শন করিয়া আমরা যমুনার তীরে তীরে যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। বনের স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ছোট বড় সমস্তগুলি গাছই অন্যান্য স্থানের গাছপালা হইতে ভিন্ন প্রকারের দেখিলাম। উচ্চ উচ্চ প্রাচীন এবং বৃহৎ বৃক্ষ সকলও সর্ব্বত্রই নতশিরে রহিয়াছে। উহাদের শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন শ্রীধামের রজঃস্পর্শমানসেই বৃক্ষসকল শাখাবাহু বিস্তার করিয়া উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে, তাহারাও যেন রজঃস্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া স্থির সমাধি অবলম্বন করিয়াছে। বৃক্ষের এইপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা এ জীবনে আমি আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীবৃন্দাবনের ছোট বড় সমস্ত বৃক্ষ লতারই শাখা প্রশাখা, এমন কি, পত্রাদি পর্য্যন্ত নতমুখ। বৃক্ষের এইপ্রকার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য একমাত্র এই স্থানেই দেখিলাম। এই সকল বনের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর ভজনকুটীর পরিত্যক্ত ও শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, দেখিলাম। ঠাকুর বলিলেন—এক সময়ে এ সকল ভজনকুটীরে কত বৈষ্ণব মহাত্মারা সাধন ভজন ক'রেছেন। আহা! এ সব স্থান এখন চোর ডাকাতের আড্ডা হ'য়েছে।

এমন সুন্দর ভজনকুটীরগুলি শূন্য পড়িয়া আছে দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ সকল কুটীরে আজ কাল কি কেহ সাধন ভজন করিতে পারে না? বৈষ্ণব সাধুরা এ সকল স্থানে থাকেন না কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—থাকিবেন কিরূপে? এ সকল স্থানে থাক্‌তে হ'লে নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে থাক্‌তে হয়। একটি মাটির করোয়া, আর একখানা ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে থাক্‌লেই নিরাপৎ। না হ'লে সামান্য কিছু থাক্‌লেও চোর ডাকাতের অত্যাচার হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না।

আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনের ভিতর দিয়া চলিলাম। দুই পার্শ্বে ময়ূর ময়ূরী স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে, খেলা করিতেছে, আনন্দে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ৫।৬ হাত তফাতে থাকিয়াও তাহাদের ভয়ের লেশ নাই ; পালাইবার চেষ্টা নাই, স্ফূর্ত্তিরও

বিরাম নাই। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। বনের হরিণগুলিও মানুষকে যেন মানুষই মনে করে না; তাহারা নির্ভীকভাবে স্বচ্ছন্দ মনে নিঃসঙ্কোচে মানুষের গা ঘেঁষিয়া চলা ফেরা করে। ভগবানের রাজ্যে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিলে কখনও বিশ্বাস করিতাম না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বনের হরিণ, উড়ো ময়ূর, এরাও এত নির্ভীক কেন? ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যে হিংসা নাই; তাই এ স্থানের জীবজন্তু, পশুপক্ষী মানুষের নিকটেও এত নির্ভয়।

আমরা শ্রীবৃন্দাবনের গভীর অরণ্যে পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার এই সকল ভাব ও অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীবৃন্দাবনের এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে, লোকালয়ে আর ফিরিয়া আসিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয়, চিরজীবন এ সব স্থানে থাকিলেও ইহার নিত্য নূতনত্বের নিবৃত্তি ঘটে না।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব; সদ্‌গুরুসমাশ্রিতজনের গতি।

৭ই শ্রাবণ, ১২৯৭; মঙ্গলবার, ২২ জুলাই।

আহারান্তে হরিবংশ পাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—জাতিতে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কি কোন বিশেষ সুকৃতি ছিল?

ঠাকুর। তা নিশ্চয়। একটু বিশেষত্ব ছিলই।

আমি। যদি আবার সংসারে আস্‌তে হয়, কি ভাবে চল্‌লে বর্ত্তমান অবস্থা হ'তে নীচে আর যেতে হবে না? ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে চল্‌লে ভবিষ্যৎ জন্মেও ব্রাহ্মণই হয়?

ঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রে ঠিক সেই ভাবে চল। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক নিয়মমত রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার্‌লে আর কখনও নীচে যেতে হবে না। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা গায়ত্রী নিত্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্‌লে পরজন্মেও ব্রাহ্মণই হয়।

আমি। আমাদের এই সাধন যাঁহারা লাভ ক'রেছেন, তাঁহাদেরও কি আবার জন্ম নিতে হবে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া মাঠাকুরাণী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন দেখিয়াছিলেন, সাধনের সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে আছেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে খুব বেশী লোক নাই; তৃতীয় শ্রেণীতেই অনেক লোক। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে আছেন, তাঁহাদের আর আসিতে হইবে না, এবারেই তাঁহাদের শেষ জন্ম। যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন, তাঁহাদের আর একবারমাত্র আসিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে, তাঁহাদের আরও দুইবার আসিতে হইতে পারে।

আমি। আচ্ছা, যাঁরা সদ্‌গুরু লাভ ক'রে দেহত্যাগের পর আবার এই সংসারে আস্‌বেন, তাঁরা আবার সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ কর্‌বেন কি না?

ঠাকুর। তাতে আর কোনও সংশয় নাই, নিশ্চয়ই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ কর্‌বেন।

আমি। সদ্‌গুরুর কৃপাই যদি লাভ হয়, তা হ'লে আর সংসারে আসায় আপত্তি কি? মুস্কিলই বা কি?

ঠাকুর। বাপু, সংসারের মায়ায় বড় আশঙ্কা, সংসারে বড় জ্বালা।

আমি। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হ'লে এক জন্মেই কি মুক্ত হওয়া যায়?

ঠাকুর। নিঃসন্দেহে গুরুর আদেশ পালন কর্‌লে আর গুরুতে নিষ্ঠা জন্মালে এক জন্মেই মুক্ত হয়।

আমি। গুরুর আদেশ প্রতিপালন, চেষ্টা কর্‌লে ববং অনেকটা হ'তে পারে; কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। মনে আপনা আপনি যে সংশয় উপস্থিত হয়, তাতে বাধা দিব কিরূপে?

ঠাকুর। গুরু যা কর্‌তে বলেন তা কর্‌লেই হ'ল। সন্দেহ হয় হোক্‌, কাজ ঠিকমত কর্‌তে পার্‌লেই হবে।

আমি। যাঁরা এবার সাধন পেলেন, যত্ন ক'রে সাধন কর্‌লে তাঁবা কি আব সংসারে আস্‌বেন না? এই এক জন্মেই তাঁহাদের সব হ'য়ে যাবে?

ঠাকুব। তিন জন্মের পূর্ব্বে মুক্তি লাভ করিতে বড় দেখা যায় না। তিনটি জন্ম প্রায় লাগে।

আমি। তা হ'লে আমাদেব সকলেবই তিনটি জন্ম নিতে হবে?

ঠাকুব। হবে, আবার হবেও না।

আমি। যাঁরা এবাব সদ্‌গুরুব কৃপা লাভ কর্‌লেন, পূর্ব্বেও কি তাঁবা সকলে সদ্‌গুরুব আশ্রয় পেয়েছিলেন?

ঠাকুব। কেহ কেহ পূর্ব্বেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলেন; আর অনেকে এবারেও লাভ কর্‌লেন।

আমি। আমার কি পূর্ব্বেও সদ্‌গুরুব আশ্রয় লাভ হয়েছিল?

ঠাকুর মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে আমাব এই প্রশ্নেব উত্তর দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'সদ্‌গুরুব আশ্রয় নিয়ে যাঁদের তিন জন্মেই মুক্তি হবে, তাঁদেব মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কি সদ্‌গুরুবও সংসারে আসতে হবে? জন্ম নিয়া সদ্‌গুরু কি শিষ্যেব সঙ্গে থাকেন?

ঠাকুর। সদ্‌গুরু সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। জন্ম না নিয়েও কত রকমে, কত উপায়ে শিষ্যকে কৃপা করেন। বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য ইত্যাদির ভিতর দিয়া, নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া, সদ্‌গুরু কৃপা করেন। তাঁরা কি আর সর্ব্বদা আসেন? চার কল্প পরে নানক এবার এসে ছিলেন।

আমি। তা হ'লে ত বড় কষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে গুরু না পাইলে সে যে বড়ই বিষম।

ঠাকুর। কষ্ট ত বটেই। তবে যাঁরা গুরুবাক্যমত চলেন, তাঁদের আর কোন

কষ্টই ত নাই। নিজের ভাবমত স্বেচ্ছাচারে চল্‌লেই ঠেক্‌তে হয়। যতদিন না গুরুর বাক্যমত চ'লে, তাঁতে নিষ্ঠা জন্মায়, ততদিন বারংবার জন্মাতেই হবে। সদ্‌গুরুর সঙ্গে মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই তো, শিষ্যের কল্যাণের জন্যই তিনি সংসারে আসেন, শিষ্যের উপকারই তাঁর আসার উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর আদেশমত না চল্‌লে হবে কেন? ঠিক গুরুবাক্য ধ'রে চল্‌তে হয়, তা হ'লেই আর কোনও উৎপাত থাকে না।

আমি। অনেক সময়ে নাকি গুরু শিষ্যকে নানারূপে পরীক্ষা ক'রে থাকেন? তা হ'লে তাঁর যথার্থ আদেশ কি প্রকারে বুঝা যাবে?

ঠাকুর। যিনি সদ্‌গুরু তিনি কখনও শিষ্যকে পরীক্ষা করেন না। তা কর্‌বেন কেন? যাতে শিষ্যের যথার্থ কল্যাণ হয়, সদ্‌গুরু তাই ব'লে দেন। তবে যারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে নিজের মনোমত চলে, গুরু তাদেরই নানা অবস্থায় ফেলে ঠিক ক'রে নেন।

পিতৃ-ঋণাদি সম্বন্ধে উপদেশ।

বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন, সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন উঁহারই চাকরীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিছুদিন হয় পিতার দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া সতীশ অমনিই উদাসীনের মত বাহির হইয়া পড়িলেন, ঘরে বিধবা মাতার ক্লেশের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। পদব্রজে চলিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এখন ঠাকুরের সঙ্গে রহিয়াছেন। বাড়ীতে যাইয়া পিতার শ্রাদ্ধ এবং রুগ্না, শোকার্ত্তা মাতার সেবা করিতে ঠাকুর সতীশকে বহুবার বলিয়াছেন; কিন্তু সতীশ কিছুতেই ঠাকুরের এই আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিবেন না, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন—বলিতেছেন। ঠাকুর সতীশকে বাড়ীতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ ও সংসারধর্ম্ম করিতে বলিলেই সতীশের মাথা গরম হয়, তখন সতীশ ঠাকুরের সঙ্গে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক, গোলমাল আরম্ভ করিয়া দেন। আজ আবার ঠাকুর সতীশকে লক্ষ্য করিয়া খুব তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—সতীশের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হবে, বারংবার তা ব'লেছি। এখন না শুন্‌লে কি করা যায়? পিতৃঋণ শোধ না করলে ওর কিছুই হবে না; বাড়ী গিয়ে মাতৃ-সেবা না কর্‌লে এ জীবনটাই বৃথা যাবে। শুধু এ জন্ম কেন, এ অপরাধের দরুণ কত জন্ম বৃথায় যাবে ঠিক নাই। শুকপ্রভৃতির ন্যায় তেমন তীব্র বৈরাগ্য হ'লে কিছুতেই আট্‌কায় না সত্য; কিন্তু সেইমত না হ'লে ত হবে না। যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মান পর্য্যন্ত প্রণালী ধ'রে চল্‌তে হয়। যার যা কর্ত্তব্য তাহা উপেক্ষা ক'রে এড়ায়ে

যাবার যো নাই। সংসার কর্‌তে হরিমোহনকে ঢের ব'লেছি এখন ইঁহারা বুঝ্‌ছেন না; কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, এখন ঠিকমত না চল্‌লে এর পর সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় আদায় হবে। কথা না শুন্‌লে আর কি করা যায়? পরে বেশ বুঝ্‌বে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ ধরিয়া উহাদিগকে এইপ্রকার বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ হইতে কিসে মুক্ত হওয়া যায়?

ঠাকুর বলিলেন—পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ হ'তে; যাগ যজ্ঞ, পূজা, তীর্থ দর্শনাদি দ্বারা দেব-ঋণ হ'তে, এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষি-ঋণ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। আর উপায় নাই।

আমি। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর্‌লে কি পিতৃঋণ হ'তে মুক্ত হওয়া যায় না? সকলেরই কি এজন্য পুত্রোৎপাদন কর্‌তে হবে?

ঠাকুর। শুধু তর্পণাদি কর্‌লে পিতৃঋণে মুক্ত হওয়া যায় না। ঋণমুক্ত হওয়ার এই-ই উপায়। তবে যাঁহারা অক্ষম, তাঁদের জন্য ব্যবস্থা ভিন্ন রকম আছে।

আমি। অক্ষম আবার কিরূপ?

ঠাকুর। মনে কর, কারো শরীর খুব রুগ্ন; শারীরিক অসুস্থতার দরুণ পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ। অথবা অন্য কোনও বিশেষ অসুবিধা বা অক্ষমতায় সে কার্য্য সম্পন্ন হ'ল না, এরূপও হ'য়ে থাকে। অনেকের বিবাহ ক'রেও পুত্র জন্মাচ্ছে না। এ সব কারণে পুত্র না জন্মিলে ঋণদায়ী হ'তে হয় না।

আহারান্তে এরূপ প্রশ্নোত্তরে আমাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল। বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা বস্ত্রহরণের ঘাটে গেলাম। যমুনার দিকে দৃষ্টি করিয়া ঠাকুর বহুক্ষণ ঘাটের উপরে বসিয়া রহিলেন। মাঠাকরুণ, কুতু, ভারত পণ্ডিত মহাশয়*, সতীশ, শ্রীধর ও আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। পরে সতীশের সঙ্গে কথায় কথায় আমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। শ্রীধর তাহাতে যোগ দিলেন। সন্ধ্যার পরে আমরা সকলে কুঞ্জে আসিলাম।

বারদীর পথে শ্রীধরের কাণ্ড।

১০ই শ্রাবণ, ১২৯৭।

বৈকালে গুরুভ্রাতারা সকলে দাউজীর বারেন্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য ও দয়ার কথা হইতে লাগিল। শ্রীধরের একবার বিপিন বাবুর সঙ্গে বারদী যাইবার কালে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, গুরুভ্রাতারা সকলে তাহা

* বিক্রমপুর নিবাসী, গুরুনিষ্ঠ সাধনপরায়ণ গুরুভ্রাতা, ঢাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীধর যাহা বলিলেন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঘটনাটি শ্রীধরের কথামত নিম্নে লিখিয়া রাখিলাম।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। ঢাকায় আসিয়া গুরুদেবের সম্মতিক্রমে শ্রীধর প্রভৃতি কয়েকটি গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বারদী যাত্রা করিলেন। শ্রীধর উপদেশ করিলেন—"শূন্য হস্তে সাধুদর্শন করিতে নাই।" তদনুসারে ব্রহ্মচারীর সেবার জন্য নানাবিধ তরিতরকারি, ফল-ফলাদি সঙ্গে লওয়া হইল। বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ৪টি ফজলি আম অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া, বিপিন বাবু স্বহস্তে উহা ব্রহ্মচারীকে দিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় যত্নের সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। শ্রীধর সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার মতিগতির স্থিরতা নাই; যদি রাস্তায় কোন ফাঁকে আম কয়টি সাবাড় করেন, ভাবিয়া বিপিন বাবু শ্রীধর প্রভৃতির জন্যও পৃথক্ একটুক্‌রি আম ক্রয় করিয়া লইলেন। নৌকাতে জিনিসপত্রগুলি গুছাইবার সময়ে শ্রীধর ফজলি আম কয়টির প্রতি মনোযোগের সহিত নজর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিপিনবাবু শ্রীধরকে বলিলেন— "ভাই, দোহাই তোমার। বড় আশা ক'রে এই আম চারিটি মহাপুরুষের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। উহাতে হাত দিও না। তোমাদের জন্যও একটুক্‌রি ভাল আম পৃথক্ নিয়াছি। তাহাই খাইও।" শ্রীধর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন - "তুমি বল কি, য়্যা? এমন কথা তুমি আমাকে বল্‌তে পার্‌লে? ব্রহ্মচারীর জন্য প্রাণের আগ্রহে একটা জিনিস নিয়ে যাচ্ছ, তা আমি খাবো। এপ্রকার নীচ কল্পনা তোমার মনে এলো কি ক'রে, তুমি ত ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি।" বিপিনবাবু লজ্জিত হইয়া শ্রীধরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিছু দূর চলিয়া নৌকাখানা একটা বাজারের কাছে পৌঁছিল। গুরুভ্রাতারা সকলেই বাজারে উঠিলেন। শ্রীধরকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে বিপিনবাবু দুই তিন বার চেষ্টা করিলেন; শ্রীধর ভজনময়, মৌন থাকিয়া হাত নাড়া দিয়া বুঝাইলেন—"তোমরা যাও। আমি যাব না।" নৌকা হইতে নামিয়াও বিপিনবাবু শ্রীধরকে আর একবার বলিলেন—"ভাই, আম খেতে ইচ্ছা হ'লে, টুক্‌রিতে ভাল ভাল আম আছে, নিয়ে খেও।" শ্রীধর গম্ভীর রহিলেন। বিপিনবাবু চল্‌তি মুখেও পুনঃপুনঃ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কিয়দ্দূরে বাজারে প্রবেশ করিলেন। উঁহারা অদৃশ্য হইলে, শ্রীধর আসন হইতে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৪টি ৫।৭ বৎসরের উলঙ্গ বালক একটি ভিখারিণীর সহিত নৌকার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীধর আগ্রহের সহিত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও?" দুঃখী বালকেরা কহিল—"বাবা, কিছু খাবার দিবে?" শ্রীধর অমনি ছুটিয়া গিয়া সেই বড় বড় ফজলি আম চারিটিই নিয়া আসিলেন; পরে উহা সেই ভিখারী বালকদের হাতে দিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"যা, শীঘ্র চ'লে যা; না হ'লে আম আবার কেড়ে নিব।" বালকেরা শ্রীধরের ধমক শুনিয়া ভয়ে দৌড় মারিল। তখন শ্রীধর আবার আসনে গিয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং খুব উৎসাহের সহিত তদ্গত ভাবে ভজন গাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে, গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বিপিনবাবু যে পথে আসিতেছিলেন, সেই পথেই

বালক কয়টি, আম হাতে লইয়া যাইতেছিল। বালকদের হাতে বড় বড় ফজলি আম দেখিয়া বিপিনবাবুর চক্ষু স্থির। তিনি জিহ্বা কাটিয়া মাথায় হাত দিয়া গুরুভ্রাতাদের বলিলেন—"দেখ্‌লে? পাগলের কাণ্ড দেখ্‌লে? পাগলা সর্ব্বনাশ ক'রেছে। এত ক'রে যা নিষেধ করেছিলাম, পাগ্‌লা তাই ক'রেছে - সেই আম চারিটিই দিয়াছে।" বিপিনবাবু তখন আবার ·আট আনার পয়সা দিয়া, বালকদের নিকট হইতে আম কয়টি পুনরায় আদায় করিয়া লইলেন, পরে খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিন বাবু শ্রীধরকে খুব গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীধর তখন দ্বিগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিলেন। কতকক্ষণ পরে শ্রীধর ভজন শেষ করিয়া, বিপিন বাবুর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁকে খুব ধমক দিয়া বলিলেন—"কি, এ কি রকম? ভজনের সময়ে যে বড় গোলমাল করছিলে? তোমার আক্কেল নাই?" বিপিন বাবু, ধমক খাইয়া একটু দমিয়া গেলেও, পরে গুরুভাইদের বল পাইয়া বলিলেন—"তোমার তো খুব আক্কেল, তুমি কোন্ বিবেচনায় আমার আম চারিটি অন্যকে দিয়া দিলে?" শ্রীধর বলিলেন, "দিয়েছি তো কি হ'য়েছে? ফিরে পেয়েছ তো? হাতবদল হ'লেই দোষ হয়?" বিপিন বাবু বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর নামে আম রেখেছিলাম, তুমি কাহার হুকুমে অন্যকে দিলে?" শ্রীধর বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর হুকুমেই দিয়েছি। যাও, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।" এইরূপ বচসার পর দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত। প্রদীপ জ্বালিতে 'পলিতা' নাই। "একটু ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া কোথায় পাই"—ভাবিয়া সকলেই ব্যস্ত হইলেন। শ্রীধরের ঝোলার ভিতরে রাশীকৃত টুক্‌রা টুক্‌রা ময়লা ন্যাক্‌ড়া আছে, সকলেই জানে। উহা সহজে শ্রীধর খুলেন না, ময়লা ন্যাকড়ার ঝোলাটি মাথায় দিয়া শয়ন করেন। বিপিন বাবু অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া গুরুভ্রাতাদের ইঙ্গিতমত পলিতার ন্যাকড়ার জন্য শ্রীধরের ঝোলা হইতে যেমন একখানি ছেঁড়া টুক্‌রা বাহির করিলেন, অমনই শ্রীধর এক বিকট চীৎকার করিয়া বিপিন বাবুর সম্মুখে গিয়া পড়িলেন, এবং কিছুমাত্র কথা না বলিয়া তাঁহার উরুর মধ্যস্থলে কামড়াইয়া ধরিলেন। বিপিন বাবু "বাবারে, মারে, খুন কর্‌লেরে", বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা আসিয়া টানাটানি করিয়া যখন ছাড়াইতে পারিলেন না, তখন শ্রীধরের পিঠে সকলে কিলের উপর কিল মারিতে লাগিলেন। তাহাতেও শ্রীধরের ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলে তখন নৌকার পাটাতন তুলিয়া শ্রীধরের পৃষ্ঠে দড়াম্ দড়াম্ মারিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধর এসময়ে ঘন ঘন মাথা ঘাড় নাড়া দিয়া অধিকতর তেজের সহিত প্রাণপণে কামড়াইতে লাগিলেন। ক্ষত বিক্ষত উরু হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তখন অনুপায় দেখিয়া মাঝিরা বলিল—"আপনারাও সকলে ওকে কামড়াইয়া ধরুন, তা হ'লেই ছেড়ে দিবে।" মাঝিদের কথামত শ্রীধরের পিঠে দুই তিন জনে কামড়াইয়া ধরিল। শ্রীধর তখন কামড় ছাড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; "জয় নিতাই", "জয় নিতাই" বলিয়া দুই একটি লম্ফ দিয়া, চলন্ত নৌকা হইতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সাঁতার জানেন না, সকলেরই জানা ছিল। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া নদীতে পড়িলেন। চুবুনির উপর চুবুনি খাইয়া

সকলে টানাটানি করিয়া শ্রীধরকে নৌকায় তুলিলেন। সারা রাত এই প্রকার উদ্বেগে কাটিয়া গেল। ক্রমে নৌকা গিয়া বারদীর বাজারে পৌঁছিল।

সকাল বেলা সকলে ফল-ফলাদি সিধার সামগ্রী হাতে লইয়া, ব্রহ্মচারীর দর্শনে যাত্রা করিলেন। শ্রীধরের কিছুই নাই; ব্রহ্মচারীর জন্য কি লইয়া যাইবেন, ভাবিয়া শ্রীধর মনোদুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ নৌকা হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া খাল হইতে দল ঘাস, কলমী শাক, লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া খালের পাড়ে জড় করিতে লাগিলেন; রাশীকৃত জমা হইলে পর, লেংটিমাত্র পরিয়া, বহির্বাস দ্বারা উহা আঁটিয়া বাঁধিয়া লইলেন; তৎপরে ঘাসের প্রকাণ্ড বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইয়া, ব্রহ্মচারীর আশ্রমের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। এদিকে বিপিন বাবু প্রভৃতি আশ্রমে যাওয়া মাত্রই ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইলেন না। একটু অপেক্ষা করিতে হইল। যথাসময়ে ব্রহ্মচারী সকলকে ডাকিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বসামাত্রই ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরে, সেই শ্রীধর কোথায়? তোদের সঙ্গে আসে নাই?" গুরুভ্রাতারা বলিলেন—"সে নৌকায় ব'সে আছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"কেন সে এল না? তাকে কি তোরা মেরেছিস্?" বিপিন বাবু বলিলেন—"মহাশয়, তাকে নিয়া বড় জ্বালাতন। সে সারা রাস্তা বড় উৎপাত করেছে। আমার উরু কামড়ায়ে ঘা ক'রে দিয়েছে।" ব্রহ্মচারী আম দেখিয়া বলিলেন—"তোরা এ আম আবার কোথায় পেলি?" এই সময়ে মাথায় বোঝা লইয়া শ্রীধর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরকে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী আসন হইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন; অমনই শ্রীধর ঘাসের বোঝাটি ব্রহ্মচারীর সম্মুখে ক্রমে করিয়া ফেলিয়া দিয়া, "এই খা, এই খা" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া লম্বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী একমুখ হাসিয়া খুব প্রফুল্ল ভাবে ঘাসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব কি ব্রহ্মচারীকে খেতে দিলে?" শ্রীধর মাথা তুলিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন—"শাস্ত্র জান? 'গোব্রাহ্মণহিতায়চ'।" উঁহারা বলিলেন—"শাস্ত্রের অর্থটা কি হ'লো?" শ্রীধর বলিলেন—"আরে, আগে গরুর; পরে বামুণ বেটাদের; তারপর তোমার, আমার, জগতের। 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ'॥ তা হ'লে আগে গরুর যা প্রিয় তাই তো ব্রহ্মণ্যদেবেরও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।" শ্রীধরের কথা শুনিয়া সকলে খুব হাসিতে লাগিলেন। বিপিন বাবু তখন নিজের রোগের পরিচয় দিয়া আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন—"শ্রীধর না তোর উরু কামড়ায়েছে? রক্ত পড়েছে তো?" বিপিন বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, ভয়ানক কামড়ায়েছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"ওতেই তোর রোগ সেরে যাবে। কেন শ্রীধর কামড়ালে, তা একবার জিজ্ঞাসা করিস্ নাই?" তখন শ্রীধরকে সকলে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীধর খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আরে ভাই, তোরা ত সকলে বাজারে গেলি। আমি হঠাৎ সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম। নৌকা হ'তে বাইরে এসে চারি দিক্ তাকায়ে দেখি, সঙ্কীর্ত্তনাদি কিছুই না। ব্রহ্মচারী মহাশয় চারিটি

ঋষিবালক লইয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত। বলিলেন—"ওরে, আমার জন্ম যে চারিটি আম রয়েছে, তাই এনে এদের দিয়ে দে।" আমি অমনি আম কয়টি দিয়ে দিলাম। সত্য মিথ্যা ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেও। এজন্ম ত আমাকে তোমরা কত গালি দিলে! তোমাদেব কথায় কাণ না দিয়ে আমি নাম কর্‌তে লাগ্‌লাম। আকাশপথে একটি সঙ্কীর্ত্তন আস্‌ছে দেখ্‌লাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় সঙ্কীর্ত্তনের আগে আগে এসে বল্‌লেন—'ওরে, ওর উরু কামড়ায়ে রক্তপাত ক'রে দে, ওর রোগটা তাতে সেরে যাবে।' আমি ভাবিলাম শুধু শুধু কামড়াই কিরূপে? এই সময়ে বিপিন বাবুর দিকে চেয়ে দেখি তিনি আমার ঝোলা হ'তে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া টেনে বার কর্‌ছেন। অমনি আমার মাথা গরম হ'ল। নেপাল, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ ও পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি প্রত্যেকের ব্যবহারের কিছু না কিছু, বহির্ব্বাস, লেংটি, আসনাদির টুক্‌রা সংগ্রহ ক'রে, আমাব ঝোলা পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছি; ওসব আমার বুকের রক্ত। ময়লা ব'লে নোংরা বাজে ন্যাক্‌ড়া ভেবে যেমন বিপিন বাবু একখণ্ড বার কর্‌তেছিলেন, আমি অমনি তাঁর উরু কামড়ায়ে ধর্‌লাম। তাব পর তোমবা কিলই মার, আর লাঠিই মার, রক্তপাত না হ'লে ত আমি ছাড়্‌ব না। বক্তপাত হতেই আমি লাফায়ে উঠ্‌লাম। সম্মুখে দেখি, তুমুল সঙ্কীর্ত্তন। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত প্রভু নৃত্য কর্‌ছেন এবং গোঁসাই সঙ্কীর্ত্তনের আগে আগে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছেন। আমি অমনি ঐ সঙ্কীর্ত্তনে লাফায়ে পড়্‌লাম। পবে দেখি চুবুনি খাচ্ছি। তখন তোমবা সকলে আমাকে টানাটানি ক'বে নৌকাব উপরে তুল্‌লে।" শ্রীধরের মুখে উক্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই তখন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। ধন্য শ্রীধব!

ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা।

আজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের মহাযোগ। শুনিলাম, সহস্র সহস্র লোক স্নানার্থে তথায় সম্মিলিত হইয়াছেন। আমাদের কুঞ্জেবও সকলেই আজ সেখানে গিয়াছেন। আমি অন্যান্য দিনের মত, সকাল বেলা শৌচান্তে যমুনায় স্নান কবিতে চলিলাম, ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি কেশিঘাটে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন ক'রে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ক'রে, শীঘ্র চলে এস। একটি শিখা রেখো।

১২ই শ্রাবণ, ১২৯৭
শুক্লাদশমী তিথি, রবিবার।

আমি গুরুদেবের কথা অনুসারে যমুনাতীরে যাইয়া কেশিঘাটে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখামাত্র অবশিষ্ট রাখিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া দেখি, অসংখ্য লোকের সমাগমে ব্রহ্মকুণ্ড আজ পরিপূর্ণ। জল ভাং গোলার মত এবং অতিশয় কদর্য্য ও ময়লা হইলেও স্নানার্থীদের ভাব ভক্তি দেখিয়া আমারও স্নানেব জন্য অতিশয় আগ্রহ জন্মিল। অবগাহনান্তে তর্পণ সমাপন করিয়া, অবিলম্বে কুঞ্জে আসিলাম। গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণামান্তে স্বীয় আসনে গিয়া বসিলাম। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কুলদা, আমার আসনঘরে এস। এখনি তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য

দিব। বস্‌বার একখানা আসন নিয়ে এস।” আমি একখানা আসন লইয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঠাকুর পূর্ব্বেই নিজ আসনে আসিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে বলিলেন—“পূর্ব্ব মুখ হ’য়ে আমার সম্মুখে ব’স।” আমি কম্বল আসনখানা পাতিয়া ঠাকুরের সম্মুখে স্থির হইয়া বসিলাম। তখন আমার হু হু শব্দে কান্না আসিয়া পড়িল। ভাবিলাম, গুরুদেব আজ আমাকে ঋষি মুনিদের পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষা দিতেছেন। ঠাকুরের কত দয়া! ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে আমাকে বলিতে লাগিলেন—

এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বার বৎসর, তিন বৎসর, বা এক বৎসরের জন্যও নেওয়া যায়। এখন তোমাকে এক বৎসরের জন্যই এই ব্রত দিচ্ছি। যদি নিয়ম রক্ষা ক’রে ঠিকমত এই এক বৎসর চল্‌তে পার, তবে আবার দেওয়া যাবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠাই মূল। নিষ্ঠাটি খুব চাই। নিজের নিষ্ঠা কোন অবস্থায়ই ত্যাগ করবে না। যে সব নিয়ম ব’লে দিচ্ছি, নিষ্ঠার সহিত সে সব নিয়ম রক্ষা ক’রে চল্‌বে।

১। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে সাধন করবে। পরে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন ক’রে, শুচি শুদ্ধ হ’য়ে আসনে বস্‌বে। গায়ত্রী জপ করবে। তার পর গীতা অন্ততঃ এক অধ্যায় ক’রে পাঠ করবে। পাঠ শেষ ক’রে আবার সাধন করবে। স্নানান্তে গায়ত্রী জপ ক’রে তর্পণাদি করবে।

২। স্বপাক আহার করবে, অথবা ভাল ব্রাহ্মণের রান্না অন্নও আহার করতে পার। আহারে কোন প্রকার অনাচার না হয়। আহারের একটা নিয়ম রাখ্‌বে। পরিমিত আহার করবে, খুব বেশী বা কম না হয়, যাতে কামভাব উত্তেজিত হয় এমন বস্তু খাবে না। অধিক পরিমাণ ঝাল, অম্ল, মিষ্টি ত্যাগ করবে। মধু ও ঘৃতে উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়; এ সব বস্তুও অধিক খাবে না। আহারসম্বন্ধে সর্ব্বদাই খুব সাবধানে থাক্‌বে। আহারটি বেশ শুদ্ধমত করবে।

৩। আহারান্তে কিছুক্ষণ ব’সে বিশ্রাম করবে। পরে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি কিছু সময় পাঠ করবে। পাঠের পর নির্জ্জনে ব’সে ধ্যান করবে। বিকাল বেলায় ইচ্ছা হ’লে একটু বেড়াতে পার।

৪। সন্ধ্যার সময়ে গায়ত্রী জপ করবে। পরে সাধনাদি যেমন ক’রে থাক তেমনই করবে। খুব ক্ষুধা বোধ হ’লে সামান্য কিছু জলযোগ করবে। অন্নাহার দু’ বেলা করবে না।

৫। নিতান্ত সামান্য বসন পর্‌বে। সামান্য শয্যায় শয়ন কর্‌বে। এ সকল নিজের নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। দিনের বেলায় নিদ্রা ত্যাগ কর্‌বে। সময়ে সময়ে সাধুসঙ্গ কর্‌বে, সাধুদের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শুন্‌বে। নিজের সাধনে বিশেষরূপে নিষ্ঠা রাখ্‌বে।

৬। কাহারও নিন্দা কর্‌বে না; কাহারও নিন্দা শুন্‌বে না; যে স্থানে নিন্দা হয় সে স্থান বিষবৎ ত্যাগ কর্‌বে।

৭। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব রাখ্‌বে না। যিনি যে ভাবে সাধন করেন তাঁকে সেই ভাবেই সাধন কর্‌তে উৎসাহ দিবে।

৮। কাহারও মনে কষ্ট দিবে না; সকলকেই সন্তুষ্ট রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। অন্যের সেবা তোমার দ্বারা যতদূর সম্ভব হয়, কর্‌বে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতির যথাসাধ্য সেবা কর্‌বে। নিজেকে অন্যের নিকটে ছোট মনে কর্‌বে। সকলকে মর্য্যাদা দিবে। প্রতি কার্য্যই বিচার ক'রে কর্‌বে। সর্ব্বদা প্রতি কার্য্যে বিচার ক'রে চল্‌লে কোন বিঘ্ন হয় না।

৯। সর্ব্বদা সত্য বাক্য বল্‌বে; সত্য ব্যবহার কর্‌বে। অসত্য কল্পনা মনেও আস্‌তে দিবে না। কথা কম বল্‌বে।

১০। যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ কর্‌বে না। দেব দর্শনে, গোলমালে, রাস্তায় ঘাটে বা অজ্ঞাতসারে স্পর্শ হ'লে তাহা স্পর্শমধ্যে গণ্য হবে না। অতি গোপনে নিজের কাজ ক'রে যাবে।

১১। সর্ব্বদাই খুব শুচি শুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে। পবিত্র স্থানে, পবিত্র আসনে বস্‌বে।

এ সমস্ত নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার্‌লে আগামী বৎসর আরও নিয়ম ব'লে দেওয়া যাবে।

এই সব নিয়ম উপদেশ করিয়া ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া খুব প্রাণায়াম করিতে লাগিলেন। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়াম করিতে বলিলেন, আমিও করিতে লাগিলাম। পরে দুর্লভ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আমার দীক্ষা দিলেন। এ সময়ে আনন্দে আমার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল। ভাবে অভিভূত হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে ঠাকুর আমাকে উঠিতে বলিলেন।

আমি যেমনি ঠাকুরের ঘর হইতে বাহির হইলাম, অমনি সকলে কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ব্রতের বিষয়ে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না।

বিচারপূর্ব্বক দানের উপদেশ।

বিকাল বেলা আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীদর্শনে বাহির হইলাম। মন্দিরের নিকটে একটি বৃদ্ধকে দেখিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ অতিশয় জবাতুর, কাঙ্গালবেশ। ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া, হাবভাবে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ইঙ্গিতে কিছুই বুঝিলাম না। এ সময়ে আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বৃদ্ধ কি বল্‌ছে?' ঠাকুর বলিলেন—'তোমার গায়ের কম্বলখানা চায়।' আমি বলিলাম—'দিয়া দিব নাকি?' ঠাকুর বলিলেন—'তোমার ইচ্ছা হ'লে দিতে পার।' আমি তখন কম্বলখানা বৃদ্ধকে দিয়া, খালি গায়ে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার গায়ের অন্য কোন কাপড় নাই?' আমি বলিলাম—'শুধু একখানা ছেঁড়া ধুতি আছে। আর কিছু নাই। সকাল বেলা গায়ের আলোয়ানখানা একটি ভিখারীকে দিয়া দিয়াছি।' ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—'যে বস্তুর অভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পেতে হয় সেরূপ নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তু ছেড়ে দিতে নাই। উহার অভাবে কষ্ট হ'লে যদি একবারও দানের জন্য অনুতাপ হয়, তবে সবই মাটি। এই জন্য সকল কার্য্যই বিচার ক'রে কর্‌তে হয়। যাক্, ভগবান তোমার যোগাড় রেখেছেন।'

কুঞ্জে আসিয়া ঠাকুর মাঠাক্‌রুণকে বলিলেন—তোমার আসনের কম্বলখানা কুলদাকে পেতে শুতে দিও। মাঠাক্‌রুণ তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহার কম্বলখানা আনিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণীর বহুদিনের সাধন ভজনের কম্বল আসন পাইয়া, নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম। প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল।

আসনের গ্রন্থ।

ভোরবেলা যথারীতি প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে যমুনায় যাইয়া স্নান ও তর্পণ করিলাম। কয়েকদিন-যাবৎ ব্রাহ্মবন্ধু গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্রও আমার সঙ্গে তর্পণ করিতেছেন। তর্পণ করিয়া নাকি তাঁহার শরীর হাল্‌কা হাল্‌কা বোধ হয়, মনেও তিনি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। উঁহার এ কথা শুনিয়া অবধি আমারও তর্পণের উপর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। স্নানান্তে নিজের আসনে বসিয়া কিছু সময় সাধন করিলাম। আমার প্রতি প্রত্যহ এক এক অধ্যায় গীতাপাঠের আদেশ হইয়াছে; অথচ গীতা আমার নাই। সাহস করিয়া ঠাকুরের আসনঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গীতাখানি লইয়া আসিলাম। পরে পাঠান্তে পুনরায় উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—আসনের গ্রন্থ কখনও স্থানান্তরিত কর্‌তে নাই, ক্ষতি হয়।

১৩ই শ্রাবণ, সোমবার; ১২৯৭।

আমি। আমাকে গীতা পাঠ কর্‌তে বলেছেন, আমার গীতা নাই।

ঠাকুর। ঐ গীতাই তুমি স্বচ্ছন্দে পড়। অন্য ঘরে না নিলেই হ'ল। আমার আসন-ঘরে ব'সে পড়্‌তে পার।

আমি। আসন হ'তে গ্রন্থখানি তুল্‌লেই তো স্থানান্তরিত করা হবে?

ঠাকুর। তাতে কোনও দোষ হয় না। আসনঘরে থাক্‌লেই হ'ল।

দৃষ্টিসাধন।

অপরাহ্নে কিয়ৎকাল দৃষ্টিসাধন করিয়া, ঠাকুরকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—অনেককালযাবৎ ক্ষিতিতেই দৃষ্টিসাধন ক'রে আস্‌ছি। এখন কি অন্য ভূতে অভ্যাস কর্‌ব? ঠাকুর বলিলেন—না, এখনও এই কর। আরও পাকুক। একটায় ঠিক হ'য়ে গেলে অন্যটায় করা ভাল। একটিমাত্র বিন্দুতে সমস্তটি দৃষ্টি স্থির কর্‌তে হয়।

আমি। দৃষ্টিসাধনে কি উপকার হয়? ঠাকুর বলিলেন—চক্ষু পরিষ্কার হয়; দৃষ্টিশক্তি খুব বৃদ্ধি হয়। অতি দূরবর্ত্তী বস্তু আর সূক্ষ্ম বিষয় সকলও পরিষ্কার দেখা যায়। আর আর যা হয়, দৃষ্টি সাধন কর্‌তে কর্‌তেই তা বুঝ্‌বে।

'কর্‌তে কর্‌তেই বুঝবে'—ঠাকুর এইরূপ বলায় আমার আর কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। মনে করিলাম, এই কথা দ্বারাই আমাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

শ্রীবিগ্রহদর্শনের উপদেশ।

কিছুকাল পরে ঠাকুর নিজ হইতে বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে যত দিন থাক্‌বে, প্রত্যহ মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রো, উপকার পাবে। আমি বলিলাম—ঠাকুর তো পাথরের মূর্ত্তি, উহা দর্শন ক'রে কি উপকার হবে? আপনার সঙ্গে কতদিনই তো দর্শন কর্‌লাম। উপকার যে কি হ'ল তা তো বুঝলাম না।

ঠাকুর কহিলেন—যেসব স্থলে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন, সেসব স্থানে ওসব ভাবের একটা যোগ থাকে। ওসব স্থানে গেলেই ভিতরের ধর্ম্মভাব সকল জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। এ কি কম উপকার? আর এই শ্রীবৃন্দাবনের বিগ্রহ সকল সাধারণ প্রস্তরমূর্ত্তি নন। "ভক্তমাল" প'ড়েছ? একবার প'ড়ো।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—শ্রীবৃন্দাবনের এসব ঠাকুর কি কথা বলেন? হাত পা নাড়েন? সকলেই বলেন, এখানকার ঠাকুর সব জাগ্রত। কি রকম জাগ্রত? ঠাকুর বলিলেন—

যাঁদের সেপ্রকার চোক কাণ আছে, তাঁরা ঠাকুরের হাত পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন। এ সব বল্‌লে, সাধারণ লোকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বে কেন?

স্বপ্ন। গঙ্গার আবর্ত্তে নিমজ্জন।

১৪ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

মাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের চা-সেবার এখন বেশ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের কৃপাভাজন শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু (ব্রহ্মানন্দ স্বামী), প্রবোধচন্দ্র এবং দক্ষ বাবু নিত্য চা খাইতে আমাদের কুঞ্জে আসেন। কাঠিয়া বাবার আশ্রিত শ্রীযুক্ত অভয় বাবুও প্রত্যহ আসিয়া থাকেন। সকলের চা-সেবার পর শ্রীধর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরে ঠাকুরের আদেশমত অভয় বাবু "ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্ট" পাঠ ও বঙ্গানুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইয়া থাকেন। ঠাকুর আজ এই পুস্তকখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্ট" নিত্য পাঠের উপযুক্ত। গ্রন্থখানা যিনি লিখেছেন তিনি একজন মহাপুরুষ।

সকলে চলিয়া গেলে, গত রাত্রের একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত ঠাকুরকে বলিলাম। স্বপ্নটি এই—নির্ম্মল, শীতল গঙ্গাজলে গলা পর্য্যন্ত নামিয়া প্রফুল্ল মনে স্নান করিতেছি, কোন দিকেই আমার দৃষ্টি নাই। অকস্মাৎ প্রবল স্রোতে পড়িয়া গেলাম। স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। খুব সাঁতার কাটিতে জানি বলিয়া সে দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। পরে যখন দেখিলাম তীর হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন পারে যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটিতে গিয়া, সর্ব্বাঙ্গ আমার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন অতিরিক্ত শ্রান্ত হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখি, অতিভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়াছি। তরঙ্গপরিশূন্য বহু বিস্তৃত আবর্ত্তজল মণ্ডলাকারে সোঁ সোঁ শব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ নীচের দিকে একটি অজ্ঞাতকেন্দ্র গহ্বরে যাইয়া পড়িতেছে। আমি সেই পাকজলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পাতালতলে যাইতে লাগিলাম। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, স্থল-কূল কোথাও নাই। তখন ভাবিলাম, 'হায়, এ কি হইল? পরমপবিত্রতোয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী গঙ্গার মধ্যে ছিলাম, ইহারই আবর্ত্তে পড়িয়া এখন রসাতলে চলিলাম!' এমন সময়ে হঠাৎ মেজ দাদা গঙ্গাতীরে আসিলেন, এবং আমার জীবনসঙ্কট অবস্থা দেখিয়া উন্মত্তবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অমনই গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং অনতিবিলম্বেই সাঁতার কাটিয়া আমার নিকটে পৌছিলেন। পরে বাম হস্তে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া তীরে উপনীত হইলেন। পারে উঠিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন—স্বপ্ন যা দেখ্‌বে, লিখে রেখো। অনেক সময়ে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যায়।

স্বপ্নের কথা হইতে হইতে মেজ দাদার কথা তুলিলাম। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মেজ দাদা কি দীক্ষা নিয়াছেন?

ঠাকুর। দীক্ষা নিয়ে থাক্‌লে দেখা হ'লেই জান্‌বে।

আমি। কি প্রকারে জান্‌বো? আমাকে কি আর বল্‌বেন?

ঠাকুর। তিনি না জানালেও তুমি বুঝ্‌বে। এ শক্তি যাঁরা পান তাঁদের কাছে কি আর ছাপাতে পারে?

আমি। আপনার কথায়ই ত বুঝা গেল, তিনি দীক্ষা পেয়েছেন। তবে স্পষ্ট ক'রে বলেন না কেন?

ঠাকুর একটি বালকের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা বল্‌ব কি ক'রে? তিনি যে আমাকে নিষেধ ক'রেছেন।"

ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া সকলেই খুব হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া দেখিতেছি, গুরুভ্রাতাদের উচ্ছিষ্টবিচার নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার কাহারও তেমন মতি নাই। আহারের পর সকলে এঁটো হাতে মাটি মাখেন, উচ্ছিষ্ট মুখে মাটি মলেন। তাঁহাদের হাতে জল দিতে গেলে, তাঁহারা আমাকে চাপিয়া ধরেন, আর জোর করিয়া ধূলাবালি আমার হাতে মুখে ঘষিয়া দিয়া বলেন, 'এইবার পবিত্র হ'লি।' স্নান করিয়া আসিবার সময়েও আমার পরিষ্কার শরীরে কাদা মাটি ধূলা ডলিয়া দেন। আমি রাগ করিলে বা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, পথের দু দিক হইতে বৈষ্ণব বাবাজীরা আমাকে ঠাণ্ডা হইতে উপদেশ দিয়া বলেন—"ক্রোধ করবেন না। আনন্দ করুন। ওতে রাধারাণীর কৃপা হয়, কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" গুরুভ্রাতাদের ইহাতে আরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আজ মধ্যাহ্নে হরিবংশপাঠের পরে গুরুভ্রাতাদের এসকল অনাচার অত্যাচার ও অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিকার প্রত্যাশায়, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম, 'শ্রীবৃন্দাবনের মাটির কি এতই গুণ যে উহা লাগাইলে উচ্ছিষ্টও শুদ্ধ হয়?'

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনের মাটি নয়, রজ বল্‌তে হয়। ব্রজের রজ পরম পবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের মাটির সহিত ইহার তুলনা হয় না। উচ্ছিষ্টাদি সমস্তই এই রজ লাগালে শুদ্ধ হয়, শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রজেই অধিক পবিত্র হয়।

আমি বলিলাম—খেয়ে দেয়ে উচ্ছিষ্ট হাতে মুখে রজ লাগ্‌লেই শুদ্ধ হবে? জল আর দিতে হবে না?

ঠাকুর বলিলেন—আমি যখন প্রথম এখানে এলাম, আহারের পর জল দিয়েই পরিষ্কার ক'রে আঁচাতাম ; ব্রজবাসীরা আমাকে বল্‌লেন, "বাবা, ব্রজ-রজ লাগানেসে অউর অধিক শুদ্ধ হোতা হ্যায়।" আমাকে দু'দিন এইপ্রকার বলাতে আমার মনে হ'ল, 'আচ্ছা দেখি না কেন ?' তৃতীয় দিনে আমি জল ব্যবহার না ক'রে হাতে মুখে রজ মাখ্‌তে লাগ্‌লাম। এইপ্রকার করতেই মন আমার একেবারে দ্বিধাশূন্য হ'ল, উচ্ছিষ্টের কোন একটা সংস্কারই রইল না। গঙ্গাজলে ধুলে যেমন পবিত্র বোধ হয়, আমার তেমনই বোধ হ'তে লাগ্‌ল। তার পর থেকে আমি এই রজ দিয়েই ড'লে ফেলি। পরিষ্কারের জন্য সামান্য একটু জল দিয়ে হাত মুখ ধুলেই হয়। এখানে ঠাকুরভোগের বাসন পর্য্যন্ত রজে ঘ'ষে নেয়, তাতেই পবিত্র হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রজ-রজের নাকি বড়ই গুণ ? উহা গায়ে মাখলে নাকি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় ? রজে বিশ্বাস না হ'লে কি শুধু গায়ে মাখলেই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হবে ?

ঠাকুর বলিলেন—মেখে দেখ্‌লেই বুঝতে পার। বিশ্বাস কর, আর নাই কর, বস্তুগুণ যাবে কোথায় ? কিছু দিন হ'ল একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন। দুই তিন দিন বিগ্রহাদি দর্শন ক'রে দাউজীর ওখানে এলেন। আমি তখন মন্দিরের কাছে ব'সে ছিলাম। কথায় কথায় আমাকে তিনি বল্‌লেন "মশায়, দেশে থাক্‌তে বৃন্দাবনের কত মাহাত্ম্যের কথাই শুনেছি। কিন্তু কই ? কিছুই ত দেখ্‌তে পেলাম না। রজের কত গুণ শুনেছিলাম, তাও তো কিছুই বুঝ্‌লাম না। আর দশটি স্থান যেমন, এও তো তেমনই দেখ্‌ছি।" আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'রজের বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনি একবার রজে পড়ে দেখুন দেখি।' তিনি একবার রজে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌লেন, "কই, যেমন তেমনই তো।" আমি ব'ল্‌লাম, 'গায়ের জামাটি খুলে ফেলুন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে রজে একবার গড়ায়ে নিন তার পর দেখুন কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না। তিনি তখনই পরীক্ষা করতে জামাটা খুলে রজে গড়াতে লাগ্‌লেন। দু তিন গড়ান দিতেই তাঁর কি হ'ল, তিনিই জানেন, হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন, "মশায় আমি ঘোর অবিশ্বাসী ; কিন্তু, জীবনে কখনও রজের এ গুণ ভুল্‌ব না।"

ঠাকুর এইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া, নানা দৃষ্টান্ত তুলিয়া, রজের অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে ঠাকুরদর্শনে বাহির হইলাম।

মথুরার পথে শ্রীধরের কীর্ত্তি।

আর আর দিনের ন্যায় বেলা ন'টার মধ্যেই আসনের কার্য্য শেষ করিলাম। ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—কয়দিন হরিমোহন জ্বরে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তোমাকে দেখ্‌তে চান। মনোমোহনের (মথুরার য়্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সার্জ্জন) বাসায় আছেন। আজই তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। পীড়িত অবস্থায় কেহ দেখ্‌তে চাইলে যেতে হয়। এখনই তুমি একবার যাও।

১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৭।

আমি বলিলাম—'আমি পথ চিনি না, মনোমোহন বাবুর বাসাও চিনি না। কার সঙ্গে যাব?' ঠাকুর শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন—কুলদাকে মথুরায় মনোমোহনের বাসায় নিয়ে যাও। কুলদা মথুরায় যায় নাই; হাসপাতালও চেনে না!

শ্রীধরের সঙ্গে চলিলাম। সতীশও আমাদের সঙ্গে হরিমোহনকে দেখিতে চলিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া বহু কষ্টে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা মথুরায় পৌঁছিলাম। স্বামিজী হরিমোহন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আরাম পাইলেন। কতকক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইলাম। শ্রীধরের মাথা গরম হইয়াছে। সারাটি রাস্তা তিনি আমাদিগকে বিষম ভোগাইয়াছেন। মনোমোহন বাবুর বাসায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়াই, কিছু না বলিয়া অনায়াসে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে চম্পট মারিয়াছেন! আমরা রাস্তা ঘাট কিছুই জানি না। বেলা প্রায় তিনটার সময়ে কুঞ্জে পৌঁছিলাম। আহারাদি করিয়া ঠাকুরের নিকটে বসামাত্রই ঠাকুর বলিলেন—শ্রীধর তোমাদের ঠিক রাস্তা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তো? কোন গোলমাল তো করেন নাই?

উত্তরে আমি বলিতে লাগিলাম—কুঞ্জ হইতে বাহির হইবার সময়েই শ্রীধর হাত মুখ নাড়া দিয়া 'চল্ মথুরায় চল্, এবার তোদের মথুরা দেখাব;' বলিয়াই, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সোজা উল্টাদিকে বংশীবটে উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে সেখান হইতে যমুনার তীরে তীরে একবারে রাধাবাগে লইয়া গেলেন। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীধর বলিলেন, "সোজা চল।" আমরা বলিলাম, 'পথ কোথায়?' শ্রীধর তখন দ্রুতপদে বনের ভিতরে আমাদিগকে ঘুরাইতে লাগিলেন। একই স্থানে দুই তিনবার, ঘুরিয়া ফিরিয়া বুঝিলাম শ্রীধরের মাথা গরম হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাই শ্রীধর, মথুরা কোন্ দিকে?' শ্রীধর উত্তর করিলেন "ময়ূর দেখ!" আমরা আর কি করি? চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে শ্রীধর পরিষ্কার পথে না চলিয়া রাস্তার ডাহিনে বামে বনের ভিতর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমরাও উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে দুর্ভোগ ভুগিতে ভুগিতে, অবশেষে আমরা একটা বিস্তৃত ময়দানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখন শ্রীধরকে নিকটে পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই

শ্রীধর, মথুরা আর কতদূর ?” শ্রীধর রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিলেন, “নমস্কার কর। এই গাছ গোঁসাই আবিষ্কার করেছেন।” আমরা বৃক্ষটিকে নমস্কার করিয়া দেখি, বৃক্ষটির সর্ব্বাঙ্গে দেবমূর্ত্তি ; গোড়ার দিকে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশাদির মূর্ত্তি আপনা আপনি হইয়া রহিয়াছে। হাতে তৈয়ারি মাটির পুতুলের মত, এত পরিষ্কার দেবমূর্ত্তি বৃক্ষে কি করিয়া উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া অবাক্ হইলাম। সতীশ ও আমি মূর্ত্তিগুলি মনোযোগের সহিত দেখিতেছি, সহসা শ্রীধর আবার ময়দানের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিলেন। আমরা উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া একটি বস্তিতে পৌছিলাম। ঐ বস্তির নানা কদর্য্য স্থানের উপর দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া, আবার একটা প্রকাণ্ড মাঠে নিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর ঐ বিস্তৃত মাঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কিছুক্ষণ খুব ধীরে ধীরে চলিলেন। পরে ময়দানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াই আমাদিগকে কিছু না বলিয়া লম্বা দৌড় মারিলেন। আমরা উঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিলাম। শ্রীধর তখন, একবার ডাহিনে একবার বামে, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমরা রাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না ; কি করিব ? উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলাম। এই ভোগ ভুগিয়া, অনেকক্ষণ পরে আমরা উঁহার সঙ্গে যমুনার তীরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীধর তখন ঘাসবনের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কিছু দূরে গিয়া, অকস্মাৎ “জলজন্তুরে, জলজন্তু”, বলিয়া ঘাসের উপর দিয়া দৌড় মারিলেন। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। কিছু দূরে গিয়া আমরা একটি ছোট খালের পাড়ে পৌছিলাম। তখন শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “শ্রীধর, এ কোথায় আন্‌লে ?” শ্রীধর বলিলেন “খাল পার হও।” আমরা বলিলাম, “তুমি আগে যাও।” তিনি বলিলেন, “সাঁতার জানি না।” সতীশ তখন ধমক দিয়া বলিলেন, “এস, এবার তোমাকে জলে চুবাব।” শ্রীধর অমনি অগ্রপশ্চাতে একবার তাকাইয়া সোজা দৌড় মারিলেন। আমরা অনুপায় হইয়া উঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। শ্রীধর, একটা স্থানে কতকগুলি হাড় দেখিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, হাড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে আমাদের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সতীশ বলিলেন—“শ্রীধর ও কি কর্‌ছ ? ওগুলো যে গরুর হাড়! ছিঃ ছিঃ।” একথা শুনিয়াই শ্রীধর “দাঁড়া শালা”, বলিয়া গরুর প্রকাণ্ড মেরুদণ্ডের হাড়খানা কাঁধে তুলিয়া সতীশকে তাড়া করিয়া আসিলেন। ‘পাগলা শালা এইবার খুন কর্‌বে রে’ বলিয়া সতীশ দৌড় মারিলেন, আমিও প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিলাম। শ্রীধর আমাদের ধরে ধরে অবস্থা। এ সময়ে গত্যন্তর না পাইয়া সতীশের সঙ্গে আমিও খালে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। শ্রীধরও ছুটিয়া আসিয়া সেই হাড় লইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সাঁতার জানেন না ; চুবুনি খাইতে খাইতে হাড় ছাড়িয়া দিলেন। তখন আমরাও কোন প্রকারে উঁহাকে টানাটানি করিয়া অপর পারে তুলিলাম। পরে অতি কষ্টে উঁহার সঙ্গে মথুরায় মনোমোহন বাবুর বাসায় গিয়া পৌছিলাম। স্বামিজী হরি-মোহনকে দেখিলাম, তিনি একটু ভাল আছেন। আরোগ্য লাভ করিয়াই তিনি এখানে আসিবেন। শ্রীধর মনোমোহন বাবুর নিকট হইতে আমাদের জলখাবার জন্য কয়েক আনা পয়সা আদায় করিয়া

বলিলেন—"ভাই, তোরা একটু ব'স, তোদের জন্য ছোলাভাজা নিয়ে আসি।" এই বলিয়া শ্রীধর সেখান হইতে সোজা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; এবং আমাদের জলখাবার সেই পয়সা দিয়া একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। আমরা উঁহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিয়া পরে চলিয়া আসিয়াছি।"

ঠাকুর শ্রীধরের এই সব পাগ্‌লামীর কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আমোদ দেখিয়া আমাদেরও খুব আনন্দ হইল। ধন্য শ্রীধর! তুমিই ধন্য! সাধন ভজন অপেক্ষাও তোমার এই পাগ্‌লামী শ্রেষ্ঠ।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঐ বৃক্ষটি কি আপনিই প্রথম বের করেছিলেন? ঐ সব মূর্ত্তিতে সিন্দুরাদির ফোঁটাও ত দেখ্‌তে পেলাম।

ঠাকুর বলিলেন—পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা কর্‌বার সময়ে ঐ গাছটি দেখি। তখন পর্য্যন্ত গাছটির দিকে কারো লক্ষ্য পড়ে নাই। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের ঐ গাছে ওসব দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখাতেই তাঁরা প্রচার ক'রে দেন। এখন পাণ্ডারা ঐ গাছটি দেখায়ে যাত্রীদের নিকট হ'তে প্রণামী নেন; সিন্দুরও পাণ্ডারাই দিয়াছেন।

আমি বলিলাম—'গাছটি কিন্তু বড়ই অদ্ভুত। শুনিলাম ঐ সব দেবদেবীরা নাকি সত্য সত্যই ঐ গাছে আছেন। দেবদেবীরা ওখানে ঐ জঙ্গলে গাছ আশ্রয় ক'রে থাক্‌বেন কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—আরে বাপু, কত দেবদেবী, ঋষি মুনি এই শ্রীবৃন্দাবনের রজ পাবার জন্য লালায়িত! এ স্থানে প্রত্যেকটি রজের কণায় মহাবিষ্ণু রয়েছেন।

অতঃপর, শ্রীবৃন্দাবনের রজের মাহাত্ম্য ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিতে শুনিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমরাও দাউজীঠাকুরের আরতি দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

স্বপ্ন। সংসার কর্‌তে হবে না।

১৭ই শ্রাবণ, ১২৯৭; শুক্রবার।

ভোর রাত্রিতে একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনটা বড় অস্থির হইয়া আছে। অবসরমত ঠাকুরকে স্বপ্নটি শুনাইলাম—"একটি নির্জ্জন মনোরম স্থানে পাঁচটি মহাপুরুষ আপনাপন আসনে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন; আমি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি সকলের চরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলাম। মহাপুরুষেরা আমাকে দেখিয়া সকলে একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? তুমি এখানে কেন? কি চাও? তোমার যে কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। সংসারের ঢের কর্ম্ম তোমাকে করতে হবে।" আমি বলিলাম, 'সংসারকর্ম্ম যদি আমার প্রারব্ধে থাকে, হবে। তবে প্রারব্ধ কর্ম্ম তো আমার ঠাকুরেরই হাতের মুটে। তিনি যা বলবেন তাই তো কর্ম্ম। তা ছাড়া আবার কর্ম্ম কি? আচ্ছা আমার গুরুদেবকে

গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে সংসার কর্‌তে বলেন কি না।' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া আমি আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাপুরুষদের কথা আপনাকে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করবেন না? সত্যই কি তবে আমাকে আবার সেই সংসার কর্‌তে হবে?" আপনি আমার প্রতি স্নেহভাবে দৃষ্টি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, না, সংসার আর তোমাকে কর্‌তে হবে না।" এই কথা কয়টি শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটি কি সত্য?"

ঠাকুর বলিলেন--এসব স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তোমার আর সংসারকর্ম্ম কিংবা ঘর গৃহস্থালী কর্‌তে হবে না। স্বপ্নটি লিখে রেখো। এখন থেকে সব স্বপ্নই লিখো। আরও কত দেখ্‌বে।

বৃক্ষরূপী বৈষ্ণব মহাপুরুষ।

গত কল্য শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার পথে বড় রাস্তার ধারে যে পুরাতন বটবৃক্ষটি দর্শন করিয়া আসিয়াছি, সেই বৃক্ষটি সম্বন্ধে দু' চার কথা তুলিতেই অনেক কথা হইতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে কত মহাপুরুষ আছেন, বলা যায় না। গুরুদেব নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বলিতে লাগিলেন—একদিন আমি বেড়াতে বেড়াতে রাধাবাগে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। যমুনাতীরে একটু নির্জ্জন স্থান দেখে সেখানে একটি বৃক্ষের তলে স্থির হ'য়ে ব'সে র'লাম। একটু পরেই 'সর্ সর্' শব্দ আমার কাণে আস্‌তে লাগ্‌ল। চেয়ে দেখি, সম্মুখে একটি গাছ কাঁপ্‌ছে। দেখে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমি বৃক্ষটির দিকে চেয়ে রইলাম। দেখ্‌লাম বৃক্ষ আর নাই, একটি পরম সুন্দর বৈষ্ণব মহাত্মা সেখানে দাঁড়ায়ে আছেন। তাঁর দ্বাদশাঙ্গে যথারীতি তিলক, গলায় কণ্ঠী, তুলসীর মালা, হাতেও জপের তুলসীমালা রয়েছে। আমি তার বিষয়ে জান্‌তে ইচ্ছা করায় তিনি আমাকে সমস্ত পরিচয় দিলেন, আর বল্‌লেন "এখানে আমি বৃক্ষরূপে আছি।" আরও অনেক কথা ব'লে তিনি তখনই আবার বৃক্ষরূপী হ'লেন। আমি একথা দু' একটি বৈষ্ণবকে বলায় তাঁহারা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না, বরং উপহাস ক'রে গৌর শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে বল্‌লেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে ওবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি সব তাঁকে পরিষ্কাররূপে বল্‌লাম। তিনি শুনে রজে গড়াতে লাগ্‌লেন, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন; পরে আমাকে বল্‌লেন—"প্রভু, এসব কথা যাকে তাকে বল্‌বেন না; বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বে না, উপহাস কর্‌বে।"

শুনিলাম পরে গৌর শিরোমণি মহাশয়ও রাধাবাগে এই বৃক্ষরূপী বৈষ্ণব মহাত্মাকে দর্শন করিয়া

আসিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাত্মারা আবার এখানে বৃক্ষরূপে থাকেন কেন?

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। অপ্রাকৃত লীলা এস্থানে নিত্যই হচ্ছে। বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা নিরুদ্বেগে তাহাই দর্শন করতে বৃক্ষাদিরূপে রয়েছেন; ব্রজধামে বাস ক'রে আনন্দে ভজন করেন, আর লীলা দর্শন করেন।

আমি বলিলাম—বৃক্ষরূপে যে সব মহাপুরুষ বৃন্দাবনে আছেন, তাঁহাদের ত আর সাধারণ লোকে জানতে পারে না। বৃক্ষের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার করলে ওসব মহাপুরুষদের কোনও ক্ষতি হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—এই জন্য ব্রজের বৃক্ষলতার উপরেও হিংসা নাই। অত্যাচার করলে তাঁদের ক্ষতি খুবই হয়। এই ত কিছুদিন হয় একটি বৃক্ষের উপরে অত্যাচার করায় ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়ে গেল।

বিষয়টি কি, জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—এখানে নিকটেই একটি কুঞ্জে অনেক দিনের একটি সুন্দর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজী গাছটিকে খুব সেবা যত্ন করতেন। এক দিন ওখানকার একটি বৈষ্ণব যুবতী রজস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে ধরলেন। রাত্রিতে বাবাজী স্বপ্ন দেখলেন—একজন বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তাঁকে এসে বললেন—"তোমার এই কুঞ্জে এত কাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবী অশুদ্ধ কাম-কলুষিত অবস্থায় বৃক্ষকে বারংবার জড়ায়ে ধরেছে। এতে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে; তাই আমি এস্থান ত্যাগ করলাম।" বাবাজী সকালে উঠে দেখলেন, বৃক্ষটি শুকিয়ে গেছে। আমরাও যেয়ে দেখলাম, একটি রাত্রের মধ্যেই সেই বড় বৃক্ষটি একেবারেই শুকিয়ে গেছে।

ঠাকুরের এসব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। মুঙ্গেরে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই গোলাপ গাছের কথা আমার আজ মনে পড়িল। ঠাকুরকে সেই গাছকয়টির কথা বলায়, তিনি বলিলেন—যথার্থ ভাবে সেবা করতে পারলে বৃক্ষের কথাও শুনা যায়।

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল বাস্তবিকই অদ্ভুত। ছোট বড় সমস্তগুলি বৃক্ষেরই শাখাপ্রশাখা লতার মত ঝুলিয়া ভূমির দিকে পড়িয়াছে, পাতাগুলি পর্য্যন্ত বোঁটার সহিত নিম্নমুখ। এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। নিধুবনে এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রাচীন কুঞ্জে ও বনে বড় বড় বৃক্ষসকল রজে লুটাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ঊর্দ্ধদিকে কেন যে বৃক্ষ উঠে না, তাহা কিছুই বুঝিতেছি না। বহুদিনের অতি পুরাতন অনেক বৃক্ষকে ঐসকল বনে লতা বলিয়া ভ্রম হয়। অদ্ভুত ব্রজভূমি! ভূমিরই বোধ হয় এই গুণ যে,

মস্তক তুলিতে দেয় না। উদ্ধত প্রকৃতি দুর্বিনীত লোকও শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করলে, রজঃ-প্রভাবে নতমস্তক হয়, ইহা আর অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অপরাপর শত শত দোষ থাকা সত্বেও ব্রজবাসিগণের স্বভাব মৃদু এবং বিনীত দেখিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনে দুরন্ত মশা।

শ্রীবৃন্দাবনে সারাদিন আনন্দ, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই আতঙ্ক। বেলা শেষ হ'তে থাকলেই মশার উৎপাতের কথা মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। এমন দুরন্ত মশা আর কোথাও দেখি নাই। রাত্রি হ'লেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিয়া গায়ে পড়ে। ঘুমাইবার তো যোই নাই, একস্থানে স্থির হইয়া একটুকু বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সারারাত ছটফট করিয়া কাটাই; মনে হয়, কতক্ষণে আবার ভোর হবে। রাত্রিতে ঠাকুরও ঘরে না থাকিয়া এখনও পূর্ব্ববৎ বারেন্দাতেই বসিয়া থাকেন। মাঠাকুরাণীও সমস্ত রাত্রি পাখা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করেন। ঠাকুর দু'তিনবার মাঠাকুরাণীকে বিশ্রাম করিতে বলেন; কিন্তু মা সেকথা শুনেন না, স্থিরভাবে ভোর পর্য্যন্ত মশা তাড়াইয়া থাকেন। হাওয়া করিয়া মাঠাকুরুণ ঠাকুরের সেবায়ই সারারাত্রি কাটাইয়া দেন। ওদিকে কুতু মশার কামড়ে ছটফট করেন। খুবই কষ্ট। ঠাকুরের একখানা মশারি ছিল—কিন্তু তাহা তিনি ব্যবহার করিতে পান নাই। শ্রীবৃন্দাবনে পঁহুছিয়া কয়দিন পরেই শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়েন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়া দেখেন, রাখালবাবু অন্ধকার ঘরে পড়িয়া আছেন। ঠাকুর অমনি কুঞ্জে আসিয়া নিজের মশারিখানা, দড়ি এবং ৪টি লোহার কাঠি লইয়া রাখালবাবুর ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রাখালবাবুর বিছানার উপরে নীরবে উহা টাঙ্গাইয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। আজ কথায় কথায় কুতু ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, শ্রীবৃন্দাবনে তো হিংসা করতে নাই, কিন্তু রাত্রে মশা তাড়াতে যে হিংসা হ'য়ে পড়ে?"

ঠাকুর বলিলেন—তুই মশা মারিস্ নাকি? দু' চার দিন মশাকে কামড়াতে দে না? পরে দেখ্‌বি, মশার কামড় আর লাগ্‌বে না।

কুতু বলিলেন—তোমার কি মশার কামড় লাগে না?

ঠাকুর বলিলেন—এখন আর লাগে না। প্রথম যখন এসেছিলাম, তখন খুব লেগেছিল। এক দিন মশা তাড়াতে হাতের উপর হাত বুলাতে গিয়ে দেখি মশাতে হাত পরিপূর্ণ। তখন আর কি করব? তাড়াতে গেলেই তো শত শত মশা ম'রে যাবে। আমি তখন হাত পা নাড়া চাড়া না ক'রে একভাবেই রইলাম। সারা রাত আমার এত রক্ত খেল যে, ভোরে উঠে আমার শরীর অবশ বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু তাতে আমার কোনও ক্ষতি হ'ল না, বড়ই উপকার হ'ল। তখন প্রতিদিন আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ত। মশা

যেদিন ওরূপ কামড়াল সেদিন থেকে আর আমার জ্বর হয় নাই। মশাতে ম্যালেরিয়ার বিষ সমস্ত চুষে নিল। সেদিন থেকে মশার কামড়ও আমার আর লাগে না। তোরা একটু স'য়ে থাক্‌তে পারিস্ না? দু' এক দিন স'য়ে থেকে দেখ্ দেখি, পরে আর লাগে কি না? আর না হয় মশাকে একটু বল্‌লেই তো পারিস্ যে আমায় কামড়াইও না। তা হ'লেই তো হয়।

কুতু। হ্যাঁ! মশাদের বল্‌লেই তারা শুন্‌বে কি না?

ঠাকুর—শুন্‌বে না? আচ্ছা, আমি ব'লে দেই, দেখ দেখি শুনে কি না? "মশা, তোমরা কুতুকে কামড়াইও না।" যা, এর পরে যদি তোকে মশায় কামড়ায় আমাকে বলিস্।

সাধনে নানা অনুভূতির ক্রম।

১৮ই শ্রাবণ, ১২৯৭; শনিবার।

আহারান্তে হরিবংশপাঠের পর আমরা সকলেই গুরুদেবের নিকটে বসিয়া আছি, গুরুদেব নিজ হইতেই ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—দর্শনের বিষয় যেমন ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে ধীরে ধীরে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়, শ্রবণও ঠিক সেইরূপই হ'য়ে থাকে। শ্রবণের আরম্ভে একরূপ কিচ্‌কিচ্ শব্দ কাণের মধ্যে প্রথম প্রথম শুন্‌তে পাওয়া যায়। ঐ শব্দ হ'তেই যদি বিরক্ত হ'য়ে অগ্রাহ্য করা যায়, তা হ'লে অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। নাম করতে করতে বেশ নিষ্ঠাপূর্ব্বক ঐ শব্দ শুন্‌তে হয়; নিষ্ঠা রাখলেই ধীরে ধীরে সকল প্রকার শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য শব্দের ন্যায় এ শব্দ নয়, এর মধ্যে একটু বিশেষত্ব থাক্‌বেই। তা প্রথম থেকেই টের পাওয়া যায়। নিষ্ঠা রেখে স্থির চিত্তে ঐ সকল শব্দ শুন্‌লেই ক্রমে ক্রমে কথাও শুনা যায়। তখন আলাপ করা যায়, জিজ্ঞাসা করে উত্তর পাওয়া যায়। আলাপ না করা পর্য্যন্ত যথার্থ বিশ্বাসটি কিন্তু হয় না। বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে আলাপকারীর অঙ্গাদি স্পর্শও ক্রমে ক্রমে পরিষ্কাররূপে হ'য়ে থাকে। এই স্পর্শ পাঞ্চভৌতিক স্পর্শ নয়। এ স্পর্শ অন্য রকমের। এ সব যখন হয় তখনই ঠিক বুঝা যায়; নিয়মমত সাধন ক'রে গেলে এসব অবস্থা সকলেরই হবে। ইচ্ছা কর্‌লেও হ'বে, না কর্‌লেও হবে। ঠিক সময়টি হ'লেই হবে। এই প্রকার আরও অনেক কথা বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। সে সব কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না। ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব দর্শন স্পর্শন

শ্রবণাদির জন্য এবং নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ কর্‌বার জন্য অন্য কোনপ্রকার সাধন কর্‌তে হয় কি ?

ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তরে 'এই নামেই সব' বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—একমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম অভ্যস্ত হ'লে সমস্তই হয়। শরীর হইতে আমি পৃথক্ এটি পরিষ্কার জ্ঞান না হ'লে ওসব অবস্থা হয় না। 'শরীর হ'তে আমি পৃথক্ বুঝ্‌তে হ'লে, শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাও বড় সহজ নয়; তিন চার লক্ষ নাম কর, বা তিন চার কোটীই নাম কর শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার কিছুতেই নয়। ইহার উপকারিতাই অন্যপ্রকার। সহজ শ্বাস প্রশ্বাসে একবার ঠিক্‌মত নামটি গেঁথে গেলেই আত্মদর্শন হয়। 'শরীর হ'তে আত্মা পৃথক্' জেনে, একটু স্থির হ'তে পার্‌লেই, সেই আত্মার নানাপ্রকার ক্ষমতা জন্মে। তখন ঐ আত্মা অনেক অলৌকিক কার্য্য অনায়াসে কর্‌তে পারে।

ঠাকুরের কথায় আমার গুরুতর ভ্রমের সংশোধন হইল। ২১৬০০ (একুশ হাজার ছয় শত) নাম সংখ্যা করিয়া প্রত্যহ জপ করাও, অল্প সময় শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম জপের চেষ্টার তুল্য নয়। সুতরাং ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হইয়া, আমার সেই সংখ্যাজপের পরিচয় আর দিলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আত্মার ঐপ্রকার ক্ষমতা জন্মালেও তখন কোন প্রকার অলৌকিক কার্য্য করায় কি কিছু অনিষ্ট হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—অনেককে দেখা গিয়াছে, ঐরূপ একটু ঐশ্বর্য্য হ'তে না হ'তেই উহা প্রয়োগ ক'রে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছেন। ঐ ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে নানাপ্রকার সম্পদ্-বৃদ্ধি, রোগারোগ্য এবং ইচ্ছানুযায়ী আরও অনেক অলৌকিক কার্য্য কর্‌বার ক্ষমতা হয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্মলাভের পথে উহা বিষম বিঘ্ন ও প্রলোভন। ঐ সকল ঐশ্বর্য্যলাভ হওয়া মাত্রই শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে নাই। তা হ'লেই ক্রমে ক্রমে নানা আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ হয়। আর শক্তি প্রয়োগ কর্‌লেই অল্পকালের মধ্যে তার সর্ব্বনাশ হয়; ধর্ম্ম কর্ম্ম তো চুলোয় যায়, ঐ শক্তিও নষ্ট হয়। কিন্তু উহা এমনই প্রলোভন যে, একটু কিছু হ'তে না হ'তেই শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে বড়ই সাবধানে থাক্‌তে হয়।

লালসম্বন্ধে ঠাকুরের অনুশাসন।

প্রসঙ্গক্রমে মাঠাকুরুণ এই সময়ে লালের কথা তুলিয়া বলিলেন, "লালের ভিতরে অনেক আশ্চর্য্য শক্তি দেখেছি। অনেকের অতীত জীবনের এমন সব গোপনীয় বিষয় তাদের বলেছেন যাহা তারা ব্যতীত সংসারে আর কেহই জানে না। অনেকের ভবিষ্যতের কথাও পরিষ্কার বলে দেন। সাধারণ

কথায়ও লালের এমন একটা শক্তি যে, যারা তা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে। যোগজীবন ঘরে বসে পড়াশুনা কর্‌তো, আর লাল গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে থেকে একপ্রকার শব্দ কর্‌তেন; ঐ শব্দের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যোগজীবন তা শুনে আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌তো না; পড়া ফেলে লালের কাছে অমনই ছুটে যেত। এই সব কারণেই যোগজীবন পরীক্ষাটা পাশ কর্‌তে পার্‌ল না।" মাঠাকুরুণ লালের সম্বন্ধে আরও অনেক ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলেন। তখন আমিও ক্রমে ভাগলপুরে লালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশের কথা বলিলাম। ঠাকুর সমস্ত কথা স্থিরভাবে শুনিয়া বলিলেন—পুনঃপুনঃ লালকে এসব কর্‌তে নিষেধ করেছি, কিছুতেই কথা শুনে না। এর পর ঠেকে শিখ্‌বে।

আমি একথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, কেন? কতকগুলি লোকের জীবনের ভার আপনিই তো লালের উপর দিয়েছেন; লালের মুখে শুন্‌লাম, তাদেরই কল্যাণ কর্‌তে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে!

ঠাকুর বলিলেন—সে কি? তুমি কি বল্‌ছ? পরিষ্কার ক'রে বল। লাল তোমাকে কি বলেছিলেন, ঠিক্ তাই বল।

ঠাকুর এভাবে আমাকে ঐ বিষয় বল্‌তে আদেশ করায় আমি বলিলাম—"লাল আমাকে পূর্ব্বেও একবার বলেছিলেন, এবারেও ভাগলপুরে বল্‌লেন, 'গোঁসাই বৃদ্ধ হয়েছেন, এতগুলি লোকের বোঝা কত আর তিনি বহন কর্‌বেন? তাই আমাদের এই তিনজনের উপরে সকলের ভার বিভাগ ক'রে দিয়েছেন; কতক শ্যামাকান্ত পণ্ডিতের উপর, কতক বিহারী নামে একটি পশ্চিমা সন্ন্যাসী গুরুভাইয়ের উপর, আর কতকগুলি আমার উপর।'" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি কাহার ভাগে পড়েছি?' লাল উত্তরে বলিলেন—'তুমি আমার ভাগে আছ।' ঠাকুর এসব কথা শুনিয়া বলিলেন—বটে, এতটা হয়েছে? বড় বেশী লাফালাফি আরম্ভ করেছে। মহাপুরুষদের কৃপায় সামান্য একটু সর্ষপবিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ছে। খুব শীঘ্রই ঐ কণাটুকু তুলে নিলে, সে যে নিজে কি তখন বেশ বুঝ্‌বে। থাম, ব্যস্ত নাই।

এই বলিয়া, আসনে উপবিষ্ট রহিয়াই ঠাকুর একবার একটু দক্ষিণে ও বামে নড়িলেন, তখনই আমার মনে হইল, 'আজ প্রলয় ঘটিল, লালের সর্ব্বনাশ হইল, আর নিস্তার নাই।'

সাধনপ্রভাবে দেহতত্ত্ববোধ।

কিছুক্ষণ পরে কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দেহতত্ত্ব শিক্ষা না থাকলে দেহের কোথায় কি রোগ, কেন রোগ, ইহা কিরূপে জানা যায়? আরোগ্যই বা কিরূপে হওয়া সম্ভব?'

ঠাকুর বলিলেন—এ শরীর থেকে আত্মা যে ভিন্ন, এটি বেশ পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হ'লেই, স্থূল শরীরের কোথায় কি আছে, সমস্ত ঠিক ঠিক চোখে পড়ে। তখন শরীরের

উপরের ও ভিতরের সকল স্থানের চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, মজ্জা, নাড়ীভুঁড়ী, শিরা ধমনী, যা কিছু আছে স্পষ্ট দেখা যায়। তখন শরীরের কোন্ স্থানে কোন্ বস্তুর অভাব, কোথায় কিসের আধিক্য, তাহাও ধরা যায়; পৃথিবীর কোন্ বস্তুর সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, তাহাও পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা যায়।

গৈরিক কি?

সতীশ কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—'গৈরিকবসন পরার কি একটা অবস্থা আছে, না ধর্ম্মার্থীরা ইচ্ছা করিলেই উহা ব্যবহার করিতে পারেন?'

ঠাকুর বলিলেন—গৈরিকগ্রহণ, ভস্মলেপন, দণ্ড কমণ্ডলু ও চিম্‌টা প্রভৃতি ধারণ, এ সকলেরই একটা একটা বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে। সেই সব অবস্থা লাভ হ'লেই ওসব চিহ্ন ধারণ কর্‌বার অধিকার হয়; না হ'লে বিড়ম্বনা, অপরাধ হয়। আজ কাল এসব বিষয়ে বিচার না থাকায় বিষম অনিষ্ট হ'চ্ছে। তোমাদের ওসব নিয়ে এখন কোনও প্রয়োজন নাই। অবস্থাটি হ'লে ওসব গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে। শাস্ত্রে আছে—ভগবতীর রজঃ হ'তে গৈরিক হয়েছে। গৈরিক বসনকে ভগবানবস্ত্র বলে। ভগবান্ নারায়ণের ঐ বসন। দেবদেবী, ঋষি মুনি, যোগী মহাপুরুষদের উহা বড়ই আদরের ও সম্মানের বস্তু। উহা গ্রহণ ক'রে যথার্থরূপে উহার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে না পারলে ভয়ানক অপরাধ হয়। গৈরিকবসনে কাহারও কোনরূপে একবিন্দু বীর্য্যপাত হ'লে, সমস্ত দেবদেবী, ঋষি-মুনি, সিদ্ধ মহাত্মাদের শাপগ্রস্ত হ'তে হয়। পূর্ব্বে এসব বিষয়ে দৃষ্টি ছিল, শাসন ছিল, জিনিসেরও ঠিক মর্য্যাদা ছিল। এখন বিদেশী রাজা, কে শাসন কর্‌বে? তাই ফিরিওয়ালারাও গৈরিক-বসন পর্‌ছে।

নিত্য নূতন তত্ত্বের প্রকাশ; পরতত্ত্ব।

আহারান্তে হরিবংশ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, ঠাকুর নিজ হইতে কোনও কথা তুলিলেই সাহস করিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্ন করি। যে দিন কথাবার্ত্তা হয়, সেদিন মাঠাকুরুণও বাসায় থাকেন, তাহা না হইলে শ্রীধরের সঙ্গে কুতুকে লইয়া দর্শনে চলিয়া যান। ঠাকুর যে দিন বাহির হন, আমরা সকলেই তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকি; আর যে দিন ঠাকুর বাসায় থাকেন, বাসার অন্যান্য সকলে দর্শনে গেলেও আমি ঠাকুরেরই কাছে বসিয়া থাকি, এবং অবসর বুঝিয়া নানা বিষয়ের প্রশ্ন করি। বিকাল বেলা ঠাকুর কোন কোন দিন আসনেই বসিয়া থাকেন; আর আমাদিগকে ঠাকুর দর্শনে যাইতে তাড়া দিতে থাকেন। কিন্তু নিজে সে দিন উদয়াস্ত একবারের

জন্যও আসন ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। ইহার তাৎপর্য্য কি, জানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিও নিয়মিতরূপে দর্শনে যান না কেন? একটুকু বেড়ান হইলে শরীরটিও সুস্থ থাকে।'

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে আসার পরই গুরুজী আমাকে বল্লেন -'অন্ততঃ একটি বৎসর এখানে তোমার আসন রাখ্তে হবে। আসনে নিত্য তোমার নিকটে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হবে।' সেই হ'তে প্রত্যহই দু'টি একটি নূতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'চ্ছে। যতক্ষণ না অন্ততঃ একটি তত্ত্বও প্রকাশিত হয়, আমি কখনও আসন ছেড়ে অন্যত্র যাই না। এই জন্যই আমি প্রতিদিন দর্শন কর্তে যেতে পারি না। ওটি হ'য়ে গেলেই আমি আসন ছেড়ে উঠি, দর্শনেও যাই।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর এ আবার কোন্ তত্ত্ব বলিলেন? তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বহু যুগযুগান্ত-ব্যাপী অবিচ্ছেদ কঠোর সাধন ভজনে রক্ত মাংস অস্থি মজ্জার প্রলয় ঘটাইয়া, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ যে তত্ত্ব একটিমাত্র আয়ত্ত করিলেই ঋষিপদবাচ্য হইতেন; কয়েক ঘণ্টা আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, ক্ষণে ক্ষণে হাসি গল্পে সময় অতিবাহিত করিয়াও, এই ধর্ম্মবিরোধী ঘোর কলিকালে সেই তত্ত্ব ঠাকুর প্রতিদিনই দু'টি একটি অনায়াসে লাভ করিতেছেন। এ কি অসম্ভব কথা! আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—তত্ত্ব কাকে বলে? তত্ত্ব মোট কয়টি? কিরূপ সাধন কর্লে এই সব তত্ত্ব লাভ হয়? আমি মুখ খুলিতেই ঠাকুর আমার সমস্ত ভাব বুঝিয়া লইলেন, তাই মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"স্বয়ং ভগবানই তত্ত্ব। ভগবানের ভাবের, কার্য্যের ও লীলার কি আর বিরাম আছে? তত্ত্ব অনন্ত। এই তত্ত্ব কি আর সাধনাদি ক'রে লাভ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জন্ম কঠোর সাধন ভজনে দেহপাত কর্লেও এসব তত্ত্বের একটি মাত্র কেহ জানতে পারে না। এসব তো আর সাধনসাপেক্ষ নয় সাধনাতীত, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই এসব তত্ত্ব লাভ হয়। সাধনেতে ক'রে লাভ কর্তে হলেই অসম্ভব। তাঁর কৃপায় মুহূর্ত্তের মধ্যেও সবই হ'তে পারে। জীব মুক্ত হ'য়ে একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই লীলাতত্ত্বে প্রবেশ কর্তে পারে। ইহাই পরতত্ত্ব।

ঠাকুরের এসব কথা শুনিয়া ব্যাপারটি আমি বুঝিলাম। আর কোন কথা না বলিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

অভিনব তিলক। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকর্ত্তৃক সংস্কার।

১৯শে শ্রাবণ, ১২৯৭; রবিবার।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, এবার ঠাকুরকে নূতনরকম দেখিতেছি। ঠাকুরের অভিপ্রায় কি, জানি না; উদ্দেশ্য কি, বুঝি না। আর তাঁহার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবারই বা আমার অধিকার কোথায়? নিজ হইতে দয়া করিয়া, ঠাকুর যখন মিলিয়া মিশিয়া আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন, সুযোগ ঘটিলে তখনই মাত্র দু' একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লই। এতকাল ঠাকুরকে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর তিনি সেরূপটি নাই। এখন তিনি অনায়াসে দেবমন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন; প্রস্তরমূর্ত্তি বিগ্রহের সম্মুখে ধরা খাদ্য, প্রসাদজ্ঞানে ভোজন করেন; গলায় নানাপ্রকারের মালা, আবার দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে এখন তিনি সমস্ত বৈষ্ণব আচারই অবলম্বন করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু, সাহসে কুলায় না।

যাহা হউক, আজ আহারান্তে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'শ্রীবৃন্দাবনে বাস করলেই কি এইরূপ তিলক ধারণ করতে হয়? আপনাকে আগে কখনও মালা তিলক ধারণ করতে দেখি নাই। বলেছিলেন, আমাদের কোন একটা সম্প্রদায় নাই, তিলক কিন্তু তিলক তো বৈষ্ণবদেরই মত।' ঠাকুর বলিলেন—তা ঠিক্। আমি যখন শ্রীবৃন্দাবনে এলাম, তিলক ধারণ করতে আদেশ হ'লো। তখন কিরূপ তিলক ধারণ করবো ভাবতে লাগ্‌লাম। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন নিব না স্থির ক'রে, একটি নূতন রকমের তিলকের সৃষ্টি করলাম। আমার ঐ নূতন ধরণের তিলক দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এক-দিন গৌর শিরোমণি মশায় এসে আমাকে বললেন—"প্রভু, তিলক এই প্রকারে করছেন কেন বুঝতে পারছি না। এরূপ তিলক তো কোন সম্প্রদায়ের ভিতরেই দেখি নাই। দয়া ক'রে এই তিলকের তাৎপর্য্য আমাকে বলুন।" আমি তাঁকে বললাম, 'আমার কোনও সম্প্রদায় নাই; এই জন্য মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্র, যীশু খ্রীষ্টের ক্রস্ এবং মহাদেবের ত্রিশূল নিয়ে, এই এক নূতন রকমের তিলক করছি। শিরোমণি মশায় বললেন—"আপনি সবই করতে পারেন, কিন্তু আপনি যেটি করবেন সেটির অনুকরণ সহস্র লোকে ক'রে সম্প্রদায় গঠন করবে। সুতরাং, শাস্ত্রব্যবস্থানুসারেই করুন না কেন? নূতন সম্প্রদায় আর কেন করবেন? আমার বিনীত অনুরোধ আপনি এই তিলক ত্যাগ ক'রে যথামত তিলক ধারণ করুন।" আমি শিরোমণি মশায়ের কথা শুনে বললাম—'এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য স্থির হয় শীঘ্রই আপনি জানবেন।' পরে একদিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই প্রকার

তিলক দেখায়ে আমাকে বল্‌লেন—"তুমি এইরূপ তিলক ক'রো!" অদ্বৈতপ্রভু এই প্রকারই তিলক কর্‌তেন। তাঁর আদেশমতই আমি এইরূপ তিলক কর্‌ছি।

শ্রীবৃন্দাবনে সাম্প্রদায়িক ভাব।

আমি বলিলাম, "শ্রীবৃন্দাবনে আপনি যখন এসে উপস্থিত হ'লেন, মালা তিলক না দেখে বাবাজীরা গোলমাল কর্‌তেন না? এঁদের ভাব দেখে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এঁদের মধ্যে খুব বেশী। অন্য ভেকধারী সাধুদেরও এঁরা আমল দেন না, সাধু ব'লেই গ্রাহ্য করেন না। কেহ মালা তিলক ধারণ না কর্‌লে তাকে অপবিত্র মনে করেন। আমি যত দিন না মাথা মুড়ায়ে টিকি রেখেছিলাম, আর যত দিন না মাঠাকুরুণ আমার গলায় এই কণ্ঠী বেঁধে ছিলেন, তত দিন বৈষ্ণব বৈরাগীরা প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান নাই, এখন আমার এই নেড়া মাথায় চৈতন ও গলায় কণ্ঠী দেখে তাঁরা বলেন, 'আহা, রূপের কি শোভাই হয়েছে, অঙ্গের কি জ্যোতিই খুলেছে।' আমি কিন্তু নিজের রূপ যখন একবার আয়নায় দেখি, পাল্টে দ্বিতীয় বার আর দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। নেড়া মাথায় চৈতন এতই কদর্য্য দেখায়।"

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন—এখানে ভেক না নিলে বাস করাই শক্ত হ'য়ে পড়ে। আমার এই গৈরিক ত্যাগ করাবার জন্য ইঁহারা কত চেষ্টাই করেছেন! এমন কি, গৌর শিরোমণি মশায়কে দিয়েও কত অনুরোধ করিয়েছেন। একদিন শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলাম। সকলে ব'সে ভাগবত শুন্‌ছি, একজন ময়লা ড্রেণের জলে খানিকটা গোবর গুলে উপর থেকে আমার মাথায় ফেলে দিলেন। পাশে শিরোমণি মশায় বসেছিলেন, জলগুলো সমস্ত তাঁরই মাথায় পড়্‌লো। তিনি সব বুঝ্‌লেন, পরে আমাকে বল্‌লেন,—"দেখলেন, প্রভু, এদের কাণ্ড? চলুন, আর এস্থানে থাক্‌তে নাই!" এই ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে চলে এলেন। বৈষ্ণব বেশ না দেখ্‌লে এখানে বাবাজীরা এরূপ সব ব্যবহার করেন।

এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, "এতকালযাবৎ ঠাকুর এখানে আসিয়াছেন; না জানি আরও কত সব অত্যাচার এ সময়ের মধ্যে ইহারা ঠাকুরের উপরে করিয়াছে!" কথায় কথায় ঠাকুরের মুখে কখন কখন এসব কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতেই এক আধটুকু বুঝিতে পারি, না হ'লে ত এ সব বিষয় জানিবার কোন উপায়ই নাই। যাহা হউক, দামোদর পূজারী ও শ্রীধর প্রভৃতির কাছে জিজ্ঞাসা করিলেও হয় ত কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া, আমি কিছুক্ষণ পরে নীচে আসিয়া উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে এলেন, তখন এখানকার লোকেরা

ঠাকুরকে অপদস্থ কর্‌তে কোনরূপ চেষ্টা করেছিল কি ?" উঁহারা আমাকে যেসব কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। তন্মধ্যে একটি বিষয় মাত্র এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি ; ঘটনাটি এই—

দর্শনে বিরোধী প্রভুসন্তানের উৎকট শিক্ষা।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর উপস্থিত হইয়া ব্রজবাসী দামোদর পূজারীর কুঞ্জে উঠিলেন। কয়েক দিন পরে বলিলেন—কাল সকালে গোবিন্দজী দর্শন কর্‌তে যাব। ঠাকুর ইহা বলামাত্র সর্ব্বত্রই এ কথা ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীবৃন্দাবনে বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল ! বাতাসের আগে এই সংবাদ প্রভুপাদদের দরবারে পৌঁছিল। সর্ব্বপ্রধান প্রভাবশালী সম্মানিত বৈষ্ণবনেতা জনৈক প্রভুসন্তান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কি ? এম্‌নিই মন্দিরে যাবে ? আমাদের এসে দর্শন কর্‌লে না, অনুমতি নিলে না। তাকে ত জানা আছে। এত সহজেই সে মন্দিরে যাবে ? আচ্ছা দেখা যাক।" এই বলিয়া তিনি তিন চারিটি প্রভুসন্তানের সহিত সমস্ত বৈষ্ণব সমাজকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট্ সভা করিলেন। প্রভুপাদ বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে বলিলেন, "অদ্বৈত পরিবারের কুলাঙ্গার, জাতনাশা, স্বেচ্ছাচারী এক গোঁসাই সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে এসেছে। সনাতনধর্ম্ম-বিরোধী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক'রে সহস্র সহস্র লোককে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট করেছে। এতকাল অনাচারে কাটিয়ে এখন গৈরিক প'রে সন্ন্যাসীর বেশে সে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে, অনুমতি জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রেখে কালই সে গোবিন্দজী দর্শন কর্‌তে মন্দিরে যাওয়ার সাহস কর্‌ছে। এখন তাকে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া হবে কি না ?" প্রভুপাদের প্রশ্ন শুনিয়া বৈষ্ণব বাবাজীরা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা কখনই হবে না। আমরা বাধা দিব।" এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রভুপাদ বলিলেন, "শুধু বাধা দেওয়া নয়। মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে চাইলেই তাকে দ্বারে বিশেষরূপে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিবে।" গোবিন্দজীর সেবায়েতের উপরেও এই আদেশ করা হইল। দু' চারিটি নিতান্ত নিরীহ বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই এ কার্য্যে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আপন আপন কুঞ্জে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আহারান্তে প্রভুসন্তান প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, অকস্মাৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। স্বপ্ন দেখিলেন—ভয়ঙ্কর এক বন্য বরাহ গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুসন্তানকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। গুঁতার উপরে গুঁতা খাইয়া প্রভুপাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; 'উহু উহু' করিতে করিতে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। পরে, একটুকাল বসিয়া হাত মুখ রগড়াইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন ও নিদ্রিত হইলেন। কিছুক্ষণ অতীত হইতে না হইতে আবার সেই বন্য শূকর ভীষণ রব করিতে করিতে প্রভুজীর উপরে আসিয়া পড়িল এবং তাঁহার উপর ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। প্রভু তখন 'হাউ হাউ' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ অস্থির অবস্থায় থাকিয়া আবার শয়ন করিলেন। এবার আর তেমন নিদ্রা নাই। সামান্য একটু

তন্দ্রাবেশ হইতেই প্রভুপাদ দেখিলেন—স্বয়ং বরাহদেবজী বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গভীর গর্জ্জনে চারি দিক কাঁপাইয়া বিকটদশন বিস্ফারণপূর্ব্বক, অতি প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রভুজীর উপরে আসিয়া পড়িলেন; ঘন ঘন নিষ্পেষণ ও সংঘর্ষণে প্রভুপাদের সর্ব্বাঙ্গ নিপীড়িত করিয়া, মুখাগ্র ঘর্ষণে তাঁহার বক্ষঃস্থল মর্দ্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! গোঁসাইকে মন্দিরে যাইতে বাধা দিবি? জানিস্ না তিনি কে? তাঁহাকে সামান্য ভেবেছিস্? আজ তোকে শেষ করবো।" প্রভুজীর তন্দ্রাবেশ ছুটিয়া গেল; সজ্ঞান চমকিত অবস্থায় তিনি বরাহদেবের মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন শুনিতে লাগিলেন। কঠোর মর্দ্দনে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য হইল না। পরে তিনি চীৎকার করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন; এবং ধীরে ধীরে দম্ ছাড়িয়া ক্রমে সুস্থ হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এখন কি করি? কিসে এই অপরাধ হইতে রক্ষা পাই?' শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমৎ গৌর শিরোমণি মহাশয়কে সকলেই সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রভুসন্তান তখনই রাত্রিতে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং অকপটে সমস্ত বিবরণ বিস্তারিতরূপে তাঁহাকে জানাইয়া বরাহের নিষ্পেষণের চিহ্ন শরীরের নানাস্থানে দেখাইয়া, বলিলেন, "এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? কৃপা করিয়া বলুন।" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "প্রভু, আপনি বিষম দুঃসাহস করিয়াছিলেন। এরূপ সঙ্কল্পেও ভয়ানক অপরাধ হয়। রাত্রি প্রভাত হইলেই আপনি গোস্বামী প্রভুর নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন; এবং খুব সসম্মানে আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে লইয়া যান।" পরদিন প্রত্যূষে প্রভুসন্তান তাহাই করিলেন। শ্রীগোবিন্দজী দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন; তখন ঠাকুরের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া বিদ্রোহিদল একান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। পরে সকলেই মহানন্দে ঠাকুরকে লইয়া আমাদের কুঞ্জে আসিলেন। এইরূপ অসাধারণ কোনও ঘটনা না ঘটিলে এত অল্পকালমধ্যে এ স্থানে ঠাকুরের এইপ্রকার গৌরব ও এইরূপ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত, মনে হয়।

সাধকের সুরাপান কি?

আজ ঠাকুর অপরাহ্ণকালে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না। ঠাকুরের কাছে বসিয়া আমরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের তো মাদক খাইতে একেবারেই নিষেধ করেছেন; কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা ত খুব মাদক সেবন করেন। শাস্ত্রে কি মাদক সেবন নিষেধ?

ঠাকুর বলিলেন—মাদক সেবন সম্পূর্ণ নিষেধ; শাস্ত্রে ধর্ম্মার্থীদের জন্য মাদক খাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও নাই। যাঁহারা সর্ব্বদা পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরে বেড়ান, ঐ সকল স্থানে থেকে সাধনাদি করেন, তাঁদের শরীরে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। নানা স্থানে নানাপ্রকার শীত উষ্ণাদিতে শরীরটিকে স্থির রাখ্‌বার জন্য তাঁদের পক্ষে মাদক সেবন প্রয়োজন হয়।

কিন্তু তা শুধু শরীর রক্ষারই জন্য, উহাতে সাধনের কোন সাহায্যই করে না; বরং ভয়ানক অনিষ্টই হয়, চিত্ত অস্থির হয়। যোগশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে মাদক ব্যবহারের মহা দোষ উল্লেখ ক'রে গেছেন। কেবল মাত্র শরীর রক্ষার জন্য ঔষধার্থে যাঁহারা উহা সেবন কর্‌বেন, ঔষধের মত, প্রয়োজন শেষ হ'লেই আবার ছেড়ে দিবেন এই ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম—কেন? দেখ্‌তে পাই তান্ত্রিক সাধকেরা খুব মদ খেয়ে থাকেন। মদ না খেলে নাকি তাঁহাদের সাধনই হয় না। বীরাচারীরা যে খুবই মদ মাংস খান, এ ত সকলেই জানেন।

ঠাকুর বলিলেন—মদ খেয়ে সাধন করার ব্যবস্থা বীরাচারীদের জন্যও নাই। তবে নিজেকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য বীরেরা উহা ব্যবহার কর্‌তে পারেন, এই পর্য্যন্ত। তন্ত্রেতে যে অবস্থাকে 'বীর' বলেছেন, তা তো বড় সহজ নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন্ অবস্থায় তান্ত্রিক সাধকেরা 'বীর' হন?

ঠাকুর বলিলেন—বীর সহজে হয় না; সমস্ত পশুভাব বিনষ্ট হ'লেই বীর হয়। কামক্রোধাদি সমস্ত রিপু যখন একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, তখনই বীরাচারী হ'তে পারে।

আমি বলিলাম—শাস্ত্রে সুরাপানের ব্যবস্থা নাই, বল্‌লেন; কিন্তু তান্ত্রিকেরা তো সুরাপানের মাহাত্ম্য দেখায়ে বলেন—"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

ঠাকুর বলিলেন—যে সুরাপানের এই ব্যবস্থা, তাহা বাহিরের সুরা নয়। এ সব মাদক নয়। লোকে ইহা না বুঝে গোল করে। ভক্তিতে ক'রে এই দেহেতেই একপ্রকার সুরা জন্মে; তা খেলে ভয়ানক নেশা হয়। উহাকেই অমৃত বলে; উহা খেলে আর জন্ম হয় না।

আমি বলিলাম—ভক্তিতে দেহের ভিতরে সুরা হয় কি প্রকারে? তাহা খায়ই বা কিরূপে?

ঠাকুর বলিলেন—দেখ, যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মস্তিষ্কের কোন একটা বিশেষ স্থানে একপ্রকার অনুভাবেতে ঐ স্থানের রক্তের একটা অন্যপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়। ঐ রক্ত তখন গরম হ'য়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। কামেতেও ঐরূপ। এইপ্রকার সৎ অসৎ সকল ভাবেই মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানে, এক এক রকম অনুভবে রক্তাদির পরিবর্ত্তন ঘটায়। উহাই শিরা ধমনী দিয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভাব ভক্তি আনন্দেও রক্তের একরূপ পরিবর্ত্তন হয়। ভক্তিতে মস্তিষ্কের রক্তের যে অবস্থা হয়, অত্যন্ত বেশী হ'লেই তাহা ক্রমে গরম হ'য়ে ভাবেতে ক'রে একমত রস জন্মে। ঐ রস ধীরে ধীরে টাক্‌রা দিয়ে চুয়ায়ে জিহ্বায় এসে পড়ে, ঐ রসই অমৃত। উহা দু' তিন ফোঁটা

খেলেই এত নেশা হয় যে, ৫।৭ দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়, আহারেরও প্রয়োজন হয় না। উহাকেই সুরা বলেছেন ; উহাই খাওয়ার ব্যবস্থা। ঐ সুরার মাদকতাশক্তি এত বেশী যে, যাঁহারা না খেয়েছেন, বল্‌লে কিছুতেই বুঝ্‌বেন না। উহা খাওয়ামাত্র মানুষ চেতনাশূন্য হয়—শরীর একেবারে অচল হ'য়ে পড়ে ; কিন্তু ভিতরের জ্ঞানের হ্রাস হয় না, যেমন তেমনটিই থাকে, শুধু বাহ্য-জ্ঞানই থাকে না।

আমি বলিলাম—যে অমৃতের কথা বল্‌লেন, উহা খেতে কেমন লাগে? রক্তেরই যখন কোন এক রকম পরিবর্ত্তনে উহা তাহারই চুয়ান রস, তখন উহা খেলে কি কোনও অনিষ্ট হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—এক এক সময়ে উহার এক এক প্রকার স্বাদ হয়। ভক্তির ভাব সকলের সহিত উহার যোগ আছে। যে ভাবেতে ভক্তি হয়, স্বাদটিও সেই মত হ'য়ে থাকে। কখন লবণ, কখন মধুর, কখন বা লবণ-মধুর, আবার কখন বা তিক্ত, এইরূপ নানা স্বাদ পাওয়া যায়। ভক্তির যখন যেমন ভাব, তখন তেমন স্বাদ। আমি তো দেখ্‌ছি উহা খেয়ে কোন অনিষ্টই হয় না ; বরং শরীর আরও সুস্থই থাকে। উহা খেয়ে দীর্ঘকাল আহার না কর্‌লেও কোন গ্লানিই বোধ হয় না ; শরীর খুব সবল ও সুস্থ হয়। উহাতে শরীরের মহা কল্যাণ সাধন করে ব'লেই শাস্ত্রে উহাকে 'অমৃত' বলেছেন। উহা যথার্থই অমৃত।

আমি বলিলাম—যে ভক্তিতে এই অমৃত জন্মে, সেই ভক্তি কিসে লাভ হয়? আমরা ঐ অমৃত লাভ কর্‌তে পারি না কি?

ঠাকুর বলিলেন—এই অমৃত লাভ কর্‌তে হ'লে শ্বাসে প্রশ্বাসে খুব নাম কর। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে পার্‌লেই দেখ্‌বে ক্রমে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

নামে ঠাকুরের শুষ্কতা ও জ্বালা। পরমহংসজীর সান্ত্বনা।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলাম—চেষ্টা তো কম করি নাই ; কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করা অসম্ভব মনে হয়। নাম ক'রে যদি আনন্দ পাওয়া যায়, তা হ'লে বরং শ্বাস প্রশ্বাসে চেষ্টা করা যায়। নাম যতদিন শুষ্ক কাঠের মত নীরস থাকে, ততদিন চেষ্টা কর্‌তে ধৈর্য্য থাক্‌বে কেন? নাম করাতে যে কি উপকার তাহাও তো বুঝি না।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—উপকার কি হ'চ্ছে তাহা এখন বুঝ্‌বে না। শুধু নাম ক'রে যাও। ক্রমে সবই বুঝ্‌বে। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করা খুবই শক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা

ব'লে ছেড়ে দিতে নাই। প্রথম প্রথম নাম খুব শুষ্কই বোধ হয়। আমাকে যখন গুরুদেব শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করতে বল্‌লেন, কিছু দিন চেষ্টা ক'রেই আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কারণ, কিছু না বুঝে শুষ্ক নাম আর কতক্ষণ করা যায়? অনেক সময়ে নাম করতে এত শুষ্কতা বোধ হ'তো যে, বৃথা নাম করছি মনে ক'রে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হ'তো। তখন একদিন পরমহংসজী দর্শন দিলেন, আমি বল্‌লাম—'বৃথা বৃথা এরূপ নাম আর করতে পারি না। শুষ্ক নাম নিয়ে আর কি হবে? কিছুই তো বুঝ্‌ছি না।' তখন তিনি একটু হেসে আমাকে বল্‌লেন—'শুধু আমার অনুরোধ মনন ক'রে নাম ক'রে যাও। শুষ্ক বোধ হয় হউক, তাতে কি? বিরক্তি বোধ হ'লেও তাতে কোন ক্ষতি নাই। নাম করতে থাক, ক্রমে সব টের পাবে।' আমি পরমহংসজীর কথামত আবার নাম করতে আরম্ভ করলাম। গয়াতে আকাশ-গঙ্গায়, বরাবর পাহাড়ে ও বিন্ধ্যাচলে খুব নাম ক'রে ছয় মাস কাটালাম, তখন একটু একটু টের পেতে লাগ্‌লাম। ওখানে নানাপ্রকার অবস্থা আমার হ'তে লাগ্‌ল। তখন ঘুমায়ে কি জেগে আছি, এ বিষয়েও সময়ে সময়ে সংশয় হ'তো, সে সময়ে নিঃসংশয় হ'তে কখন কখন শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছি, কতই করেছি। পরে যখন দ্বারভাঙ্গায় এলাম, গুরুদেব একদিন দর্শন দিলেন। তাঁকে আমি আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বল্‌লাম; তিনি তখন আমাকে শুধু বল্‌লেন—'হঠযোগ প্রদীপিকা' এবং 'বিচারসাগর' এই গ্রন্থ দু'খানা এনে একবার পড়। আমি বল্‌লাম—'কোথায় পাব?' তিনি একটি দোকানের উল্লেখ ক'রে বল্‌লেন—'দ্বারভাঙ্গাতে মাত্র ঐ দোকানে এই গ্রন্থ আছে, পাঁচ টাকা দাম নিবে। যাও, নিয়ে এস গিয়ে।' আমি গুরুজীর কথামত সেই দোকানে গিয়া দেখ্‌লাম—মাত্র সেই দু'খানা পুস্তকই ঐ দোকানে আছে। মূল্যও পাঁচ টাকাই নিল। আমি পুস্তক দু'খানা পড়্‌লাম। দেখ্‌লাম ঐ গ্রন্থ দু'খানায় যতগুলি অবস্থার কথা লেখা রয়েছে সে সমস্তগুলিই আমার লাভ হ'য়ে গেছে। ঐ সব অবস্থা যখন আমার লাভ হয়, ভেবেছিলাম আমার মাথা নষ্ট হ'য়ে গেছে। গ্রন্থপাঠ শেষ হ'তেই গুরুদেব আবার দর্শন দিলেন। তখন তাঁকে বল্‌লাম—'আগে কেন এই পুস্তক দু'খানা আমাকে পড়্‌তে বলেন নাই, তা হ'লে তো আর এত কাণ্ড করতাম না। গুরুজী বল্‌লেন—"না, আগে দিলে ঠিক্ হ'তো না। তুমি যে বিষম গোঁড়া ছেলে, তা তো আমি জানি। ঐ গ্রন্থ তোমাকে আগে পড়ায়ে নিলে, এখন তুমি মনে করতে—ঐ পড়ার সংস্কারেই তোমার মাথার গোলমাল ঘটেছে। এ সকল অবস্থায় তোমার যথার্থ বিশ্বাস

হ'তো না। এখন তোমার অবস্থা তুমি নিজে অনুভব করছ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা যে সব শাস্ত্র লিখে গেছেন, তাতেও ঐ সব অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে; এখন আমিও বল্‌ছি, সাধনেতে ক'রে তোমার যে সব অবস্থা লাভ হয়েছে, সমস্তই সত্য। এখন ও বিষয়ে আর তোমার কোন সংশয় হবে না।" অবস্থাটি লাভ ক'রে, উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য শাস্ত্র দেখাই ঠিক। তাতে শাস্ত্রেও অভ্রান্ত বিশ্বাস হয়। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন; পরে আবার বলিতে লাগিলেন—অনেকে আমাকে অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করেন; কিন্তু উহার উত্তর দিতে আমার ভাল বোধ হয় না। একমাত্র নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে নিতে পার্‌লেই ক্রমে ক্রমে সকল অবস্থা প্রকাশ হ'তে থাক্‌বে। তখন তাহা প্রমাণের জন্য শাস্ত্র দেখ্‌লেই হ'লো। শাস্ত্রই যথার্থ অবস্থার সাক্ষ্য দিবে। যা কিছু প্রত্যক্ষ কর্‌বে, বাজায়ে নিবে। তোমাদের তো একটা কিছু প্রত্যক্ষ হ'লেই বিশ্বাস কর; আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্য্যন্ত দশটি ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য বলে না বুঝি, সে পর্য্যন্ত উহা সত্য ব'লে গ্রহণ করি না। বাস্তবিক পক্ষে দশ ইন্দ্রিয়দ্বারা বাজায়ে যাহা সত্য ব'লে গ্রাহ্য হবে, তাহাই বিশ্বাস করা যায়। কোন বিষয় শুধু দেখে, শুনে বা স্পর্শ ক'রেই অমনি সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রো না; সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য বুঝ্‌লে, পরে আবার শাস্ত্র দেখো। তাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয় হ'তে পার্‌বে। না হ'লে ঠিক হয় না।

আমি বলিলাম—'শুনিতে পাই সমস্ত দেবদেবী, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি পঞ্চদেবতাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে না পার্‌লে মুক্তিলাভ করা যায় না; তা হ'লে কি উঁহাদের সকলকেই পূজা কর্‌তে হবে?'

ঠাকুর বলিলেন—সকলকেই খুব সম্মান কর্‌বে; অনাদর, অমর্য্যাদা কাহাকেও কর্‌বে না। পূজা তাঁদের না কর্‌লেও চলে। পূজাদ্বারা শুধু তাঁদের লোক-ই লাভ হয়, মুক্তি হয় না।

আমি আবার বলিলাম, পূজাদ্বারা তাঁদের সন্তুষ্ট ক'রে না গেলে, রাস্তায় তাঁরা কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটান না তো?

ঠাকুর বলিলেন—একমাত্র ভগবানের পূজাতেই সব হয়। বৃক্ষের যেমন গোড়াতে জল ঢাল্‌লে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প, সর্ব্বত্রই ঐ জল যায়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানের পূজা কর্‌লেই সকলের তাতে সন্তোষ হয়, আনন্দ হয়।

আমার ও হরিমোহনের শ্রীবৃন্দাবনত্যাগসম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি।

কিছুকালযাবৎ আমার মাথার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর, রাত্রের আহার ছাড়িয়াছিলাম। অনুমান হয়, তাহাতেই এই অসুখের আবার উৎপত্তি।

২০শে ও ২১শে শ্রাবণ।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নিয়মানুসারে গুরুর প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিতে নাই। বোধ হয়, এই জন্যই আজ কয়েকদিন হইতে ঠাকুর প্রত্যহই আমাকে রাত্রে দুধ রুটি প্রসাদ দিতেছেন। ঠাকুরের আহারের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে; আমাকে প্রসাদ দেন বলিয়া পরিমাণের অধিক তিনি কখনও গ্রহণ করেন না, নিজের আহার্য্যেরই অংশ দিয়া থাকেন। এই প্রকারই নাকি ব্যবস্থা। আমার এ অসুখের কথা কিছুই আমি ঠাকুরকে জানিতে দেই নাই, কারণ, তিনি জানিলেই হয় ত আমাকে বড় দাদার নিকটে যাইতে বলিবেন।

ঠাকুরের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগজীবন ভাগলপুরে চাকরীর প্রত্যাশায় গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মথুর বাবু তাঁহাকে আশা দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। স্বামিজী (হরিমোহন) বহুদিন ভাগলপুরে ছিলেন। অবশেষে তিনিও আবার তথায় যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। সতীশকে ঠাকুর পুনঃপুনঃ মাতৃসেবার জন্য দেশে যাইতে বলিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সতীশ ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইবেন না জেদ করিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি, কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়ার দরুণ মধ্যে মধ্যে বড়ই অবসন্ন হই।

আজ নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে ঠাকুরের কাছে গিয়া বসিতেই ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন— শরীর তোমার বড় কাতর হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি, আধ সের ক'রে দুধ তোমার খাওয়া প্রয়োজন। না হ'লে খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বে। আর রাত্রে নিয়মমত রুটি খেও। ব্রহ্মচর্য্যের সব নিয়ম ঠিক ঠিক রক্ষা করে' চলা প্রথম প্রথম সহজ নয়; ক্রমেক্রমে অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা না করলে হবে কেন? শরীরটি ভাল না থাক্‌লে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। মাথার রোগ বড় খারাপ। মাথা দিয়েই সমস্ত কাজ কর্ম্ম। মাথা খারাপ হ'লে জীবনটাই বৃথা যায়। বরং কিছু কালের জন্য তোমার দাদার নিকটে যেতে পার। ফয়জাবাদ অতি উৎকৃষ্ট স্থান। মাথার অসুখও সার্‌বে, আর সাধনেরও কোন ক্ষতি হবে না। তোমার দাদার সঙ্গেতে উপকারই পাবে। শরীর একটু সুস্থ হ'লে আবার আস্‌লেই হবে।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, শীঘ্রই আমার ফয়জাবাদে যাইতে হইবে। স্বামিজী (হরিমোহন) মথুরা হইতে একটু সুস্থ হইয়া এখানে আসিয়াছেন। রোগের যন্ত্রণায় অতিশয় কাতর হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"ভাই, ভাগলপুরে বেশ ছিলাম, কেন আমার এ দুর্ম্মতি হইল, এখানে আসিলাম? দেহের এই ক্লেশ তো আর সহ্য হয় না। কোনমতে একটু সুস্থ ও সবল হইলেই আবার আমি ভাগলপুরে যাইব। ধর্ম্মকর্ম্ম তো সর্ব্বত্রই হইতে পারে। বরং আত্মীয় স্বজনের নিকটে থাকা নিরাপৎ।"

কথায় কথায় আজ স্বামিজীর আক্ষেপোক্তি আমি ঠাকুরকে বলিলাম। শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—তীব্র বৈরাগ্য না জন্মালে কর্ম্মের শেষ হয় না। জোর ক'রে কি আর কর্ম্ম কাটান যায়? হরিমোহনকে আমি পুনঃ পুনঃ আগে এসব কর্ম্ম শেষ করে নিতে বলেছিলাম। এখন দেখ, সন্ন্যাস নিয়ে অনুতাপ পর্য্যন্ত করলেন। এই অনুতাপে ওর সবই তো নষ্ট হ'য়ে গেল। এখন দস্তুরমত কর্ম্মটি শেষ ক'রে না এলে কিছুতেই হরিমোহন স্থির হ'তে পারবেন না। কিছুই আর হবে না।

স্বামিজীও ঠাকুরের এসকল কথা শুনিয়া শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

বৈরাগ্য, বাসনা ও বৈধ ধর্ম্ম।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কর্ম্ম শেষ না করিলে লোকের মুক্তি হয় না বললেন; কিন্তু এমন কি কোন উপায় নাই, যাহা অবলম্বন করলে মানুষ কর্ম্ম কাটায়ে মুক্ত হ'তে পারে?'

ঠাকুর বলিলেন—হাঁ, থাকবে না কেন? তীব্র বৈরাগ্যদ্বারাও মুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু সে বৈরাগ্য কোথায়? বিষয় হ'তে মনটিকে যখন সম্পূর্ণ ভিতরের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিতে পারবে, আর প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করতে পারবে, তখনই আশা করা যায়। একটি শ্বাস বা প্রশ্বাস বাদ গেলেও হবে না; কারণ, ঐ ছিদ্রটুকু পেয়েই কত শত্রু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এই নিষ্কাম মুক্তির পথে মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, দেবতাদি নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটান; সকলেই এই পথে বিষম পরীক্ষা করেন। বাসনাশূন্য হ'য়ে তীব্র সাধন না করলে, এপথে চলা যায় না। এই জন্যই বৈধ কর্ম্মের ব্যবস্থা। বৈধ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ শেষ ক'রে নিলেই সহজ হয়।

আমি বলিলাম—যে কর্ম্ম শেষ করার কথা বলছেন, সে কর্ম্ম কি প্রকার? চাকরী ক'রে সংসার গৃহস্থালী করই কি কর্ম্ম?

[illegible]লেন—কর্ম্ম বলতেই সংসার করা বা চাকরী করা নয়। যাহার যে বিষয়ে আস[illegible] সেটি নিয়েই কর্ম্ম।

[illegible]া করিলাম—বৈধ ভোগের কথা যে বললেন, তাহা কি রকম? শাস্ত্রমত ভোগ করলেই তো [illegible]োগ?

ঠা[illegible]ন—বৈধ ভোগ যে কি তাহা বুঝা বড়ই শক্ত। শাস্ত্রোক্ত ভোগ ত বটেই, কিন্তু [illegible]ভোগ কাটাবার জন্য প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ব্যবস্থা করেছেন। যাহার [illegible]কৃতি তাহার পক্ষে সেই মত কর্ম্মের ব্যবস্থা। এইপ্রকার ব্যবস্থামত কর্ম্মের

ভোগই বৈধ ভোগ। শাস্ত্র দেখে প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম বিধিমত কর্‌লেই ক্রমে ক্রমে ভোগ কেটে যায়।

আমি। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণদ্বারা কি প্রকৃতি জানা যায় না?

ঠাকুর। প্রকৃতি জানা কি এতই সহজ? শাস্ত্রপাঠে বা অন্য কোনও চেষ্টাসাধ্যে উহার কিছুই জানা যায় না।

আমি। তা হ'লে আন্দাজে কিরূপে কর্ম্ম করবে?

ঠাকুর বলিলেন—নিজের প্রকৃতি নিজে কখন কেহ বুঝে না। এইজন্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হয়; সদ্‌গুরু, যাহার যেরূপ প্রকৃতি পরিষ্কার প্রত্যক্ষ ক'রে, প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা ক'রে দেন। অবিচারে তাঁর আদেশমত কর্ম্ম ক'রে গেলেই অনায়াসে কর্ম্মটি শেষ হয়। এই ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমি। এতকাল আমার সংস্কার ছিল চাক্‌রী করা, সংসার করাই কর্ম্ম।

ঠাকুর বলিলেন—বাসনাতেই কর্ম্ম; বাসনা নিবৃত্তিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। বৈধ ভোগদ্বারাই বাসনা শেষ কর্‌তে হয়। বাসনা যার যে দিকে, কর্ম্মও তার সেই দিকে। শুধু সংসার করা বা চাক্‌রী করাই কর্ম্ম নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ধর্ম্ম লাভ করবার জন্য ঘর বাড়ী, পিতা মাতা ছেড়ে যে লোকে আসে, সেই ধর্ম্মলাভই তো তার বাসনা। সুতরাং তাহাই তো তাহার কর্ম্ম।'

ঠাকুর বলিলেন—তা ত বটেই, তবে শুধু যদি তার ধর্ম্মের দিকে বাসনা থাকে, তা হ'লেই সে নির্ব্বিঘ্নে তাহা কর্‌তে পার্‌বে। আর যদি অন্যান্য দিকেও বাসনা থাকে তা হ'লে স্থির হ'য়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্‌তে পার্‌বে না। যে পরিমাণে অন্য দিকে বাসনা থাক্‌বে, সেই পরিমাণে তাকে অস্থির হ'তে হবে ও ভুগ্‌তে হবে। এই জন্যই অন্যান্য বাসনা শেষ ক'রে আস্‌তে হয়।

আমি। কর্ম্ম যাহাতে শেষ হ'য়ে যাবে, সদ্‌গুরু তো তাহাই কর্‌তে বলেছেন। কিন্তু সেই প্রকার ক'রে কর্ম্ম শেষ হ'লো কি না কিসে বুঝ্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন—যখন দেখ্‌বে কোন দিকেই একটা বাসনা নাই, বিষয়ের সংস্রবেও ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ অনাসক্ত, নিবৃত্ত, তখনই বুঝ্‌বে এসব কর্ম্ম শেষ হয়েছে।

গোঁসাইপ্রদত্ত উপবীতের শক্তি।

আজ মধ্যাহ্নে সতীশ আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"ভাই, কি করি বল্ তো? আমার

দুর্দ্দশা যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায়ই গোঁসাই আমাকে বাড়ীতে গিয়া মাতৃসেবা করিতে তাড়া দেন—আমার ত তাহা একোরেই ইচ্ছা হয় না। কর্ম্মে যদি মাতৃসেবা থাকে, গোঁসাই কি আর তাহা কাটায়ে দিতে পারেন না?" আমি বলিলাম—"কিছুমাত্র না ভোগায়ে সহজে এ কর্ম্ম কাটায়ে দিতে পার্‌লে তিনি কি আর দিতেন না? ঠাকুর যাহা বলেন, অবিচারে সেরূপ করাই ত ভাল।" সতীশ বলিলেন—"ভাই, সেটি পার্‌ব না, ওকথা আর বলিস্ না। গোঁসাই ইচ্ছা কর্‌লে সবই কর্‌তে পারেন। শুধু বৃথা বৃথা আমাদের ভোগায়ে মার্‌ছেন। আমি উঁহার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে অবাক্ হয়েছি। জানিস্ তো আমি ঘোর ব্রাহ্ম ছিলাম। সহজে কিছুই বিশ্বাস করি না; কিন্তু গোঁসাইয়ের অদ্ভুত শক্তি দেখে আমার আর অবিশ্বাস কর্‌বার যো নাই। অল্প দিনের একটি ঘটনা শোন্, বুঝ্‌তে পার্‌বি।" অতঃপর সতীশ আমাকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—ভাই, উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলাম, সে সকল ব্যাপার তো সবই জান। "কিছুদিন হয় পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মা আমাকে বাড়ী যাইতে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু আমি পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই যেন কেমন হইয়া গেলাম। সমস্ত ছাড়িয়া তখনই পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় যে কত অবস্থায় পড়িলাম, কত ভোগই ভুগিলাম, বলিতে পারি না। অনেক কষ্টের পরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলাম। তখন প্রতিদিনই গোঁসাইয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইত। এখানে আসামাত্রই গোঁসাই আমাকে বলিলেন—'তোমার পিতার প্রেতাত্মা সর্ব্বদা তোমার উপরে রয়েছেন, শাস্ত্রমত গিয়া শ্রাদ্ধাদি কর। তাতে তাঁরও বিশেষ কল্যাণ হবে, তোমারও উপকার হবে।' আমি গোঁসাইকে বলিলাম—উপবীত ত্যাগ ক'রে আমি ব্রাহ্ম হয়েছিলাম। শাস্ত্রমত শ্রাদ্ধ কিরূপে কর্‌ব? গোঁসাই বলিলেন—'উপবীত আবার গ্রহণ কর, তা হ'লেই হ'ল।' আমি বলিলাম—"গ্রহণই যদি কর্‌ব, তবে আর ত্যাগ করিলাম কেন? উপবীতের যদি তেমন কোন গুণই থাকৃত, তবে কি আর উহা ত্যাগ কর্‌তাম —না ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তাম?" গোঁসাই আমার একথা শুনিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন— "বটে, উপবীতের গুণ নাই! সে ভাবে উপবীত পাও নাই, তাই; তেমন ভাবে ব্রাহ্মণে উপবীত দিলে সাধ্য ছিল তুমি ত্যাগ কর? উপবীতের গুণ দেখ্‌বে? আচ্ছা আমি তোমায় উপবীত দিচ্ছি, তুমি তা ত্যাগ কর দেখি নি?" এই বলিয়া কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই আমার গলায় এক গাছা উপবীত ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন—"সতীশ, এই উপবীত এখন তুমি ফেল দেখি।" ভাই, গোঁসাই উপবীত দিলে অমনিই আমি উহা ফেলিয়া দিব, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম—জেদও আমার খুবই হইয়াছিল। গোঁসাই যখন ঐ কথা বলিয়া আমাকে উপবীত দিলেন, আমি উহা সেই মুহূর্ত্তেই ফেলিয়া দিতে যেমন উপবীত স্পর্শ করিলাম, আমার কেমন এক অবস্থা হইল, সর্ব্বশরীর ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, ভিতর হইতে সবেগে গায়ত্রী-মন্ত্র উঠিতে লাগিল, ভিতরে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হইল। সর্ব্বাঙ্গ আমার অবসন্ন হইয়া পড়িল,

আমি তখন কাঁদিতে লাগিলাম, পুনঃপুনঃ গোঁসাইকে নমস্কার করিতে লাগিলাম, তাই বলি, ভাই, আমি তো বহুবার দেখেছি, গোঁসাই সবই কর্‌তে পারেন। তবে বৃথা বৃথা আমাদিগকে ভোগাচ্ছেন কেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়ার পর হইতে আমার নিজেরই জীবনে যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার অনুভব করিতেছি, তাহা মনে করিয়া ভাবিলাম—'এ আর কি?' আমার অদ্ভুত অনুভূতির কথা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়া সতীশকে বলিলাম—"এ সব দেখিয়াই তো ঠাকুরের কোন কথা আর অগ্রাহ্য কর্‌তে সাহস হয় না।"

সতীশ আমাকে তাঁহার রিপুর উত্তেজনা সম্বন্ধে যে সমস্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা বলিলেন, শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি তাঁহার দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া ব্যথিত মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি বলিলেন—"সতীশ তাঁর যে সব অবস্থার কথা তোমাকে বল্‌ছিলেন, তাতে বুঝা যায়, এখানে তাঁর আর থাকা ভাল নয়। তাঁকে বলে দাও, অন্যত্র গিয়ে থাকুন।"

আমি ঠাকুরের কথামত আসিয়া সতীশকে সব বলিলাম। সতীশ আমার উপরে বিরক্ত হইয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"যা যা, ব্যাটা, গোঁসাই আমাকে বল্‌তে পারেন না?" তখন আমি আসিয়া ঠাকুরকে ঐকথা বলাতে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন—"সতীশ তোমার ভিতরের যেরূপ অবস্থা, স্ত্রীলোক হ'তে দূরে থাকাই ভাল। এখানে যখন স্ত্রীলোক রয়েছেন, তখন তুমি অন্যত্র গিয়ে থাক। আহারাদি এখানে ক'রে যেও, থাকার বন্দোবস্ত অন্য কোথাও ক'রে নেও।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সতীশ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। খুব তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—"কেন, আমি যাব কেন? স্ত্রীলোক সব এখান থেকে চলে যাক্। ওদের অন্যত্র যেতে বলেন না কেন? সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্ত্রীলোক কেন থাক্‌বে? আমি কখনও এখান থেকে যাব না।" সতীশ এই কথা বলিয়াই ঠাকুরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তখনই তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন—"সতীশের মা'র যে কি বিষম অবস্থা, বলা যায় না। সময়ে সময়ে তাঁর জ্বালার আঁচ আমার বুকে এসে লাগে। তাতেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়ি।" ঠাকুর বলিলেন—"পিতৃশ্রাদ্ধ না ক'রে এই ভাবে সতীশ এসেছেন বলেই নানাপ্রকার উৎপাত ভোগ কর্‌ছেন।"

শ্রাদ্ধে প্রেতাত্মার যন্ত্রণার শান্তি।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রাদ্ধে কি যথার্থই প্রেতাত্মার ক্লেশের শান্তি হয়? ঠাকুর এখানকার একটি অল্প দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"একদিন আমি যমুনার তীরে তীরে

কালীদহের নিকটে উপস্থিত হ'তেই, একটি প্রেত এসে আমার সম্মুখে প'ড়ে বিষম ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"ওরকম কর্‌ছেন কেন?" প্রেত বল্‌লেন—'প্রভু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আর এ ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পারি না। শত সহস্র বৃশ্চিক আমাকে সর্ব্বদা দংশন কর্‌ছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে দিনরাত আমি দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছি। মুহূর্ত্তের জন্য আমি নিস্তার পাচ্ছি না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' আমি তাঁকে বল্‌লাম, "আপনার কোন্ পাপে এই দণ্ড।" প্রেত চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্‌লেন 'প্রভু, এখানে আমি * * * মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবায় যে সমস্ত অর্থাদি পেতাম, সেবাতে না লাগায়ে তাহা আমি ভোগবিলাসে ও বদ্‌মাইসীতে উড়াতাম। এটিই আমার গুরুতর অপরাধ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কিসে আপনার এই ভোগের শান্তি হবে?" প্রেতাত্মা বল্‌লেন—'আমার শ্রাদ্ধ হয় নাই; শ্রাদ্ধ হ'লেই এই ক্লেশের শান্তি হবে। আপনি দয়া ক'রে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে দিন'। আমি বল্‌লাম—"কি প্রকারে ব্যবস্থা কর্‌ব?" প্রেত বল্‌লেন—'আমার শ্রাদ্ধের জন্য দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর হাতে দিয়েছিলাম; কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত আমার শ্রাদ্ধ করে নাই। আপনি দয়া ক'রে ঐ অর্থ আনায়ে কতক ঠাকুর সেবায় দিয়ে দিন; বাকি টাকা দ্বারা আমার কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধ ক'রে, মহোৎসব কর্‌লেই আমি এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচি। প্রেতের কথা শুনে আমি সেই মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারীর নিকটে গিয়ে সমস্ত বল্‌লাম। পরে এসব ব্যাপার সেই প্রেতের ভাইপোকেও বিস্তারিতরূপে জানান হ'ল। তিনি ভেবেছিলেন ঐ অর্থের আর কেহ খোঁজই নিবে না। যা হোক্ তিনি সমস্তগুলি টাকা দিয়ে বিধিমত শ্রাদ্ধটি কর্‌লেন। মহোৎসবাদিও হ'ল। পরে সেই প্রেতের ঐ যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে। কয়েকদিন হয়, এখানে এই ঘটনা হ'য়ে গেছে।"

চীরঘাটে নৌকালালা!

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। যমুনার তীরে তীরে গিয়া চীরঘাটে পৌঁছিলাম। সেখানে ঠাকুর একটি বৃক্ষের মূলে বসিয়া, পরপারের বেলবাগের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অল্পক্ষণ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নাম করিয়া কাটাইয়া, সন্ধ্যার পরে আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। কুতু তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল আনিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ ধোয়াইয়া দিতে সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর তামাসা করিয়া কুতুকে বলিলেন—'কুতু আজ কতগুলি বেড়ালের গু মাড়িয়ে এসেছি। পায়ে গুগুলি জড়ায়ে রয়েছে।' কুতু 'তা বেশ, তা বেশ'

বলিয়া চরণ ধরিতে উপক্রম করামাত্রই ঠাকুর পা দুটি সরাইয়া লইয়া বলিলেন—'আরে, থাম্ না, পায়ে যে বিশ্রী গু লেগে রয়েছে।' কুতু বলিলেন—'তা হোক্ না, ওতে আমার একটুও ঘৃণা নাই। আমি রগ্‌ড়িয়ে বেশ পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিচ্ছি।' ঠাকুর বলিলেন—'আরে, তোর হাতে যে গু লাগ্‌বে।' কুতু একটু হাসিয়া বলিলেন—'ও কি বল্‌ছ, তোমার পায়ে যে লেগে রয়েছে ও আবার গু কি?' ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না। আমি কুতুর এই ভাবটি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আহা! ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে যাহা লাগিয়া আছে, তাহা কি আর গু আছে? তাহাতে আবার ঘৃণা কি? ঠাকুরের উপরে কতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিলে এই প্রকার ভাব স্বভাবসিদ্ধ হয়, আমি তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। ধন্য কুতু!

আমরা সকলে বারেন্দায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছি, কুতু ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, যমুনাতীরে যখন আমরা সকলে ব'সে ছিলাম, তখন তুমি সমাধির অবস্থায় 'ডুব্‌বে না, ডুব্‌বে না,' ব'লে খুব হেসেছিলে কেন? ঐ কথা তুমি কাকে বলেছিলে?"

ঠাকুর বলিলেন—'আর কাকে বল্‌ব?' কুতু বলিলেন—খুলে বল না কেন? ঠাকুর বলিলেন—"ওরে যমুনাতীরে গিয়ে বস্‌তেই কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এলেন, আমাকে বল্‌লেন—"ওঠ্! একবার যমুনায় 'বাচ্' খেলি গিয়ে।" কৃষ্ণের কথায় নৌকায় উঠ্‌লাম। কৃষ্ণ নৌকার গলুইয়ের উপরে ছিলেন। মাঝ যমুনায় নৌকাখানা নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে ধর্‌লেন। নৌকা তখন ডুবে ডুবে। নৌকায় যাঁরা ছিলেন, সকলে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। আমিও দেখ্‌লাম, কৃষ্ণ নৌকাখানা ডোবান ডোবান। তখন মনে হ'ল, কৃষ্ণ ভয় দেখাচ্ছেন। এ নৌকা কখনও ডুব্‌বে না। নৌকা ডুব্‌লে তো শুধু আমরাই ডুব্‌বো না, কৃষ্ণ যখন নৌকায় আছেন, গলুই দিয়া জল উঠ্‌লে কৃষ্ণই আগে ডুব্‌বেন। তাই সকলকে বলেছিলাম, 'ভয় নাই, ডুব্‌বে না, ডুব্‌বে না, এসব কৃষ্ণের চালাকী।"

কুতু। তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে গেলে, আমাদের নিলে না কেন?

ঠাকুর। ওরে, সে যে বড় ছোট নৌকা। তাতে কি আর বেশী লোক ধরে?

মাঠাকরুণ বলিলেন—তোমাদের খেলা বরং দেখ্‌তে দিতে। তাও তো দিলে না।

ঠাকুর বলিলেন—তাতে আর লাভ কি হ'ত। একটা চিত্র দেখার মত দেখ্‌তে বই তো নয়।

মাঠাকরুণ কহিলেন—তাই বা ক্ষতি কি ছিল? 'নাই চেয়ে কাণা ভাল।'

মাঠাকরুণ, কুতু এবং ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না।

কুতু, ঠাকুরকে বলিলেন—বাবা, গেণ্ডারিয়ায় যখন ছিলাম তখন তুমি আমাকে চিঠি লেখ নাই কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—তোকে আবার চিঠি লিখ্‌ব কি ? তুই তো সর্ব্বদা আমাকে দেখ্‌তে পেতিস্‌।

কুতু বলিলেন—দেখ্‌তে পেতাম ব'লে কি তোমার আর চিঠি লিখ্‌তে নাই ?

ঠাকুর বলিলেন—দেখ্‌তে পেলে, কথা শুন্‌লে আর চিঠিতে দরকার ?

কুতু বলিলেন—দেখ্‌তে তো পেতাম ; কিন্তু কথা তো সর্ব্বদা শুন্‌তে পেতাম না।

ঠাকুর বলিলেন—সর্ব্বদা কথা শুন্‌লে কি আর ভাল লাগ্‌তো ?

আমি একটু ফাঁক পাইয়া কুতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুতু! আজকাল তোমাকে মশায় কামড়ায় না ?

কুতু বলিল—কামড়াবে কেন ? বাবা যে মশাদের নিষেধ করেছেন।

অনেকক্ষণ ইঁহাদের এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর আমরা শয়ন করিলাম।

মাঠাকৃরুণকে ঠাকুরের সঙ্গে রাখার কথা।

২২শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

গতকল্য সতীশ রোখের মাথায় ঠাকুরকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে ভাবনা হইল, বুঝি ঠাকুর আবার মাঠাকুরাণীকে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে বলেন। ঠাকুর ত বলিয়াছিলেন যে, মাঠাকৃরুণ সঙ্গে থাকিলে আশ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়। মাঠাকৃরুণকে সঙ্গে রাখিয়াছেন। ইহা কি ঠাকুরের নিজের ইচ্ছায়, না পরমহংসজীর আদেশে তাহা বুঝিতেছি না। এ বিষয় জিজ্ঞাসা করার আরম্ভমাত্রই ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—

কিছুকাল হয় একদিন গুরুদেব আমাকে সূক্ষ্ম শরীরে লইয়া গিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরুতে লাগ্‌লেন। পরে আমাকে মন্দার পর্ব্বতে নিয়ে উপস্থিত কর্‌লেন। সেখানে দয়া ক'রে তিনি আমাকে ঊর্দ্ধরেতা ক'রে দিলেন। বহুকাল ধ'রে ঊর্দ্ধরেতা হ'তে আমার একটা ইচ্ছা ছিল। আমার ঐ অবস্থা হওয়ায়, আমি ওঁর জন্য বিশেষ ক'রে বল্‌লাম, দয়া ক'রে ওঁকেও তিনি সে অবস্থা দিলেন। পরে একদিন গুরুদেব এসে আমাকে বল্‌লেন, 'তুমি ত সম্পূর্ণ নিরাপৎ হয়েছ। তুমি পাহাড় পর্ব্বতেই থাক, আর বাড়ী ঘরেই থাক, সর্ব্বত্রই তোমার অবস্থা একই প্রকার। ওঁকে তুমি এখানেই রাখ ; ভালই হবে।' গুরুদেবের আদেশমতই আবার ওঁকে আনা হয়েছে। না হ'লে, আমি তো উত্তরকুরুতেই যাব মনে করেছিলাম।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, 'হায় রে! কি দুর্দ্দশা। ঠাকুরের কার্য্যেও আমার আবার প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল।' যাহা হউক, একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম— উত্তরকুরুতে কি যাওয়া যায়?

ঠাকুর বলিলেন—যাওয়া যাবে না কেন, তবে বড় কষ্ট।

আমি বলিলাম—শুনিতে পাই মানসসরোবরে ও কৈলাসে নাকি কেহ যেতে পারে না?

ঠাকুর বলিলেন—পার্‌বে না কেন? হঠযোগ খুব অভ্যাস থাক্‌লেই পারে। না হ'লে যাওয়া অসম্ভব হয়। সেদিন যে পরমহংসটি এখানে এসেছিলেন, তিনি কৈলাস হ'তেই এসেছেন।

কৈলাসযাত্রার বিবরণ।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই সাধুটির সঙ্গে পূর্ব্বেও কি আপনার পরিচয় ছিল? তিনি কিরূপে গিয়েছিলেন?—একা, না সঙ্গে আরও কেহ ছিলেন?"

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরমহংসটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। একটি হঠযোগী সাধু, এই পরমহংস এবং আমি কৈলাসে যাওয়ার সঙ্কল্প ক'রে যাত্রা কর্‌লাম। অনেক দূর পাহাড়ের পথে চলে চলে একটি খুব বড় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হ'লাম। একটি লোক এসে আমাদের যাওয়ায় বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"ঐ পাহাড়ের উপর যেতে হুকুম নাই।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, কেন? তিনি বল্‌লেন, "ঐ পাহাড়ে মানুষ উঠ্‌লেই পাথর হ'য়ে যায়।" তাঁর কথায় সন্দেহ হওয়াতে তিনি আমাদের বহু দূরে পাহাড়ের উপরে তিনটি মানুষ দেখায়ে বল্‌লেন—"ঐ দেখুন, উহারা সব পাথর হ'য়ে রয়েছে।" ঐ পাহাড়ে উঠ্‌বার পথে পাহাড়েরই ধারে একখানা বড় পাথরে বড় বড় অক্ষরে খোদা রয়েছে—"অত্র অগ্রে ন গচ্ছন্তি।" পাহাড়ের ঐ প্রকার অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাওয়ার সময়ে ঐ কথা লিখে গিয়েছিলেন, পাছে কেহ ঐ পথে চলে বিপন্ন হন। আমরা ঐ সব দেখে ওদিক্ দিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লাম। হঠযোগ আমার অভ্যাস নাই, পথে আরও কত প্রকার বিঘ্ন থাক্‌তে পারে, এই ভেবে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী দু'টি ফির্‌লেন না। তাঁরা বল্‌লেন—"অগ্নির অভাব আমাদের হবে না, সঙ্গে 'চকমকি' আছে। রাস্তায় যদি জল পাই তা হ'লে আমাদের ক্রিয়া চল্‌বে; ক্রিয়াটি চল্‌লে আমাদের শরীরের কিছু হবে না।" ঐ কথা বলে তাঁরা অন্য পথ ধ'রে একটু ঘুরে চলে গেলেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে এসে সেই পরমহংসটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল।

রাস্তার সমস্ত বিবরণই তিনি আমাকে বল্‌লেন। শুন্‌লাম—উঁহারা পাহাড়ের পথে অনেক দিন চলে মানসসরোবরে উপস্থিত হলেন। কৈলাসে যেতে হ'লে মানসসরোবর দিয়েই যেতে হয়। কৈলাসের সমস্ত যাত্রী একটা নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করেন। সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে মানসসরোবরের মধ্যে মহাদেবের রথ ওঠে। যাঁদের ঐ রথের চূড়াটিও দর্শন হয় তাঁরাও কৈলাসে যাত্রা করেন, অবশিষ্ট সকলে থেকে যান। যদি কেহ রথ বা চূড়া দর্শন না পেয়েও কৈলাসে যান, তাঁর কৈলাসে গিয়ে মহাদেব দর্শন অদৃষ্টে ঘটে না। কৈলাসের যাত্রীদের মহাদেব দর্শনের ঐটিই পরীক্ষা। হঠযোগী সাধু ও পরমহংস মানসসরোবরে গিয়ে, নির্দ্দিষ্ট দিনের বিলম্ব আছে জেনে, মানসসরোবর পরিক্রমা কর্‌লেন। পরিক্রমায় তাঁদের সতের দিন লেগেছিল। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে সরোবরের চারি দিকে সহস্র সহস্র সাধু মহাত্মাদের 'হর হর বোম বোম' শব্দ উঠ্‌ল, ফুল বিল্বপত্র, ধূপ ধূনা চন্দনাদি নিয়ে সকলেই সরোবরে মহাদেবের পূজা আরতি কর্‌তে লাগ্‌লেন। ঐ সময়ে মানসসরোবরের জল পাক দিয়ে খুব ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। সকলেই মহাদেবের স্তব-স্তুতি কর্‌তে কর্‌তে সরোবরের দিকে তাকায়ে রইলেন। যথাসময়ে পাকজলের মধ্যস্থলে সুবর্ণরথের চূড়া উঠ্‌ল। পরমহংসটি উহার দর্শন পেয়ে কৈলাসের দিকে চল্‌লেন; কিন্তু হঠযোগী সাধুটি চূড়া দর্শন পেলেন না, কাজেই ওখান হ'তে ফিরে এলেন। পরমহংসটি আরও কয়েকটি মহাত্মার সঙ্গে কৈলাসে গিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। কৈলাস পর্ব্বতের ১০৮টি শৃঙ্গ একটির পর একটি শৃঙ্খলামত উঁচু; প্রত্যেকটি শৃঙ্গই শিবলিঙ্গের আকার। ঐ সকল শৃঙ্গকেও শিবলিঙ্গ বলে। ঐ সকল শিবলিঙ্গ পরিক্রমা ক'রে কৈলাসে ওঠ্‌বার নিয়ম। এক একটি শৃঙ্গ পরিক্রমায় প্রায় এক এক দিন লাগে। শুন্‌লাম ১০৮টি শৃঙ্গ পরিক্রমায় ওঁদের ঠিক ১০৮ দিনই লেগেছিল। ঠিক শিবচতুর্দ্দশীর দিনে কৈলাসের উপরে মন্দিরের নিকটে উঁহারা উপস্থিত হলেন। যথাসময়ে রাত্রে আপনা আপনি মন্দিরের দরজা খুলে গেল। সকলে তখন মন্দিরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ মহাদেব ও ভগবতীর দর্শন পেলেন। এই দর্শন বেশী সময়ের জন্য হয় না, ৩।৪ মিনিট মাত্র। পরমহংসটির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অনেক কথা হ'ল। ৩।৪ বৎসর পরে এবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা।"

তিব্বতে বাঙ্গালী বাবু।

ঠাকুরের এ সকল কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনেছি তিব্বত দেশেও অনেক ভাল ভাল বৌদ্ধ লামা যোগী আছেন। সে সব স্থানে আমরা যেতে পারি না?"

ঠাকুর বলিলেন—আগে বরং এ দেশের সাধুরা যেতে পার্‌তেন। এখন আর সেখানে যাওয়ার যো নাই। একটি বাঙ্গালী বাবু সেখানে যাওযার পর থেকে যত বিঘ্ন ঘটেছে। সেখানে আইন হয়েছে এখন তিব্বতে আর কারও ঢুক্‌বার হুকুম নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—বাঙ্গালীটি যাওয়ায় কি ঘটেছিল?

ঠাকুর বলিলেন—কিছুকাল হয় ছদ্মবেশে একজন বাঙ্গালী বাবু তিব্বতে গিয়ে সে দেশের ভাষা শিখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর গোপনে গোপনে ঐ দেশের নক্‌সা আঁক্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। অবশেষে ধরা পড়াতে আর তিনি দেশে আস্‌তে পার্‌বেন না, রাজার এরূপ আদেশ হ'ল। বাঙ্গালী বাবুটি রাজার পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলেন, এবং দেশে যাতে আবার ফিরে আস্‌তে পারেন, সে বিষয়ে সুবিধা করে দেবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌লেন। বিপন্ন শরণাগতকে পরিত্যাগ কর্‌তে নাই ব'লে পণ্ডিতজী তাঁকে আশ্রয় দিলেন। পরে পণ্ডিতজীর কথামত তিনি শপথ কর্‌লেন, দেশে এসে তিনি ঐ ভাষা আর অন্য কাকেও শিখাবেন না। আর তিব্বতের রাস্তা ঘাটের পরিচয় কাকেও দিবেন না। রাজপণ্ডিত মহাধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি ঐকথা বিশ্বাস ক'রে, সেই বাঙ্গালী বাবুটিকে কান্ধে তুলে গভীর রাত্রে পাহাড়-পথে প্রায় ৪।৫ ক্রোশ চলে একটি নিরাপৎ স্থানে পৌঁছায়ে দিলেন। বাবুটি কলিকাতা এসেই সমস্ত প্রকাশ ক'রে দিলেন এবং তিব্বতী ভাষাও শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন। এই কথা ক্রমে তিব্বতে প্রচার হওয়ায় সেখানকার রাজা সেই পণ্ডিতজীকে বিষম দণ্ড দিলেন। একটা চামড়ার ভিতরে তাঁকে পুরে চার দিক সেলাই ক'রে নদীতে ডুবায়ে দিলেন। একজন লামা-গুরু কিছুদিন হয় আমাকে এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বল্‌লেন—"রাজা যদি আমাদের মত দশ হাজার লোকেরও মাথা নিয়ে, যোগীশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজীকে ছেড়ে দিতেন, সমস্ত দেশের লোক তাতে খুসী হ'ত। গুরুজী সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাজাও তাঁকে খুবই সম্মান ও পূজা কর্‌তেন; কিন্তু এরূপ কঠোর শাসন না হ'লে, দেশ রক্ষা শক্ত হবে স্থির ক'রে দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে এভাবে জীবন নাশের দণ্ড দিলেন। সেই লামা-সাধুটি এসে পুনঃপুনঃই "বেইমান বাঙ্গালী, বেইমান বাঙ্গালী" বল্‌তে লাগ্‌লেন। বাঙ্গালীদের উপরে

তিব্বতীদের এখন আর বিশ্বাস নাই—তাঁরা সকলেই এখন 'বেইমান বাঙ্গালী' ভিন্ন বলেন না।"

মাঠাকুরাণীর ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া মাঠাকুরাণীর অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। এ সকল ঘটনা কি ভাবে ঘটিতেছে, কিছুই বুঝিতেছি না। মাঠাকৃরুণ আসিয়া আমাদের আহারাদির সমস্ত ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের এতগুলি লোকের যখন যে বস্তুর প্রয়োজন, না জানাইলেও, মাঠাকৃরুণ তাহা নিজেই বুঝিয়া যোগাড় করিয়া দেন। টাকা-পয়সা পূর্ব্বে যেমন আসিত, এখনও ঠিক সেইরূপই আসিতেছে; অথচ আমাদের কোনও বস্তুরই অভাব নাই। ভাণ্ডারঘর সর্ব্বদাই জিনিসে পরিপূর্ণ। নিত্য আমরা ন' দশটী লোক দু'বেলা আহার করিয়া থাকি, তাহা ছাড়া বাসাতে নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার দু' তিন দিন অন্তরই চলিতেছে—মাঠাকৃরুণ ছোট একটি 'বোক্‌নাতে' মাত্র একবার অন্ন পাক করেন; বোক্‌নাটিতে এক সেরের অধিক চাউল ধরে না। ডা'ল, তরকারি প্রভৃতি ৫।৬ রকম ব্যঞ্জন ছোট একখানি কড়াতে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পাত্র ছোট হইলেও, একটি বস্তু আবার দ্বিতীয়বার রান্না করা মাঠাকৃরুণের নিয়ম নাই। যখন আমরা সময়ে সময়ে পনর-কুড়ি জন লোক আহারার্থে উপস্থিত হই এবং অতিরিক্ত লোকের আহারের নিমন্ত্রণ হয়, তখনও মাঠাকৃরুণ নিয়মিত পরিমাণের অধিক রান্না করেন না। রান্নাটি হইয়া গেলে দাউজী-ঠাকুরকে ভোগ দেন, ভোগ সরাইয়া সমস্ত প্রসাদ রসুই ঘরে রাখা হয়। রসুই ঘরেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাত্র এক বোক্‌না প্রসাদে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা আমরা যত লোক উপস্থিত থাকি না কেন, মাঠাকৃরুণ নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইয়া থাকেন। সকলের আহার হইয়া গেলে মা ও কুতু প্রসাদ পান। অতিরিক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের জোগাড় কোথাহইতে কি ভাবে হয়, বুঝিতেছি না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যহই এখানে হইতেছে। ডা'ল তরকারি ইত্যাদি রান্না বস্তুর স্বাদও এক নূতন রকম দেখিতেছি; এরকম খাদ্য-সামগ্রী জীবনে আর কোথাও কখন খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কুতুবুড়ী ভোগ রান্নার সময়ে মাঠাকৃরুণের সাহায্য করেন। আমাদের ঐ সময়ে ওদিকে যাওয়ার হুকুম নাই। রান্নার সমস্ত জোগাড় করিয়া অন্ন ও ৫।৭টি ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া লইতে মাঠাকৃরুণের দু' তিন ঘণ্টার অধিক সময় কোন দিনই লাগে না। কি কৌশলে যে মাঠাকৃরুণ এ সকল কার্য্য শৃঙ্খলারূপে সমাধা করেন, নানাপ্রকারে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে হরিবংশ পাঠের পর মাঠাকৃরুণের ঘরে যাইয়া বসিলাম। মাঠাকৃরুণ আমাকে বলিলেন—"কুলদা, বোধ হয় শীঘ্রই তোমার দেশে যাওয়া হবে। দেশে গিয়ে মায়ের সেবা বেশ ক'রে ক'রো।" মাঠাকৃরুণের কথা

শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার দেশে যাওয়া হবে, ইহা কি আপনি পরিষ্কার দেখে বল্‌ছেন।" মাঠাকুরুণ বলিলেন—"কেন? দেশে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না? দেশে গিয়ে তোমার ভালই হবে।" আমি বল্‌লাম—"মা, আপনার বিষয় তো আমি কিছুই জান্‌লাম না। আপনার অবস্থার ২।১টি ঘটনা আমাকে বলুন না। কৃপণের মত আপনি সবই লুকিয়ে রাখেন কেন?" মা বলিলেন—"তোমায় একটি কথা বলি, যদি ধর্ম্মজগতে বড়লোক হ'তে চাও, ধনী হ'তে চাও, কৃপণ হ'য়ো। নিজের কোন অবস্থাই কারুকে ব'ল না, বল্‌লে আর তা থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভবিষ্যতের সব ঘটনা কি আপনার নিকট প্রকাশ হয়?

মাঠাকুরুণ। হবে না কেন? তবে সবই কি আর প্রকাশ হয়? দূরের বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানা যায়; আর ৫।৭ দিনের ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি সর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকে।

আমি। সাধনের সময়ে আপনার দর্শনাদি হয় না? সমাধি কখনও হয় কি?

মাঠাকুরুণ। সাধন ভজন আর করি কোথায়। দিনের বেলা তো সেবার কাজ কর্ম্মে কেটে যায়। মধ্যাহ্নে অবসর পেলে একটু বিশ্রাম করি। বিকাল বেলাটিও ঠাকুর দর্শনেই চলে যায়, রাত্রেই মাত্র বসি। তখন দর্শনও হয়। এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, সমাধি নিয়ে প'ড়ে থাকি, আবার সে ইচ্ছা হয় না; সমাধির চেয়ে এই ভাবে সেবার কাজ ক'রে দিন শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।

এই প্রকার অনেক কথার পর মা আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—"ভবিষ্যতে কাহার কি অবস্থা ঘটবে, এখন তা ত আর বলা যায় না। তাই তোমাকে কয়েকটা কথা বল্‌ছি, মনে রেখো। মা'র জন্ত আমার বড় কষ্ট হয়। মা আমার বড় দুঃখিনী। আমাকে নিয়েই তিনি চিরকাল রয়েছেন। কত ক্লেশই পেয়েছেন। একটি দিনের জন্তেও সুখী হ'তে পারেন নাই। ভবিষ্যতে মা'র অদৃষ্টে কি যে আছে বলা যায় না। মাকে দেখো। বৃদ্ধাবস্থায় অন্তের গলগ্রহ না হ'য়ে, মা যদি কোনও তীর্থে গিয়ে থাক্‌তে চান্, ৪।৫টি টাকা মাসিক মাকে জোগাড় ক'রে দিও; আর তাঁকে খুব সান্ত্বনা দিও।"

আমি বলিলাম—দিদিমার জন্য আপনি ভাব্‌বেন না। কোন কালেও তিনি কষ্ট পাবেন না। অন্ততঃ ভিক্ষা ক'রে, আমিই দিদিমার অভাব দূর কর্‌বো।

মাঠাকুরুণ আবার বলিলেন—"তোমায় আর একটি কাজ কর্‌তে হবে শান্তিসুধার গর্ভাবস্থা। তাকে আমি ফেলে এসেছি। মা'র সঙ্গে তার তেমন সদ্ভাব নাই। শান্তির মাথাও ভাল নয়। গর্ভাবস্থায় যদি সর্ব্বদা মানসিক কষ্ট পায়, গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট কর্‌বে। তুমি শান্তিকে আমার নামে একখানা পত্র লিখে দাও। 'আমার যা কিছু, সমস্তই শান্তির। গেণ্ডারিয়া-আশ্রম শান্তিরই। শান্তি যেন ওখানেই স্থির হ'য়ে থাকে।'"

মাঠাকুরুণের আদেশমত তাঁহারই নামে আমি অমনি শ্রীমতী শান্তিসুধাকে পত্র লিখিলাম। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মাঠাকুরুণের এ সকল কথা শুনিয়া আমার নানাপ্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মাকে আর গেণ্ডারিয়াতে ফিরাইয়া নেওয়া যাইবে না।

সে কথাও আমার এখন মনে পড়িল। ভাবিলাম, যদি মাঠাক্‌রুণ অচিরে দেহত্যাগই করেন, তাঁহার তো কোন সেবাই আমি করিতে পারিলাম না।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা, আপনার কথা শুনে আমার নানারকম আশঙ্কা হয়। আপনার মনে কোন বিষয়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে কি না, জান্‌তে ইচ্ছা হয়।

মা বলিলেন—কুতুর বিবাহ হিঁদুসমাজে হয়, আর যোগজীবন সমাজে ওঠে, এই দু'টি আকাঙ্ক্ষা আমার আছে। আর 'গোস্বামী মশাই' মহাভারত পড়্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁকে একখানি মহাভারত দিতে ইচ্ছে হয়। কুতু ছেলেমানুষ, ব্রজমায়ীদের মত ওর পায়ে একজোড়া পাঞ্জোর দিলে হ'ত। আর কোনও বাসনা আমার নাই।

মাঠাক্‌রুণ কুতুর বিবাহের জন্য একটুকু ব্যস্ত আছেন, কথার ভাবে বুঝিলাম। তিনি সে সম্বন্ধে আমাকে আরও অনেক কথা বলিলেন।

স্বপ্নে ভূতের উপদ্রব

২৩শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

আজ অবসরমত গত রাত্রির একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্নের বৃত্তান্ত ঠাকুরকে বলিলাম। 'রাত্রি প্রায় ২॥টার সময়ে দেখিলাম, আমি আসনে বসিয়া, স্থির হইয়া নাম করিতেছি, অকস্মাৎ একটা বিকটাকার ভূত আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া আমাকে সাধন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি এক এক সময়ে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলাম ; কিন্তু, নাম ছাড়িলেই বিপদ্ ঘটিবে বুঝিয়া, খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। তখন সেই ভূতটা ভয়ঙ্কর একখানা খড়্গ হাতে লইয়া আমাকে কাটিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, এবং বলিল—"ঐ নাম নিলে, ঐ সাধন কর্‌লে, তোকে কেটে খণ্ড-খণ্ড কর্‌ব। শীঘ্র ঐ সাধন ছেড়ে দে।" আমি ভূতের সেই ভীষণ আকৃতি ও ভয়ঙ্কর আক্রোশ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ তখন আমার মনে হইল, গুরুদেব বলিয়াছেন—স্থিরভাবে সাধন কর্‌লে, নাম কর্‌লে কেহই আর কোন বিঘ্ন কর্‌তে পার্‌বে না। এই কথা স্মরণ হওয়ায়, ভূতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি নাম করিতে লাগিলাম। ভূতটা তখন আর আমার দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। "নাম ছাড়," "নাম ছাড়," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। আমিও নাম করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্ন শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—এ আর কি এ তো কিছুই নয়। যে পথে চলেছ—কত বাঘ, সাপ, কত ভূত, প্রেত, কত দেবদেবী এসে বাধা জন্মাবে। সকলেই সাধন ছাড়াতে চেষ্টা কর্‌বে। খুব সাবধানে থেকো, কখনও কিছুতেই নাম ছেড়ো না। নাম কর্‌লেই ওসব উৎপাত দূর হবে। নাম ছাড়্‌তে অনেকেই বল্‌বে।

প্রকৃতির রোগ। কর্ম্মই ধর্ম্ম

জিজ্ঞাসা করিলাম—হরিবংশপাঠ শেষ হইলে পর এখন আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ পড়্‌ব ?

ঠাকুর বলিলেন—মহাভারতখানা আগাগোড়া বেশ ক'রে প'ড়ো। উদ্‌যোগ পর্ব্ব, শান্তি পর্ব্ব এবং অশ্বমেধ পর্ব্ব বিশেষ মনোযোগ ক'রে পড়্‌বে। ভাগবত একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ এবং তৃতীয় স্কন্ধ প'ড়ো। এসব পড়া হ'লে রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ পড়্‌তে পার। অন্য কোন পুরাণাদি এখন পাঠ ক'রো না। এই কয়খানা পড়্‌লেই হবে।

আমি বলিলাম—যাহা কোনকালে কল্পনাও করি নাই, এমন উৎকৃষ্ট অবস্থায় আপনি আমাকে রেখেছেন। কাম ক্রোধাদির নামগন্ধও আমার ভিতরে আছে ব'লে মনে হয় না ; কিন্তু আপনার সঙ্গ-ছাড়া হ'লে কত প্রকার পরীক্ষা প্রলোভনে পড়্‌তে পারি! তখন আমার ব্রহ্মচর্য্য কিপ্রকারে রক্ষা হবে ?

ঠাকুর বলিলেন—পরীক্ষা প্রলোভনে পড়্‌লেই বা। সে জন্য তোমার চিন্তা কি ? যেখানেই থাক, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা ক'রো। তা হ'লেই সব ঠিক্ হ'য়ে আস্‌বে। কাম ক্রোধ, এসকল তো মানুষের প্রকৃতি নয়—এসব মানুষের প্রকৃতির রোগ। রোগ হ'লে যেমন ঔষধ সেবন দরকার, এসকল উৎপাতের প্রতিকারের জন্যও সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। শরীরের রসেতেই এসকল নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। তাই শরীরের রস কমায়ে নিতে হয়। রসের হ্রাস কর্‌তে হ'লে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাক্‌তে হয়। এসব বিষয়ে যতটা পার চেষ্টা কর, ক্রমে সব ঠিক্ হয়ে' আস্‌বে।

ইহার পর ঠাকুরকে ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপপুণ্য এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর সংক্ষেপে তদুত্তরে বলিলেন—"যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মলাভের অনুকূল, তাহাই কর্‌তে হয়। ধর্ম্মের প্রতিকূল কর্ম্মই পাপ। মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে দু'দিনের সাধনেই হয় তো পাপ দূর কর্‌তে পারে ; মানুষের পাপ ছাড়্‌বার ক্ষমতাই আছে, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়্‌বার ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম ক'রেই; কর্ম্ম ক্ষয় কর্‌তে হয়। কর্ম্ম না ক'রে কারও নিস্তার নাই। কর্ম্মটি ধর্ম্মের বাহিরের বিষয় নয়, কর্ম্মই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-কর্ম্মের অতীত অবস্থা অনেক দূরে। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে, কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিলাম। ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌লাম। সমস্ত বিষয় থেকে এই ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হ'লেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হ'লেই বুঝ্‌বে বৈরাগ্য হয়েছে। কর্ম্ম না কর্‌লে বৈরাগ্য হয় না। তোমরা নিশ্চয় জেনো, যতই কর না কেন, কর্ম্ম যাহার যেটুকু আছে, আজ হউক, কাল হউক, দু'দিন পরে হউক, একদিন কর্‌তেই হবে।

সেটি না ক'রে কিছুতেই নিস্তার নাই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যেই সব শেষ হ'তে পারে, না হ'লে জোর ক'রে কার সাধ্য কর্ম্ম ছাড়ায়?"

মাতৃসেবা ও ভ্রাতৃসেবার আদেশ।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। কত কর্ম্মের বোঝা আমার অদৃষ্টে আছে, কিছুই ত জানি না। শীঘ্র শীঘ্র সে সকল সারিয়া না নিলে কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না; নিশ্চিন্তভাবে সাধন ভজন, ভগবানের নাম, কিছুই করিতে পারিব না। গুরুদেব আমার সমস্তই তো জানেন। তাঁহাকেই আমার কি কি কর্ম্ম, স্পষ্টতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া, সেগুলি শেষ করিয়া ফেলি। এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া, ঠাকুরকে আমি বলিলাম—"আমার যে সব কর্ম্ম আছে আমি তো তাহা জানি না। আপনি আমাকে পরিষ্কার ক'রে বলে দিন; আমি খুব উৎসাহের সহিত তাহাই কর্‌ব। সতীশকে গিয়া মাতৃসেবা কর্‌তে প্রতিদিনই তো বল্‌ছেন; স্বামিজীকেও কর্ম্ম কর্‌তে কতই বল্‌ছেন, কিন্তু এদের সে মতি হচ্ছে না। এপ্রকার দুর্ম্মতি পরে আমারও তো জন্মিতে পারে। তাই আপনি পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিন। আমায় কি কর্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—তোমার মাতৃসেবাই আছে। ওটি ক'রে নিলেই সব পরিষ্কার। নিয়মমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে, এখন যেয়ে মায়ের সেবা কর। তা হ'লেই সব ঠিক হবে। কিছুকাল মায়ের সেবা কর্‌লেই ওতে কত উপকার, বুঝ্‌তে পার্‌বে। চাক্‌রী অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা বা সংসার তোমায় আর কর্‌তে হবে না। মাতৃসেবা কর্‌লে তাতেই তোমার সমস্ত কেটে যাবে।

আমি বলিলাম—আমার সেবাতে মা সন্তুষ্ট হ'য়ে, যদি আমাকে ধর্ম্ম লাভ কর্‌বার জন্য আশীর্ব্বাদ করে ছেড়ে দেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌ব তো?

ঠাকুর বলিলেন—সেবাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে মা তোমাকে ছেড়ে দিলে, মা'র অনুমতি নিয়ে অনায়াসে আমার সঙ্গে থেকো। সে সবই হবে। এখন খুব ভক্তি ক'রে গিয়ে মার সেবা কর।

ঠিক এই সময়ে দশ টাকার একটি মনি-অর্ডার আমার স্বাক্ষর করিয়া লওয়ার জন্য পিয়ন আমাকে ডাকিতে লাগিল। স্বাক্ষর করিয়া টাকা দশটি আমি লইলাম। দেখিলাম, ফয়জাবাদ হইতে বড় দাদা এই টাকা পাঠাইয়াছেন। হঠাৎ তিনি এ সময়ে আমাকে টাকা পাঠাইলেন কেন বুঝিলাম না। ঠাকুরের কাছে যাইয়া একথা বলামাত্রই তিনি বলিলেন—এখন তুমি এখান থেকে তোমার বড়দাদার নিকটে চলে যাও। কিছুদিন সেখানে তাঁর সেবা কর। সন্তুষ্ট হ'য়ে তিনি

অনুমতি করলে বাড়ীতে গিয়ে মা'র সেবা ক'রো। সেবাদ্বারা সকল গুরুজনকে সন্তুষ্ট করে তাঁদের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে তবে ধর্ম্মপথে চল্‌তে হয়। তা হ'লেই অনায়াসে এই পথে চলা যায়। গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যদি একটি লোকও বাদী হন, ধর্ম্মপথে অনেক বিঘ্ন ঘটে।

এই সকল কথার পরে ঠাকুর আমাকে কাঙ্গাল ফিকিরের "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" খানা পাঠ করিতে বলিলেন। ঠাকুরের দীক্ষা ও আমাদের সাধনে শক্তিসঞ্চারের কথা এই পত্রিকার স্থানে স্থানে কাঙ্গাল কিছু কিছু লিখিয়াছেন। ঠাকুরের কথামত উহা পড়িয়া আমি শুনাইতে লাগলাম।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে ঠাকুরের দীক্ষাদি ও শক্তিসঞ্চারের কথা।

"১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, যে সময় কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময়ে এইরূপ একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকেই "মা মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হস্ত ধরিয়া, নানক আবার অন্য ভক্তগণের সঙ্গে গলাগলি হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর বৎসর, ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপাসনা করিতেছিলেন, তখন ঐ প্রকার একটি আধ্যাত্মিক দৃশ্যও প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে রংপুর কাকিনিয়ার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায়, যে সময় তত্রত্য ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রাতঃকালে বেদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই দিনও ঐ প্রকার আর একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই।"

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, ১ম ভাগ, ৩৯২ পৃষ্ঠা।

অসাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন—"তিনি একদা পর্ব্বতবাসী কয়েকজন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। একজন মান্দ্রাজবাসী তাঁহার পথপ্রদর্শক সঙ্গী হইয়াছিলেন। পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইলে, ললাটাদি স্থানে সিন্দূররঞ্জিত ভীষণমূর্ত্তি জনৈক ভৈরব তাঁহাদিগের গমনের অন্তরায় হইয়া প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। ভৈরবের এই ব্যবহারে মান্দ্রাজবাসী জাতীয় তেজে উগ্র হইয়া উঠিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'উগ্র হইলে কার্য্য হইবে না। আমি ইহার উপায় করিতেছি।' অনন্তর ভৈরবমূর্ত্তি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলে, গোস্বামী মহাশয় বেগে গমন করিয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। ভৈরব হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমরা মনে করিতেছ, আমি ঘোর পাষণ্ড ও নির্দ্দয়, বাস্তবিক তাহা নহে। এই পর্ব্বতে যে কয়েকজন যোগী বাস করেন তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ। আমি তাঁহাদের সেবার্থ নিযুক্ত আছি। বৈষয়িক

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, ২য় ভাগ, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

লোকেরা বিষয়ের শুভাশুভ জানিতে যোগিগণকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করে। ইহাতে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তন্নিমিত্ত তাঁহারা সুড়ঙ্গপথে পর্ব্বতাভ্যন্তরে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোকের তথায় যাইতে নিষেধ নাই। কে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও কে বিষয়ী, আমি প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িয়া তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। বিষয়ী হইলে ভয় পাইয়া প্রস্থান করে। আর যথার্থ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইলে, তোমাদের মত, উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে না। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গমন কর, যোগিগণকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তথায় জল নাই, এখানেই যাহা কিছু আহার করিয়া নির্ঝরের জল পান কর; এই কথা বলিয়া সেই ভৈরবমূর্ত্তি নরকপালে নরমাংস আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিল। "আমি কোনপ্রকার মাংসই আহার করি না" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিলেন; ভৈরবমূর্ত্তি ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদগকে ভৎ'সনা করিল; কিন্তু পথপ্রদর্শক হইয়া যোগিগণের নিকট লইয়া চলিল। গোস্বামী মহাশয় সুড়ঙ্গপথে হামাগুড়ি দিয়া অনেক কষ্টে যোগিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক দেখিলেন, সে স্থান ছাদশূন্য একবার কোঠার সদৃশ; অর্থাৎ চারি দিকে ভিত্তিস্বরূপ পর্ব্বত, মধ্যস্থান দিব্য পরিস্কৃত ও বৃক্ষলতায় সুশোভিত। যোগীদিগের মধ্যে একজন, গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ভৈরবমূর্ত্তিকে ভৎ'সনা পূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি অঘোরপন্থীর পথ অবলম্বন করিয়াছ, সুতরাং নরমাংস তোমার খাদ্য; কিন্তু অন্যপথাবলম্বীর যাহা খাদ্য নহে, তুমি তাহাকে তাহা প্রদান করিলে কেন? ইহাতে তোমার বিলক্ষণ ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি কি মনে কর, অঘোরপন্থী না হইলে কেহ সিদ্ধ হইতে পারে না? এ তোমার নিতান্ত ভুল। পথ কিছুই নহে, উপায়মাত্র। সিদ্ধিলাভ স্বতন্ত্র কথা। আমরা যে চারি জন এখানে আছি, আমরা কি এক পথ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়াছিলাম? কেহ বৈষ্ণব, কেহ অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে সকলেরই এক পথ ও এক উদ্দেশ্য। সুতরাং এক্ষণে কোন প্রণালীই আর নাই।" গোস্বামী মহাশয় যোগীদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, ভৈরবকে প্রবোধ করিতে যোগিবর সেই জিজ্ঞাসারই উত্তর দান করিলেন। যোগীরা যে বাহ্য দুটি নেত্রের ন্যায় ললাটাভ্যন্তরস্থ তৃতীয় নেত্রে সকলই জানিতে পারেন ও দেখিতে পান, এই ঘটনা তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তাহার পর যোগিগণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত, যে প্রকার আলাপ করিলেন, তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর সমুদায় দেশের সমুদায় ঘটনা বলিলেন। গোস্বামী মহাশয় সংবাদপত্রপাঠে যাহা অবগত এবং পরম্পরায় যাহা শ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তৎসমুদায়ের ঐক্য হওয়ায় তিনি বিস্মিত হইলেন। জঙ্গলময় নিবিড় পার্ব্বত্য প্রদেশে সংবাদপত্র দূরে থাকুক, সাংসারিক লোকজনেরও গতায়াত নাই। বিশেষ, পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস, ও উপস্থিত ঘটনার সংবাদ, পাঠক যাহা অবগত নহেন, যোগিগণ তাহা জানেন, ইহা যে দিব্যচক্ষুর ফল তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভৈরব যখন পাথর ছুঁড়তে লাগ্‌লেন, আপনারা কি কর্‌লেন? উহা কি আপনাদের গায়ে লেগেছিল?

ঠাকুর—ভৈরব ভয়ঙ্কর চীৎকার ক'রে গালি দিতে দিতে ঢিল ছুঁড়্‌তে লাগ্‌লেন, তখন সঙ্গের ব্রাহ্মবন্ধুটি দৌড়ে পালালেন। আমার গায়ে ঢিল পড়্‌তে লাগ্‌ল। পায়ে একই স্থানে দু'টি ঢিল পড়াতে ক্ষত হ'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি পা ঝাড়া দিয়ে সেই স্থানেই দাঁড়ায়ে জোড়হাতে একদৃষ্টে ভৈরবের দিকে তাকায়ে রইলেম। ভৈরব তখন অবাক্ হ'য়ে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই অবসরে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্‌লাম। তখন তিনি খুব আদর ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে পাহাড়ের একটা নির্জ্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভৈরব আমাকে একখানা পোড়া হাতের চেটো এনে খেতে দিয়ে বল্‌লেন, "মহাপ্রসাদ পাইয়ে।" হাতের চেটো তাঁদের খুব সম্মানের আহার। আমি মাংস খাই না ব'লে উহা পরিত্যাগ করাতে তিনি বড়ই দুঃখিত হলেন। পরে আমাকে মহাপুরুষদের নিকটে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি এক ঘরের চার কোণে চারিটি মহাত্মা সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছেন। তাঁরা পূর্ব্বে একজন আচারী, একজন অঘোরী একজন কাপালী ও একজন নানকপন্থী এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ পথাবলম্বী ছিলেন। গয়ার গম্ভীরনাথজীও তাঁদেরই মধ্যে একজন। পরমানন্দে শান্তিতে তাঁরা সকলে একই স্থানে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'লো।

আমি, ঠাকুরের কথামত, তৃতীয় ভাগ ব্রহ্মাণ্ডবেদের ১৭৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের দীক্ষা বিষয়ে কাঙ্গালের লেখা পড়িতে লাগিলাম।

ব্রহ্মাণ্ডবেদ
৩য় ভাগ, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে, একদা জনরব উঠিয়াছিল, অসাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এই জনরব একেবারে মূলশূন্য নহে। গোস্বামী মহাশয় দারজিলিঙ্গের বনপ্রান্তরে ষটচক্রভেদী কোন যোগীর সাধন দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, নর্ম্মদাতীরস্থ উক্ত ষটচক্রভেদী যোগীর গুরুদেবকে দর্শন করিতে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাবশতঃ তথায় গমন না করিয়া গয়াধামস্থ ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে উপস্থিত এবং তত্রত্য বৈষ্ণব মহান্তের নিকটে সাধনশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বিলাসবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিবেশে তত্রত্য আশ্রমের মহান্ত পরমহংসের নিকটে প্রায় নয় মাসযাবৎ জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের পদ্ধতি অনুষ্ঠানসহকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনের ধনকে এত করিয়াও হৃদয়মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া, এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে হতচৈতন্য অবস্থায় কয়েকদিন পড়িয়াছিলেন। অনন্তর স্পর্শানুভবে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, জনৈক পরমহংসের ক্রোড়ে শায়িত আছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রোড়হইতে অবতরণ

পূর্ব্বক সেই অপরিচিত পরমহংসের চরণে প্রণত: ও লুণ্ঠিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে লইয়া চলুন, এবং আমি যাহাতে সাধনের ধনকে হৃদয়মাঝে দেখিতে পাই, সেই উপদেশ করুন্; আমি গৃহাশ্রমে আর প্রতিগমন করিব না।" পরমহংসপ্রবর বলিলেন, "বৎস! স্থির হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং অনাথা শ্বশ্রূ তোমার আশ্রিত; তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইবে, এবং কিছুই সাধন করিতে পারিবে না।" গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বহুদূরস্থ নির্জ্জন পর্ব্বতবাসী তাহা কিরূপে জানিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই নিমিত্ত বিস্মিতনেত্র হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে আবার আর একটি কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন যে, পরমহংস হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তোমরা অনেকে মিলিয়া একখানি গৃহ 'উছাইয়া' ফেলিয়াছ; গৃহখান পুনরায় ছাইতে পারেন, এমন একটি লোকও তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। যেমন উছাইয়াছ, তদ্রূপ ছাইবার উপায় কর; নতুবা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইবে।" গোস্বামী মহাশয় পরমহংসের নিগূঢ় উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিলেন, "ভগবান্! সে সাধ্য আমার কিছুই নাই। সাধ্য লাভ করিতেই এতদিন আশ্রমে বাস করিলাম এবং এক্ষণে আপনার অনুগামী হইতে চাহিতেছি।" পরমহংসদেব কহিলেন, "আমি মানসসরোবরবাসী যোগী, তোমার নির্ব্বেদ জানিতে পারিয়া তিব্বত দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছি, ভয় নাই। আমি যে উপদেশ দান করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, গৃহখানি যেমন ছিল নূতন ছাউনীতে আবার তদ্রূপই হইবে।" তিনি এই কথা বলিয়া, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধনোপযোগী সহজ প্রাণায়াম শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অদ্য হইতে তোমার সাধনসহায় হইলাম। যিনি যে কোন দেশে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধন করেন, আমি তাঁহাদেরও সহায়তা করিয়া থাকি।" এবম্প্রকার নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, তিনি সামান্য পরমহংস নহেন। তাঁহার যে শরীর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাও জড়ময় দেহ নহে। পরমহংস-প্রবর সূক্ষ্ম শরীরে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। অতএব তদীয় শিক্ষাসাধন শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনপ্রার্থী পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে প্রাণায়ামশিক্ষাসহকারে লোকদিগকে সাধন প্রদান করিতেছেন, তাহাতে জ্ঞানসাধনের সহিত যোগ ও ভক্তিসাধন সংযুক্ত আছে। সুতরাং উক্ত সাধনপ্রণালী চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণানুরূপ এবং অতিশয় সহজ ও বিষয়ী লোকের অবসরোপযোগী। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডবেদে প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী দুর্ব্বোধ্য মনে করিবেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা উক্ত প্রণালী অবলম্বী ৩৪ জনকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছি এবং গোস্বামী মহাশয়ের উপদেষ্টা

পরমহংস-প্রবর যে সাধনার্থীসহায় হইয়া থাকেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে কেবল বুঝিতে পারিয়াছি তাহা নহে, কখন কখন প্রত্যক্ষও করিয়াছি।

নানাস্থানে ঠাকুরের মন্ত্রলাভ। বিবিধপ্রকার সাধন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষা। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা।

ব্রহ্মাণ্ডবেদপাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার দীক্ষাদি সম্বন্ধে কাঙ্গাল যেরূপ লিখেছেন তাহা কি ঠিক?

ঠাকুর বলিলেন—অনেকটা ঐরূপই বটে। তবে স্থানে স্থানে গোলমালও আছে।

ইহার পরে সতীশ, শ্রীধর এবং আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথায় কথায় তাঁহার মন্ত্রলাভ ও সাধনাদি বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে ঠাকুর যেরূপ বলিলেন, যথাসাধ্য লিখিয়া রাখিতেছি—

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—ছেলেবেলা মাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমাকে শিষ্যবাড়ী যেতে হ'তো। আমাদের কুলপ্রথা অনুসারে তখন মাঠাকরুণই আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। উপনয়নের পর আমি খুব নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা আহ্নিক করতাম। কিছু কাল পরে টোলে সংস্কৃত প'ড়ে, বেদান্তের আলোচনায় আমার অদ্বৈত মত দাঁড়াল। আমি অমনি উপবীতটি ত্যাগ করলাম। চার দিকে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। মাঠাকরুণ আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হলেন। কি করি? মা'র কথায় আবার উপবীত গ্রহণ করলাম। তখন পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্মসমাজে যাই নাই। তার পর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে মনে লাগল উপবীত জাতিভেদের চিহ্ন, উহা ধারণ করা মহা অপরাধ। অমনি আবার উপবীত ত্যাগ করলাম। মাঠাকরুণকে জানালাম—যদি তিনি এবারও আমাকে উপবীত গ্রহণ করতে জেদ করেন, আমি আত্মহত্যা করব। মাঠাকরুণ আর কিছু বললেন না। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে রীতিমত উপাসনাদি করতে লাগলাম, আর নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করলাম। তখন আমার একটা বিশ্বাস ছিল, যিনি আমার বক্তৃতা শুনবেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করবেন।

একবার ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে যখন আমি ছিলাম, এক দিন গভীর রাত্রিতে ব'সে উপাসনা করছি; একটু নিদ্রাবেশ হ'লো। হঠাৎ দ্বারে ঘা পড়ল। অমনি দোর খুললাম, দেখি 'বিলকুল' মহাপ্রভুর দল; ঘরটি ভ'রে গেল; বিদ্যুতের মত আলো। অদ্বৈতপ্রভু আমাকে বললেন—'আমি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ, অদ্বৈত আচার্য্য। ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, আর ইনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রণাম কর। ইনি তোমাকে মন্ত্র
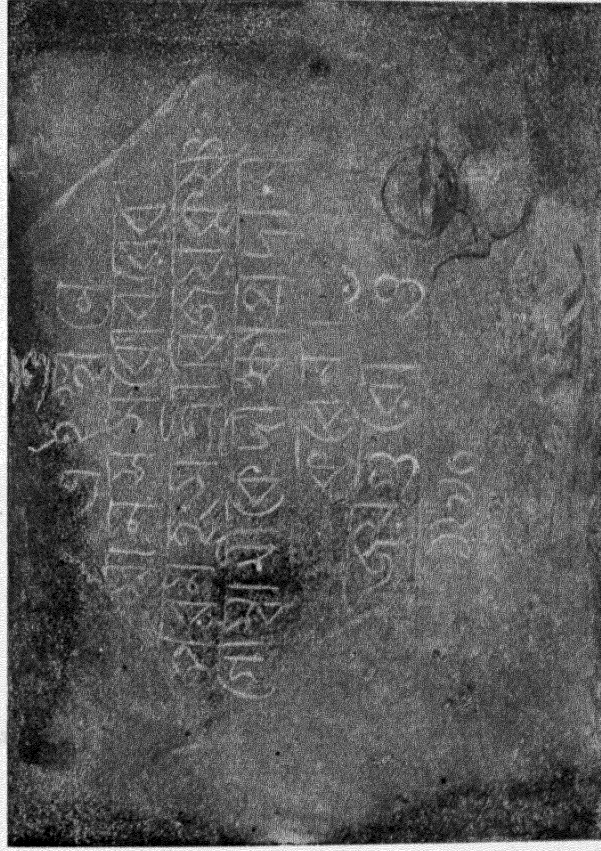
আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাস্থান—গয়াধাম।　　৯২ পৃঃ

দিবেন ; স্নান ক'রে এসো। আমি তিন প্রভুকে নমস্কার ক'রে বস্‌তে আসন দিলাম। পরে পাতকূয়ায় গিয়ে স্নান ক'রে এলাম। মহাপ্রভু আমাকে নাম দিলেন। আমি চৈতন্যশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। সকালবেলা ঘুম হ'তে উঠে সবগুলি ঘটনা পরিষ্কার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লাম—বুঝি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু ঘরে আসন পাতা রয়েছে, আর কূয়ার পাড়ে ভিজা কাপড় আছে দেখে, সে সংশয় দূর হ'লো। তখন মনে কর্‌লাম— আমি কেমন ব্রাহ্ম, তাহাই পরীক্ষা কর্‌তে কতকগুলি 'স্পিরিট' এসেছিল। তখন ত জানি না, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। তাই ঐ নামও ধামাচাপা রইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিমত উপাসনা ক'রে নানাপ্রকার অবস্থা আমার ভিতরে প্রকাশ হ'তে লাগ্‌ল। অপ্রাকৃত দর্শন শ্রবণাদিও সবই হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হ'তো না। হয় আর যায়, এমনি অবস্থা। সত্য বস্তু প্রকাশ হ'লে তাহা আবার যায় কেন, এই সংশয় আমার উপস্থিত হ'লো। তখন সত্য বস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হ'লাম। অনেক ঘুর্‌লাম; কোথায় কি আছে প্রত্যক্ষ কর্‌তে কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরখপন্থী, সুন্দরপন্থী, বাউল, দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ কর্‌লাম। একটি একটি ক'রে তাঁদের প্রণালীমত সাধন ক'রে, কোন্ সম্প্রদায়ে কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হ'লো না। আমি যাহা চাই, তাহা কোথাও পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি বাউলের ভিতরেও প্রবেশ করেছিলেন ? তাঁদের সাধন কিরূপ।

ঠাকুর। সে এক বিষম কাণ্ড। আমি তো বিপদেই পড়েছিলাম। বাউলসম্প্রদায়ে, অনেক স্থলে বড়ই জঘন্ত ব্যাপার। তা আর মুখে আনা যায় না। ভাল ভাল লোকও বাউলদের মধ্যে আছেন। তাঁরা সব চন্দ্রসিদ্ধি করেন। শুক্র চান্, শনি চান্, গরল চান্, উন্মাদ চান্, এই চার চান্ সিদ্ধি হ'লেই মনে করেন সমস্ত হ'লো। শরীরের পূঁয, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র কিছুই তাঁরা ফেলেন না, সবই খান। একদিন একটি বাউলকে আমরক্ত বিষ্ঠা খেতে দেখে, খুব বিরক্তি প্রকাশ কর্‌লাম। আখ্‌ড়ার মহান্ত শুনে আমাকে শাসন ক'রে বল্‌লেন, 'তোমাকে উন্মাদ চান, গরল চান্ সিদ্ধি কর্‌তে বিষ্ঠা মূত্র খেতে হবে।' আমি বল্‌লাম, 'ওটি আমি পার্‌ব না। বিষ্ঠা মূত্র খেয়ে যে ধর্ম্মলাভ হয়, তা আমি চাই না।' মহান্ত খুব রেগে উঠে বল্‌লেন, 'এতকাল তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে থেকে আমাদের সমস্ত জেনে নিলে, আর এখন বল্‌ছ সাধন কর্‌ব না।' তোমাকে ওসব সাধন কর্‌তেই হবে।' আমি বল্‌লাম, 'তা কখনই কর্‌ব না। মহান্ত শুনে গালি দিতে দিতে আমাকে মার্‌তে

এলেন ; শিষ্যেরাও 'মার্ মার্' শব্দ ক'রে এসে পড়্‌ল। আমি তখন খুব ধমক্ দিয়ে বল্‌লাম, 'বটে এতদূর আস্পর্দ্ধা, মার্‌বে ? জান আমি কে ? আমি শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমাকে বল্‌ছ বিষ্ঠা মূত্র খেতে ?' আমার ধমক্ খেয়ে সকলে চম্‌কে গেল। মহান্ত খুব কাতর হ'য়ে এসে নমস্কার ক'রে করজোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভো ! আপনি গোস্বামিসন্তান, অদ্বৈত প্রভুর বংশ, আমি জান্‌তাম না। বড় অপরাধ করেছি দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' আমি তখনই ওখান থেকে চলে এলাম। ঊর্দ্ধরেতা হওয়াই ওদের সাধনের লক্ষ্য। সেরূপ লোকও বাউলদের ভিতরে আছেন।

প্রশ্ন। ব্রহ্মোপসনা ক'রেই যখন ধীরে ধীরে আপনার সমস্ত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছিল, তখন আবার গুরুর প্রয়োজন মনে কর্‌লেন কেন ?

ঠাকুর। প্রকাশ হ'লে কি হবে ? স্থায়ী তো হ'তো না। একদিন মেছোবাজার ষ্ট্রীটে একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই। তাঁকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বলায় তিনি বল্‌লেন, 'অনেক অবস্থাই প্রকাশ হ'তে পারে ; তাতে কি হ'লো ? থাকে না তো। যথাশাস্ত্র গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না কর্‌লে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হবে না—তিনি একদিন হঠাৎ এসে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিলেন ; পরে যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন, 'ঘরখানা তো বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আল্‌গা খুঁটির উপরে, ভিত্তিশূন্য – দাঁড়াবে কি প্রকারে ? গুরু নাই ; এ কখন টিক্‌বে না।' আমি এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি পিঠে চাপড় মেরে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বাচ্চা, ঘাবড়াও মৎ। গুরু তোমার হ্যায়, বখত্‌মে মিলে যায়েগা।' আমি স্থির থাক্‌তে না পেরে, বিন্ধ্যাচলে, তিব্বতে, হিমালয়ে, বহুস্থানে পাহাড় পর্ব্বতে গুরুর অনুসন্ধান কর্‌লাম। কোথাও গুরু পেলাম না। সকল মহাপুরুষই একই কথা বল্‌লেন, 'গুরু তোমার ঠিক আছে ; সময়ে পাবে।' অবশেষে গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে কিছুকাল রইলাম। এক দিন ঐ পাহাড়ের উপরে নিরিবিলি একটি স্থানে একাকী ব'সে আছি ; গুরু লাভ হ'লো না ভেবে, নৈরাশ্যে মনকষ্টে মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়্‌লাম। জ্ঞান হ'লে পরে, দেখি, একটি মহাপুরুষের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আমি অমনি উঠে তাঁর চরণে প'ড়ে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আপনি কে ? কখন এখানে এসেছেন ?' তিনি বল্‌লেন, 'আমি পরমহংস, মানসসরোবরে থাকি। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে, তোমাকে দীক্ষা দিতে এইমাত্র

এখানে এসেছি।' আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'এইমাত্র কি প্রকারে আপনি মানসসরোবর হ'তে এলেন ?' পরমহংস বল্‌লেন, 'যোগীরা তা পারেন। যোগীরা দেহের পঞ্চভূতকে পঞ্চভূতে মিলায়ে দিয়ে, চৈতন্যমাত্র অবলম্বন ক'রে যথা ইচ্ছা যেতে পারেন, পরে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই পঞ্চভূতকে আকর্ষণ ক'রে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। যোগীদের এসব ক্ষমতা আছে। আমার এই যে স্থূল দেহ দেখ্‌ছ ইহাও ঐরূপ।' এই প্রকার অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। দীক্ষা গ্রহণের পরে কি কর্‌লেন ?

ঠাকুর। দীক্ষাগ্রহণমাত্রই আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হ'লো। চৈতন্য হ'লে পর, চারি দিকে চেয়ে দেখি পরমহংস নাই। আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। ভাল ক'রে চোখ্ মেল্‌তে পার্‌লাম না। ঢুলুঢুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম। গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপরে ব'সে পড়্‌লাম। এগার দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময়ে বাবাজী খুব যত্নের সহিত আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন! তিনি আমাকে বড়ই ভাল বাস্‌তেন।

প্রশ্ন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও নাকি আপনাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন ?

ঠাকুর। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। সে বহুকাল পূর্ব্বে। একবার কাশীতে গিয়ে একমাস ছিলাম। কেদারঘাটের নিকটে হোমিওপ্যাথিডাক্তার লোকনাথ বাবুর বাসায় উঠেছিলাম। তিনি খুব আগ্রহ ক'রে আমাকে তাঁর বাসায় থাক্‌তে বল্‌লেন। আমি বল্‌লাম, 'আপনাদের খুব অসুবিধা হবে। আমি সারা দিন রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াব ; প্রয়োজনমত বাসায় আস্‌ব। দিনে রাত্রে কখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার কর্‌তে পার্‌ব না। আর ঘরও আমার একখানা প্রয়োজন হবে ; তাতে অন্য লোক থাক্‌লে চল্‌বে না!' লোকনাথ বাবু, আমার সমস্ত কথায় রাজি হ'য়ে, তাঁর বাসায় থাক্‌তে জেদ কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমাকে একখানা নির্জ্জন ঘর দিলেন। আমি দিনে রাত্রে ইচ্ছামত ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম ; প্রয়োজনমত বাসায় আস্‌তাম। অধিকাংশ সময়ই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটে থাক্‌তাম! প্রথম প্রথম কয়দিন তিনি আমাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। গায়ে কুকুরের বিষ্ঠা, ময়লা, কাদা মেখে থাক্‌তেন, নিকটে গেলে উহা ছড়াতেন। পরে নাছোড়বন্দ দেখে খুব আদর কর্‌তেন, যাওয়ামাত্রই কাছে বস্‌তে বল্‌তেন। বেলা অধিক হ'লে, ক্ষুধা পেয়েছে কি না ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা কর্‌তেন ;

নিকটে যাঁরা থাক্‌তেন তাঁদের কিছু খাবার আন্‌তে বল্‌তেন। একজনকে খাবার আন্‌তে একটু ইঙ্গিত করামাত্র পাঁচ ছয় জন দৌড়াতেন। প্রচুর পরিমাণে খাবার আস্‌তো; আমার মত খাবার রেখে, অবশিষ্ট স্বামিজীকে খেতে বল্‌তাম। তিনিও আমাকে উহা মুখে তুলে দিতে ইঙ্গিত করতেন! আমি মুখে তুলে দিতাম। তিনি বেশ খেতে পারতেন। শরীর খুব সবল ও সুস্থ, ডনগিরের মত ছিল। কখন কখন তিনি কেদারঘাটে গঙ্গায় প'ড়ে ডুব দিতেন, একেবারে মণিকর্ণিকায় গিয়ে ভুস ক'রে ভেসে উঠ্‌তেন। আমি তখন গঙ্গার পাড়ে পাড়ে দৌড়াতাম।

এক দিন দেখি, তিনি একটি কালীমন্দিরে গিয়ে কালীর সম্মুখে দাঁড়ায়ে প্রস্রাব করছেন, আর গণ্ডূষে গণ্ডূষে ঐ প্রস্রাব নিয়ে 'গঙ্গোদকং, গঙ্গোদকং' ব'লে কালীর গায়ে ছিটায়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি করছেন?' বল্‌লেন, 'পূজা'। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই পূজার দক্ষিণা কি?' উত্তর দিলেন 'যমালয়'। রাত্রিতে অনেক সময়েই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটে থাক্‌তাম। তিনি আমাকে নানাপ্রকার অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য দেখাতেন। একদিন বল্‌লাম, 'আপনি আমাকে এত দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমার কিছুই বিশ্বাস হয় না। দয়া ক'রে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন বিশ্বাস হয়। তিনি আমাকে স্নান ক'রে আস্‌তে বল্‌লেন। রাত্রি প্রায় একটা, ভয়ানক শীত, আমি ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌লাম। অমনি তিনি আমার ঘাড়টি ধ'রে, আল্‌গা ক'রে তুলে নিয়ে ঝুপ ক'রে গঙ্গায় চুবায়ে নিলেন। পরে আমার মাথায় হাতখানা রেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বিশ্বাস বন যায়।' সেই দিন থেকে সত্য বিষয়ে আর আমার সংশয় হয় নাই। আশ্চর্য্য! আমাকে তিনি মন্ত্র দিতে চাইলেন। আমি বল্‌লাম, 'আমি আপনার নিকটে মন্ত্র নিব কিরূপে? আপনি সাকার উপাসক, দেখ্‌ছি আপনি ১০০টি বেলপাতা ও গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান, শিবপূজা করেন, আর আমি নিরাকার ব্রহ্মোপাসক। আমি আপনাকে গুরু করব না।' তিনি সাবলম্ব ও নিরবলম্ব উপাসনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বল্‌লেন, 'নল রাজাকে যেমন সর্পে দংশন করেছিল, আমিও সেই প্রকার তোমাকে একটু স্পর্শ ক'রে রাখ্‌ছি। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আমি তোমার গুরু নই; তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট আছেন। তিনিই তোমাকে যথাসময়ে দীক্ষা দিবেন।' এই ব'লে তিনি আমার কাণে তিনটি মন্ত্র দিলেন। একটি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্র পূর্ব্বে মাঠাক্‌রুণও আমাকে দিয়াছিলেন। অপরটি সর্ব্বদা

জপ কর্‌তে, ভগবানের নাম। আর একটি আপৎবিপদে পড়্‌লে জপ কর্‌তে বল্‌লেন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষালাভের পর যখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'লো, প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে, হাতের তেলোতে লিখে, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'ইয়াদ হ্যায় ?'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'ত্রৈলঙ্গ স্বামী না মৌনী ছিলেন ?'

ঠাকুর। হাঁ ; কথা বল্‌তেন না, ইঙ্গিতে সব জানাতেন, কখন কখন লিখেও দিতেন। রাত্রে অনেক সময়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেন। তখন তিনি অজগর-ব্রত নেন নাই। শেষকালে অজগর-ব্রত নিয়ে সমস্তই ছেড়েছিলেন। কোন প্রকার ইঙ্গিতও কর্‌তেন না। এক স্থানেই ব'সে থাক্‌তেন। শরীর স্থূল হ'য়ে পড়্‌ল ; বাত হ'লো। তার উপরে তাঁকে জীবন্ত শিব মনে ক'রে সকলে তাঁর মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। রাত চারটা হ'তে বেলা বারটা পর্য্যন্ত পৌষ-মাঘের শীতেও এই জলঢালার বিরাম ছিল না। দেহের ধর্ম্ম—শেষকালে ঘা হ'য়ে দেহটি পচে পচে গেল। এক ভাবে নির্ব্বিকার অবস্থায় থেকে, দেহটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল-সমাধি দেওয়া হয়।

মহাদেবের শিরোবস্ত্র। এ সাধন বৈদিক।

এবারে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ঠাকুরের মাথার চুল প্রায় ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা দেখিতেছি। এত বড় চুল ঠাকুরের মাথায় আর কখনও দেখি নাই। যমুনাতে স্নান করিয়া মাথার চুল প্রত্যহ একই প্রকারে একখানা গৈরিক ন্যাকড়ার দ্বারা বাঁধিয়া রাখেন। কপালের উপরের সমস্ত চুল উভয় কপাটির ধার হইতে তালু পর্য্যন্ত জড়াইয়া ন্যাকড়াখানি মাথার দুই দিকে লইয়া যান ; পরে উভয় কর্ণের উপরিভাগে সমান পরিমাণে দুই গোছা চুল ঐ ন্যাকড়া দ্বারা বেষ্টন করিয়া পশ্চাৎ দিকের নিম্নভাগের চুলগুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া রাখেন। ব্রহ্মতালুর দুই পার্শ্বের আলগা চুল পশ্চাদ্দিকের অবশিষ্ট চুলের সহিত আপনা আপনি জড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাতে ঠাকুরের মস্তকে সর্ব্বসমেত ৫টি জটার সৃষ্টি হইয়াছে।

গৈরিক ন্যাকড়াখানা অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া বলিলাম—এই গৈরিক ন্যাকড়াখানা ফেলিয়া একখানি নূতন গৈরিক ন্যাকড়া নিলে হয় না ?

ঠাকুর বলিলেন—রাম, রাম ! তা হয় না। এখানা সাধারণ ন্যাকড়া নয়, মহাদেবের মাথার বস্ত্র। আমাকে মাথায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কবে, কোন্ স্থানে বেঁধে দিয়েছিলেন ?

ঠাকুর বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে আস্‌বার সময়ে কাশীতে বিশ্বেশ্বরদর্শনে গিয়েছিলাম, সেখানে মন্দিরে আমাকে এই বস্ত্র মাথায় জড়ায়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাদেবই কি এই সাধনমার্গের প্রবর্ত্তক ?

ঠাকুর বলিলেন—মহাদেব এ সাধনের প্রবর্ত্তক নন ; তিনিও এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হন। বেদে এই সাধনের বিষয় উল্লেখ আছে। অনেক যোগী ঋষি ইহা অবলম্বন ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুকাল নিয়মমত এই সাধন কর্‌তে পার্‌লে ইহার উপকার উপলব্ধি হয়। বীর্য্যধারণের সঙ্গে এই প্রাণায়াম ও কুম্ভক, ছয়টি মাস কর্‌লে অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণায়ামের ফল লাভ করতে পারা যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করতে পার্‌লে আর কিছুরই দরকার হয় না। উহাতে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি সমস্তই হ'য়ে পড়ে। ভিন্ন চেষ্টাও করতে হয় না। এই পথের মত সহজ পথ আর নাই। শুধু শ্বাসে আর প্রশ্বাসে নাম করতে পারলেই সমস্ত অবস্থা লাভ হয়, আর কিছুই করতে হয় না।

আমি বলিলাম—প্রাণায়ামের প্রণালী অনেক রকম আছে শুন্‌তে পাই, আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় কোনও শাস্ত্রে আছে কি ?

ঠাকুর। শাস্ত্রে আটপ্রকার প্রাণায়ামের প্রণালী প্রকাশ ক'রে লিখে গেছেন ; কারণ, প্রথম শিক্ষার্থীদের উহাই প্রয়োজন। আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় অতি সঙ্ক্ষেপে কোনও কোনও তাপনীতে, উপনিষদে উল্লেখমাত্র আছে। ইহা সিদ্ধগুরুর নিকটে শিক্ষা কর্‌বে, শাস্ত্রে এরূপ সঙ্কেত ক'রে গেছেন। চিরকালই ইহা সিদ্ধ মহর্ষিদের ভিতরে অতি গোপনে চ'লে আস্‌ছে। শাস্ত্র দেখে ইহা অভ্যাস কর্‌তে গেলে হঠাৎ মৃত্যুও হ'তে পারে। এই প্রাণায়াম দেখাদেখি চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে অনেকে দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই জন্য এবং আরও অনেক কারণে, চিরকালই ইহা অতিগোপনে আছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্র দেখেই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই প্রাণায়াম দিয়ে থাকেন। অন্যান্য কুম্ভক প্রাণায়ামাদিতে যে সকল ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়াম ঠিক নিয়মমত অল্পকাল অভ্যাস করলেই, সেই সব ফল লাভ হ'য়ে থাকে।

আমি। আমাদের এই সাধনা তান্ত্রিক না বৈদিক ? কোন্ কোন্ ঋষি এই সাধন প্রথমে অবলম্বন করেছিলেন ?

ঠাকুর। এ সাধন আধুনিক নয়, ইহা বহু প্রাচীন বৈদিক সাধন। প্রথমে মহাদেব, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীশ্বরেরা এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

আমি। সাধনের সময়ে যে নানাপ্রকার জ্যোতিঃ, আকৃতি বা ছায়া দর্শন হয়, ওসব কি ? ঐ সময়ে কি কর্‌তে হয় ?

ঠাকুর। যা কিছু দর্শন হয় তারই খুব আদর করতে হয়, অনাদর করতে নাই। দর্শন হ'লে ওসকলের খুব ভক্তি ক'রে সম্মান ও পূজা করতে হয়।

আমি। সাধন করতে করতে যে সকল অবস্থা লাভ হয়, কোনও প্রকার অপরাধে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হ'লে, আবার সাধন ক'রে সে সব কি লাভ করা যায়?

ঠাকুর। হাঁ, খুব, খুব; ঠিক রীতিমত সাধন করলে পুনরায় তা লাভ হয়।

আমি। আমার কি বিশেষ কল্যাণ করতে, আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে আনলেন?

ঠাকুর। বিশেষ কল্যাণ কি হ'লো তা কি আর সহজে বুঝা যায়? পরে সব বুঝবে।

মাঠাকুরাণীর পতিপূজা। বরাহের দন্ত।

শুনিলাম গত বৎসর ঠাকুর চার পাঁচ মাস কলিকাতায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। পরে কোন কারণে মাঠাকুরাণীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় ৺কাশীধামে পঁহুছিয়া প্রায় মাসাধিক কাল রহিলেন। এই সময়ে আমার অনুপস্থিতকালে কলিকাতা, শান্তিপুর ও কাশীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কয়েকটি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতার ডায়েরীতে এবং শ্রীধর, মাঠাকৃরুণ ও সতীশ প্রভৃতির মুখে নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হইয়া লিখিয়া রাখিতেছি—

১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে, কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের ৫০।১ নং বাড়ী, ঠাকুরের থাকিবার উদ্দেশ্যে চার মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হয়। তথায় তিনি শিষ্যগণ সহিতে সপরিবারে অবস্থিতি করেন। এই বাসায় মাঠাকৃরুণ প্রত্যহ নির্জ্জনে ঠাকুরের চরণ পূজা করিতেন। দূর্ব্বা, চন্দন, ফুল, তুলসী প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুরের আসনঘরে প্রবেশ করিতেন। ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক একান্ত প্রাণে তাঁহার চরণে তুলসী চন্দনাদি অর্পণ করিতেন। পরে ঠাকুরের মস্তকে ফুল, তুলসী প্রদানান্তর তাঁহার ললাটদেশে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিতেন। তৎপরে ঠাকুরের মুখে কিঞ্চিৎ মিষ্টি তুলিয়া দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। ঠাকুরও সেই সময়ে মাঠাকুরাণীর কপালে চন্দনের টিপ দিয়া, তাঁহার মস্তকোপরি করতল স্থাপন পূর্ব্বক, কিয়ৎকাল নিস্পন্দভাবে ধ্যানস্থ থাকিতেন। এই পূজা না করিয়া মাঠাকৃরুণ কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। পূজা আরম্ভের প্রথম দিবসে দিদিমা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, মাঠাকৃরুণ, ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পড়িয়া আছেন। আর ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মাঠাকুরাণীর মস্তকোপরি চরণ দুটি ছড়াইয়া দিয়া, স্থিরভাবে রহিয়াছেন, উভয়েরই বাহ্য চৈতন্য শূন্যাবস্থা।

এই বাসায়ই তিনি তাঁহার জন্মদিন ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ পূর্ব্বক মুক্তকচ্ছ হইলেন। স্বহস্তে চিঠি-পত্র লেখা এই সময় হইতেই বন্ধ

হইল। এই বাসায় নানা স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার ও উচ্চশিক্ষিত দেশমান্য ব্যক্তিগণ অলৌকিক প্রকারে ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন।

এই বাসায় অবস্থানকালে এক দিবস ভাবোন্মত্ত শ্রীধর অনুদয়ে স্নানান্তে বরাহরূপী ভগবানের দর্শন পাইয়া গঙ্গার ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উদয়াস্ত অনাহারে থাকিয়া কাশীপুর, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীর পাড়ে একটি পশুর অস্থি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। অমনি শ্রীধর উহা তুলিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকটে আসিলেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর অস্থিটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই নেও তোমার দন্ত। ঠাকুর উহা হাতে লইয়া ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

দেহে অনাহত ধ্বনি

এই বাসায় মাঠাকুরুণ ঠাকুরের নিকটে বসিয়া প্রায় সারারাত্রি তাঁহাকে বাতাস করিতেন। কখন কখন তিনি পদসেবা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া থাকিতেন। এক দিন মাঠাকুরুণ কথায় কথায় বৃন্দাবন বাবুকে বলিলেন যে, রাত্রিতে সময়ে সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শরীর হইতে একপ্রকার মধুর ধ্বনি বাহির হয়। উহা এতই সুমিষ্ট যে, শুনিতে শুনিতে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই কথা শুনিয়া ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিতে বৃন্দাবন বাবুর অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি অবসর বুঝিয়া গভীর রাত্রে ঠাকুরের আসন-ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তর কাণ পাতিয়া রহিলেন। একটু পরেই ঠাকুর মাথা তুলিয়া বলিলেন—কি বৃন্দাবন? বৃন্দাবন বাবু কহিলেন—মশায়! শুনেছিলাম আপনার শরীর হ'তে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, উহাই শুন্‌তে এসেছি। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—বেশ, শুন্‌লে তো? বৃন্দাবন বাবু বলিলেন—হাঁ, এই ধ্বনি শুনে আশ্চর্য্য হলেম্‌। এরূপ সুমধুর মনোহর ধ্বনি বোধ হয় জগতে আর নাই। এ কিসের ধ্বনি?

ঠাকুর বলিলেন—ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। সাধকদের শরীর হ'তে এই শব্দ উত্থিত হয়। ইহা এতই মধুর যে, সাপে শুন্‌তে পেলে, একবারে সাধকের শরীরে উঠে পড়ে।

এই সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন—"তিনি কলিকাতায় আস্‌তে পারেন, তবে আমার এখানে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।" গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ ভদ্রলোকটির বিবিধ সদ্‌গুণের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে তাঁহার দীক্ষার আকাজ্ক্ষা জানাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে কহিলেন—যাঁদের সাধন হবার তাঁদের ঠিকই

হবে। এরূপ কেহ যদি আমার নিকটে নাও আসেন, আমি তাঁর নিকটে যেয়ে দীক্ষা দিব। তিনি যদি আমাকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেন, মার খেয়েও তাঁকে দীক্ষা দিয়ে আস্‌ব।

সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর এক দিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, কুঞ্জবিহারী গুহ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণকে সঙ্গে লইয়া, আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের দর্শনে গিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে খুব আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং শিষ্যগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমার ছেলেবেলা হ'তে গরীব লোকেরা কি ভাবে থাকে, উৎসবাদিতে কি করে, এ সব জান্‌তে বড় ইচ্ছা হ'তো। তজ্জন্য অনেক সময় গোপনে ভিন্ন ভিন্ন বেশে তাদের বাড়ী যেতাম। তাদের অলক্ষিতে সমস্ত দেখে আস্‌তাম। এখন ভগবান দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নানা-স্থান ঘুরান। এইমাত্র তোমাদের আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে নানাস্থান ঘুরে এলাম। তাঁর অপার দয়া।

ঠাকুর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—মানুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায়? মহর্ষি বলিলেন—'কেন, যে সকল গ্রহ নক্ষত্র দেখ্‌ছ তাহাতে যায়।' পরলোক সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা কথার পর মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর সন্ধ্যার পর বাসায় আসিলেন।

জাতিভেদসম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়, বরিশালে যাইয়া তথাকার গুরুভ্রাতাদিগের নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, 'জাতিভেদ বুদ্ধি থাকিতে আমাদের কাহারও এই সাধনে কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না', ঠাকুর এই প্রকার বলিয়াছেন; এই কথা লইয়া বরিশালের গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়, এই বিষয় পরিষ্কার জানিবার অভিপ্রায়ে কুঞ্জ বাবুকে পত্র লিখিলেন; তিনি ঠাকুরকে ঐ পত্র শুনাইবামাত্র ঠাকুর তৎক্ষণাৎ কুঞ্জ বাবুর দ্বারায় নিম্নলিখিত চিঠি শিব বাবুর নিকটে পাঠাইলেন—

চিঠির নকল—

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯;
৫০।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র গুহ
শ্রীচরণ কমলেষু,

জাতিভেদ সম্বন্ধে বরিশালে সম্প্রতি যে গোলযোগ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্তেশ্বর গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আমাকে যাহা বলিতেছেন তাহা লিখিতেছি:—"সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ; এই তিনটিই প্রকৃত জাতি। এই তিন গুণ ত্যাগ

না করিলে জাতি পরিত্যাগ করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে, জাতি পরিত্যাগ হয় না। যাহার তাহার অন্ন ভোজন করিলেই জাতিভেদ যায় না। এইরূপ আচরণ জাতিভেদ ত্যাগের উপায় নয়। অভিমান পরিত্যাগ কর, সমদর্শী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যিনি যে সম্প্রদায়ে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি অনুসারে চলিবেন। অবস্থা না হইলে, দেখাদেখি কোন কার্য্য করিবেন না। সাধনোদ্দেশে জীবন গঠনে, যেরূপ জীবন হইবে বাহিরে তাহাই প্রকাশ পাইবে। ভিতরে ও বাহিরে এক হওয়াই প্রকৃত জীবন। অতএব বিপক্ষে না চলিয়া সাধনের পক্ষে অগ্রসর হও। ইতি—

সেবকাধম

শ্রীকুঞ্জবিহারী গুহ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ লিখিয়াছেন—'সুকিয়া ষ্ট্রীটে, ঠাকুরের বাসা-বাড়ীতে এক দিন মধ্যাহ্নে ওখানকার সমস্ত গুরুভাই ও বিলাত হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় প্রভৃতির খাওয়ার নিমন্ত্রণ হয়। আমরা সকলে একসঙ্গে নীচের ঘরের বারান্দায় আহার করিতে বসি। ইতিমধ্যে জাতিভেদের কথা উঠিল; ঠাকুর বলিলেন—গুরুগৃহে এক পংক্তিতে আহারে দোষ নাই। আমি যদি তোমাদের দেশে যাই, তখন এরূপ করবে না। সকলকে সামাজিক নিয়মানুসারে চল্‌তে হবে।'

ঠাকুরের ষ্টার-থিয়েটার দর্শন।

একদিন 'ষ্টার-থিয়েটারের' শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'চৈতন্যলীলা' দেখিবার জন্য সশিষ্য ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর যথাসময়ে সকলকে সঙ্গে লইয়া নাট্যশালায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় খুব সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে বসাইলেন। ঠাকুর অভিনয় দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী।
মাধব-মন মোহন, মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন;
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,

দামোদর কংস-দর্পহারী,
শ্যাম রাস-রস-বিহারী
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

এই গানটি আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলিতে বলিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন ভাবে বিভোর গুরুভ্রাতাগণও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিয়া ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'গোলমাল হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে; থেমে যাও, থেমে যাও' ইত্যাদি শব্দও স্থানে স্থানে উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে অমৃতলাল বসু মহাশয় উপস্থিত হইয়া, আজ আমার থিয়েটার করা সার্থক হইল, আজ আমি ধন্য হইলাম—এইরূপ নানাপ্রকার বাক্য পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরে করতালি সংযোগে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া অভিনেত্রীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি আবার গান আরম্ভ হইল।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জু কুঞ্জচারী॥
জয়রাধে, শ্রীরাধে।
ব্রজবালকসঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।
দৈত্যছলন, নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী,
ব্রজবিহারী গোপনারী মান-ভিখারী।
জয়রাধে, শ্রীরাধে॥

এই সময়ে ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ নৃত্য-গীতে দর্শক-মণ্ডলীর চিত্তও অভিভূত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে নাট্য-মন্দিরে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। স্বামিজী হরিমোহন, ভাবাবেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীধর ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কম্পিত কলেবরে বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া উচ্চ হরিবোল বলিতে বলিতে বিবিধ প্রকার নৃত্য সহকারে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। ঠাকুরের বাহুসঞ্চালনপূর্ব্বক মধুর হরিধ্বনির তড়িৎঝঙ্কারে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। নাট্যাভিনয় স্থগিত রাখিয়া এই প্রকার বহুক্ষণ কীর্ত্তনোৎসব হইল। তৎপরে সকলে প্রহৃষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

বেশ্যাদ্বারা সমাজের পরিণাম।

কলিকাতার কোন একটি প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, বেশ্যা ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র মেয়ে ছিল, সে বেথুন স্কুলে পড়িত। ব্রাহ্ম-সমাজের কোন এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন—

বেশ্যার মেয়ে সমাজে নেওয়া কখনই উচিত নয়। ইহাতে সমাজ কলুষিত হয়। যদিও প্রথমে খুব ভাল এবং সচ্চরিত্রা দেখা যায়, কিন্তু সময়ে ভিতরের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

ঠাকুর এই বিষয় বুঝাইতে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' হইতে বেশ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

রোগ আপনিই সারে। অবিশ্বাসীর উপায় কি ?

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উৎকট রোগে দীর্ঘকাল ভুগিয়া মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িলেন। অনেকেই তাঁহার জীবনে নিরাশ হইল। এক দিবস রাত্রিতে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। শ্রীশ তখন কাতর ভাবে সঙ্গীদের বলিলেন—'আমার এখনই মৃত্যু হইবে। এই সময়ে একবার দয়া করিয়া তোমরা ঠাকুরকে আনিয়া দেখাও।' শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ অমনি রাত্রি দু'টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে দৌড়িলেন। ঠাকুর, শ্রীশের কথা ও অবস্থা শুনিয়া বলিলেন—'তাঁকে বল গিয়ে কোন ভয় নাই। অসুখ সেরে যাবে। অস্থির না হন।'

কয়েক দিন পরে শ্রীশের অসুখ সারিয়া গেল। তখন ঠাকুর এক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময়ে শ্রীশকে দেখিতে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কুঞ্জ বাবুকে জ্বরে আক্রান্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার চিকিৎসা এখন কে করেন ? কুঞ্জ বাবু একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকের নাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন—ডাক্তারের সাধ্য নাই যে, তোমার রোগ সারান। যখন সারবে, আপনি সেরে যাবে। দেখ্‌লে ত, শ্রীশের রোগ কেহ সারাতে পার্‌লেন ?

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—আপনি ত বলেছেন যে, ঔষধ সেবনেও অনেক কর্ম্মভোগ কেটে যায়।

ঠাকুর কহিলেন—হাঁ, তা ঠিক।

শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—আমার অবিশ্বাস ত কিছুতেই যায় না—কি করিব ?

ঠাকুর। যাঁহারা সাধন লাভ করেছেন, তাঁদের ভিতরে সকলেই কিছু না কিছু বিশ্বাসের জিনিস পেয়েছেন। অবিশ্বাসের সময়ে তাহা স্মরণ কর্‌লে ও ধ'রে থাক্‌লে বিশেষ উপকার হয়।

আবার বলিলেন—অবিশ্বাস কি প্রলোভনের সময়ে যদি ৫।৬টি নামও কর্‌তে পারা যায়, তা হ'লেও রক্ষা। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব তাও কেহ কর্‌তে পারে না।

পীড়িত কুঞ্জ বাবু বলিলেন—আমি যে নাম কর্‌তেই পারি না।

ঠাকুর কহিলেন—নাম করার ইচ্ছা হ'লেও হয়।

কথায় কথায় ঠাকুর আবার বলিলেন—আমাদের যে যোগ, তাহা নামের যোগ। গম্ভীরনাথ

বাবার নিকটে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপের কথা শুনি। বিশ বৎসর পরে ঐ কথার অর্থ বুঝি। মাঝিমাল্লা ও সাধারণ লোকের মুখেও ত কতবার শুনেছি—

মন পাগ্‌লা রে হরদমে গুরুজীর নাম লইও।

দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এক দিবসে হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ নাম নিতেন কিরূপে?

ঠাকুর বলিলেন—এক লক্ষ উচ্চৈঃস্বরে, এক লক্ষ মনে মনে, আর এক লক্ষ তাঁর আত্মাতে আপনা আপনি হ'তো।

কুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন, এই বাসায় থাকাকালীন অর্থের অতিশয় অনটন ছিল। বিছানার অভাবে মাঠাকুরুণ একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপরে বাহু উপাধানে শয়ন করিতেন। ঠাকুরের ব্যবহারে অতি অল্প মূল্যের একখানা দেশী কম্বল মাত্র ছিল। তিনি শয়নকালে গ্রন্থের উপরে একখানা বহির্ব্বাস বিছাইয়া তাহাতেই মাথা রাখিতেন। কুঞ্জ বাবু এক দিন একটি বালিশ প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য আনিয়া দিলেন। তাহাতে বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের সাক্ষাতেই কুঞ্জ বাবুকে উপহাস করিয়া বলিলেন,—"উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, তুমি ওঁর জন্য বালিশ এনেছ? বেশ, একখানা তোষক, একটি ছাতা আন্‌লে না কেন?" কুঞ্জ বাবু দুঃখিত মনে নীরব থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই কথার পর ঠাকুর বোধ হয়, এই বালিশ আর ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু কুঞ্জ বাবুর একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া দয়াল ঠাকুর প্রতিদিনই শয়নের সময়ে উহা গ্রহণ করিতেন।

যে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা চা'র মাসের জন্য। নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, ঠাকুর সকলকে অল্প ভাড়ায় একখানা বাসা দেখিতে বলিলেন। অনুসন্ধানের পর গুরুভ্রাতারা আসিয়া জানাইলেন যে, অল্প ভাড়ায় বাড়ী জুটিতেছে না, তখন ঠাকুর কহিলেন—'একখানা খোলার ঘর হ'লেও হয়।' মণি বাবু বাড়ী ভাড়া করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

পরদিন সকালে প্রায় ৮টার সময়ে ঠাকুর শ্রীধরকে মাত্র সঙ্গে লইয়া হঠাৎ বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বেলা ১০টার সময়ে বাসায় খবর আসিল—তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া, অকস্মাৎ এই ভাবে ঠাকুরের যাওয়ার হেতু এক এক জনে এক এক প্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন। পরদিন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে, বাজার দেনা ৮০৲ (আশি) টাকা পরিশোধ হইল। মাঠাকুরুণ অমনি দিদিমা ও কুতুকে লইয়া যোগজীবন এবং কুঞ্জ বাবুর সহিত শান্তিপুর রওয়ানা হইলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুরমাতা উৎকট উন্মাদরোগে বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। ঠাকুরকে দেখিলে তিনি সময়ে সময়ে অনেকটা ঠাণ্ডা থাকেন।

ঠাকুরমার ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা কিঞ্চিৎ উপশম হইলেও সময়ে সময়ে তিনি শয়ন-ঘরে, মল-মূত্র ত্যাগ

করিয়া উহা দেওয়ালে ও সমস্ত মেজেতে ছড়াইতেন। সকাল বেলা মাঠাকৃরুণ উহা পরিষ্কার করিতেন। দিদিমার ইহা বড়ই অসহ্য হইত। তিনি ইহা লইয়া অনেক সময়ে ঠাকুরমার সহিত ঝগড়া করিতেন। এক দিন প্রত্যুষে এই সকল অনাচার অত্যাচার লইয়া উভয়ের মধ্যে বিষম গোলমাল বাধিল। তখন ঠাকুর নিজের থাকার ঘরে দোতালার উপরে ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুরমার সেবা-শুশ্রূষা, মলমূত্র পরিষ্কারাদি ঠাকুর নিজেই সমস্ত করিবেন বলিতে লাগিলেন। অনর্থক এই দুর্ভোগ কেন মাথায় টানিয়া নেওয়া বলিয়া মাঠাকৃরুণ, ঠাকুরের কথায় আপত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দিদিমাও তাহাতে যোগ দিয়া ভয়ানক গোলমাল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া মাঠাকৃরুণকে বলিলেন—'আমি এখনই কাশী চল্‌লেম, ভাড়ার আটটি টাকা দেও।'

অকস্মাৎ ঠাকুরের কাশী যাওয়ার উদ্যোগ দেখিয়া মাঠাকৃরুণ চমকিয়া গেলেন, এবং ঠাকুরের সঙ্কল্পে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে টাকা দিতে ওজর করিয়া বলিলেন,—'তা হ'লে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লও।' ঠাকুর তখন ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্ত্তি হইলেন এবং মাঠাকৃরুণকে ধমক দিয়া দণ্ডদ্বারা 'পোর্টমেণ্টের' উপরে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঠাকৃরুণ অমনি বাক্সের চাবিকাঠি ঠাকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—'বাক্সটি ভেঙ্গো না—এই চাবি নাও।' ঠাকুর বাক্স খুলিয়া আটটি টাকা গুণিয়া লইলেন। পরে মাঠাকুরাণীর নিকটে চাবিকাঠি ফেলিয়া দিয়া অমনি একাকী রাণাঘাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। ওখানে যাইতে নদী পার হওয়ার সময়ে ঠাকুর পাটনির হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন—"এখানে একটু পরেই একটি বাবাজী আমার অনুসন্ধানে আস্‌বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী যাচ্ছি—তিনি যেন কাশী গিয়ে আমার সঙ্গে মিলেন।"

ঠাকুর যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, শ্রীধর তখন কোন প্রয়োজনে বাহিরে ছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া শ্রীধর যেমনি শুনিলেন, ঠাকুর কাশী চলিয়া গিয়াছেন, অমনি তিনি সেই অবস্থাতেই উন্মত্তের মত ছুটিয়া রাণাঘাটের দিকে চলিলেন। নদীর পাড়ে পঁহুছিয়া, খেওয়া ঘাটে যাওয়া মাত্রই পাটনি শ্রীধরকে দেখিয়া বলিল—'কিছুক্ষণ হয় একটি সাধু এখান হ'য়ে ষ্টেশনে গেলেন। তিনি কাশী যাবেন। আমার হাতে একটি টাকা দিয়ে বল্লেন যে, একটু পরে একটি বাবাজী এখানে আমার তালাসে আস্‌বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী যাচ্ছি; তিনিও যেন কাশী গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীধর মাঝিকে বলিলেন—'হাঁ, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁরই তালাসে এসেছি।' মাঝি অমনি টাকাটি শ্রীধরের হাতে দিল। শ্রীধর তখন নদী পার হইয়া তাড়াতাড়ি রাণাঘাট ষ্টেশনে পঁহুছিলেন, দেখিলেন—যাত্রীপূর্ণ একখানা ট্রেন্ ষ্টেশনে রহিয়াছে। এদিক সেদিক তাকাইতে তাকাইতে ঠাকুরকে গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুরও শ্রীধরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন—'শ্রীধর!

আমি কাশী যাচ্ছি। তুমি কলিকাতা গিয়ে কুঞ্জদের বাসায় উঠো। সেখানে টাকা জোগাড় ক'রে নিয়ে কাশী যেও, আমার সঙ্গে দেখা হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না।'

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। শ্রীধরও কলিকাতা যাইয়া কুঞ্জ বাবুদের বাসায় উঠিলেন। সেখানে রেল ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া পরদিনই কাশী রওয়ানা হইলেন। কয়েক দিন পরে মাঠাকুরুণ, দিদিমা এবং যোগজীবন প্রভৃতিকে লইয়া, কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাসায় আসিলেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া, কুঞ্জ বাবু এবং শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কাশী যাওয়ার সুব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে এক দিন বিধু বাবু, বেঙ্গল ফটোগ্রাফারকে আনাইয়া মাঠাকুরাণীর ফটো তুলিয়া লইলেন। এই ফটো গুরুভ্রাতারা অনেকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাঠাকুরুণ অবিলম্বেই যোগজীবন ও দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের কাশীধামে অবস্থিতি।

ঠাকুর ৺কাশীধামে পঁহুছিয়া প্রথমে কাকিনিয়া মহারাজার ছত্রে উঠিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া অগস্ত্যকুণ্ডের সন্নিকটে মাণিকতলার মাতাজীর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গেলেন। মাঠাকুরুণও সেই সময়ে যোগজীবনকে লইয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতার সঙ্গে ঐ বাসায়ই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে ১০।১২টি লোক হইল। আহারত্যাগী মাতাজী, গণ্ডুষমাত্র জল গ্রহণ না করিয়া, স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রফুল্ল মনে প্রত্যহ সকলের পরিবেশনাদি যাবতীয় সেবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল ঠাকুর কাশীতে রহিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অদ্ভুত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে বহু বাধা বিঘ্ন দেখিয়া, আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। কয়েকটি সাধারণ ঘটনার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

ঠাকুরকে সন্ন্যাসিবেশে দেখিয়া সহরের ইংরাজি-শিক্ষিত উকীল, অধ্যাপকাদি বাঙ্গালী বাবুরা নানা প্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও খ্যাতনামা শ্রীনাথ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুর যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইলে, সকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসিমণ্ডলীর পুরোভাগে বসাইলেন। বহু গণ্য-মান্য লোকের সমাগমে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। অধিবেশনের কার্য্য সমাপনান্তে সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। ঠাকুর অসুস্থ থাকা বশতঃ বাসায় আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ত্তাদের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া তিনি সঙ্কীর্ত্তনে থাকিতে সম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর কতক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে উচ্চ হরিবোল হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সঙ্কীর্ত্তনে মহাভাবের বন্যা আসিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ সকলেই তাহাতে হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন। অচিরেই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও সভাস্থ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিলেন। বিরুদ্ধভাবাপন্ন বাঙ্গালী বাবুরাও তখন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন।

ঠাকুর এক দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বহু লোকের ভিড়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মণ্ডপের এক ধারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময়ে আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুর দূরে থাকিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। পরে উচ্চৈঃস্বরে বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা বলিয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আরতি দর্শন না করিয়া সকলে উল্লসিত ভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। পাণ্ডারা তখন আগ্রহের সহিত অবাধ গতিতে নৃত্য করিবার সুবিধা করিয়া দিল। ঠাকুর বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা রবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধর, স্বামিজী প্রভৃতিও মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক ঠাকুরের উভয় পাশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেবকগণ পরমোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে স্তবপাঠ করিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর, দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্শ করিবার জন্য লোকের ভিড় পড়িয়া গেল। অধিক রাত্রিতে ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

আর এক দিন ঠাকুর বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন; ফুপিয়া ফুপিয়া বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন। তখন আশ্চর্য্য প্রকারে ঠাকুরের নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুরাশি নির্গত হইয়া সবেগে ছুটিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পাণ্ডা, পূজারি ও দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেও, তাঁহারা আনন্দ উৎসাহের আবেগে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অধিক আরতি করিলেন।

ইহার পর প্রত্যহই দলে দলে লোক আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিল। কোন্ দিন কখন ঠাকুর বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইবেন, বাঙ্গালীটোলাবাসীরা নিত্য আসিয়া খবর লইয়া যাইত।

ভাস্করানন্দ স্বামী এবং পাল মহাশয়।

ঠাকুর এক দিন ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে শিষ্যগণ সহিত দুর্গাবাড়ী গেলেন। একটি লোক ঠাকুরকে স্বামিজীর নিকটে যাইতে বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওদিকে যাবেন না। এ সময়ে

স্বামিজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তিনি ধ্যানস্থ আছেন।' ঠাকুর তাহাকে কিছু না বলিয়া একটি বৃক্ষতলে চোক বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। দু' এক মিনিটের মধ্যেই স্বামিজী সহাস্য মুখে আনন্দ হায়, আনন্দ হায়, বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার উদ্যোগ করা মাত্রই স্বামিজী ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। বহুক্ষণ নীরবে একই ভাবে কাটিয়া গেল। তৎপরে দু' একটি কথা বলিয়া ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

ঠাকুরের মুখে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পাল মহাশয়ের কথা অনেক বার শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ইনি একজন প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গালের মত কাশীর একপ্রান্তে দুর্গাবাড়ীর দিকে নির্জ্জন একটি বাগানে বাস করিতেছেন। লোকসমাগমে পাছে ভজনের বিঘ্ন ঘটে, এজন্য তিনি কুটিরের দ্বার বাহির দিকে তালাবদ্ধ করিয়া রাখেন; পরে ক্ষুদ্র একটি জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। তৎপরে সেটিও বন্ধ করিয়া নির্জ্জন ঘরে সারাদিন একাসনে ধ্যানমগ্ন থাকেন। ঠাকুর তাঁহার দর্শন মানসে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কুটিরের দ্বার বন্ধ দেখিয়া দেওয়ালে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আসিলেন। পরদিন ক্ষীণশরীর বৃদ্ধ পাল মহাশয়, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগস্ত্যকুণ্ডে আসিলেন। ঠাকুর যতদিন কাশীতে ছিলেন, পাল মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার আগমনে ঠাকুরের বাসায় শিক্ষিত লোকের অত্যধিক সমাগম হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনায় ও সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইলেন। শাস্ত্র অভ্রান্ত ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী ইত্যাদি আরও কয়েকটি সন্ন্যাসী এবং পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কাশীর প্রয়োজন শেষ হইলে, ঠাকুর ফয়জাবাদ রওয়ানা হইলেন।

পরমহংসজীর আহ্বান।

অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মাঠাকুরাণীর সহিত ঝগড়া হওয়াতেই কি আপনি শান্তিপুর ছেড়ে এলেন?'

ঠাকুর। আমি নিজ ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। পরমহংসজীর আহ্বানেই এসেছি। ঝগড়ার সময়ে তিনি বল্‌লেন, 'এখনই তুমি কাশী চলে যাও। কাশীতে আমার দেখা না পেলে অযোধ্যায় যেও। সেখানেও সাক্ষাৎ না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হবে।' ঝগড়ার সময়ে যেমন পরমহংসজীর আদেশ হ'লো, আমিও অমনি বের হ'য়ে পড়্‌লাম।

এক দিন ঠাকুর পায়খানায় গিয়াছেন; একটি সমারোহের সঙ্কীর্ত্তন কুঞ্জের সমীপবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিল। ঠাকুর উহা শুনা মাত্র পায়খানা হইতে হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির

হইয়া পড়িলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহুক্ষণ আনন্দ করিয়া কুঞ্জে আসিলেন। তখন হঠাৎ ঠাকুরের স্মরণ হইল জলশৌচ করেন নাই।

আর একদিন আহার করিতে করিতে খোল করতালের আওয়াজ পাইয়া, অমনি এঁঠো মুখে ছুটিয়া বাহির হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে আনন্দ করিয়া অপরাহ্নে বাসায় আসিলেন। তখন মুখপ্রক্ষালনাদি করিলেন।

গুরুর ইঙ্গিত আহ্বান ব্যতীত, এই প্রকার বিচারশূন্য অদ্ভুত আবেগ আর কিসে ঠাকুরের হইতে পারে, জানি না।

গুরুভ্রাতার সংস্পর্শে বিলুপ্ত গুরুশক্তির স্ফূর্ত্তি।

কেহ যদি কোনও সিদ্ধ মহাত্মা বা মহাপুরুষের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইষ্টমন্ত্র বিস্মৃত হন, গুরুকেও একেবারে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার কোন গুরুভ্রাতার সহিত একটুকু মাত্র কোন প্রকারে সংস্রব ঘটিলেও, গুরুশক্তির একটা ক্রিয়া তাঁহার ভিতরে হইতে থাকে ; ঠাকুরের মুখে একটি গল্প শুনিয়া এই বিষয়টি বুঝিলাম। গল্পটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

গয়াতে একটি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক ছেলেবেলা কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরে টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তির সম্পর্কে, তিনি সাধন ভজন, ইষ্টনাম, এমন কি, গুরুকেও ভুলে গেলেন ; ক্রমে ঘোর বিষয়ী হ'য়ে পড়্‌লেন। এক দিন একটি উদাসী সাধু, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন, 'হাম্ ভুখা হ্যায়, হাম্‌কো কুছ্ ভোজন দিজিয়ে।'। বাড়ীর চাকর একমুটো চাউল এনে সাধুকে বল্‌লে, 'এই লেও, চলা যাও।' সাধু বল্‌লেন, 'দানা মেই নাহি মাঙ্গ্‌তা, হাম্‌কো থোড়া ভোজন দেও।' বাবু, সাধুর কথা শুনিয়া ধমক দিয়া চাকরকে বল্‌লেন, 'ও কি গোলমাল হ'চ্ছে ? ভাল উৎপাত। ওটাকে ধাক্কা মেরে তাড়ায়ে দেনা। চাকর অমনি সাধুটিকে ধাক্কার উপর ধাক্কা মার্‌তে লাগ্‌ল। সাধু তখন ব'সে পড়্‌লেন এবং বল্‌তে লাগ্‌লেন 'হাম বড়া ভুখা হ্যায়, জেরা ভোজন দিজিয়ে।' সাধুব জেদ দেখিয়া, বাবু একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হ'লেন ; 'ঠারো বদমাইস, ভোজন দেতা হ্যায়' বলিয়া, সাধুকে গিয়া ধর্‌লেন, পরে কিল চাপড় ও লাথি মার্‌তে মার্‌তে তাঁহাকে ধরাশায়ী ক'রে ফেল্‌লেন। সাধু, 'আহা রে গুরুজী' বলিয়া, চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। এই সময়ে বাবুর কি হ'ল ভগবান্ জানেন, তিনি লাথি মার্‌তে মার্‌তে অকস্মাৎ থম্‌কে দাঁড়ালেন, থর থর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে প'ড়ে গিয়ে সাধুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন এবং পুনঃপুনঃ সাধুর চরণে প'ড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আরে তু কোন্ হোঁ, আরে তু কোন্ হোঁ ?' সাধু তাঁহার গায়ে হাত

বুলাতে বুলাতে কহিলেন 'আরে, হাম তেরা গুরুভাই হোঁ, হাম তেরা গুরুভাই।' এই বলিয়া সাধু ছুটিয়া অমনি এক দিকে চলে গেলেন। বাবুটি বহু অনুসন্ধান ক'রেও আর তাঁকে পেলেন না। এই ঘটনার পর হ'তে বাবুটির স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি সাধন ভজন ধর্‌লেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সদাচারী, নিষ্ঠাবান্, ভজনানন্দী হ'য়ে উঠ্‌লেন।

নন্দোৎসব। দর্শনসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

আজ জন্মাষ্টমী। সমস্ত বৃন্দাবন আজ মহা আনন্দ উৎসবে মাতিয়াছে, ঠাকুরের সহিত আমরা শৃঙ্গারবটে চলিলাম। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু, প্রবোধ বাবু, দক্ষ বাবু এবং অভয় বাবুও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। শৃঙ্গারবটের সমস্ত আঙ্গিনা লোকে পরিপূর্ণ দেখিলাম। হাঁড়িতে হাঁড়িতে দধি আনিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে হলুদ মিলাইয়া উহা ব্রজবাসী ও বৈষ্ণব বাবাজীরা উর্দ্ধে ও চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলেই, সকলের অঙ্গে মহা আনন্দে হলুদ দধি মাখাইয়া পরম উৎসাহে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দোৎসবের মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন ক্রমেই খুব জমাট হইয়া পড়িল। উদ্যমের সহিত বাবাজীরা নৃত্য করিতে করিতে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণে 'ধ্রুম ধ্রুম' পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীধর সর্ব্বাঙ্গে হলুদ দধি মাখিয়া ব্রজবাসীদের সঙ্গে মাতিয়া গেলেন। তিনি সময়ে সময়ে উর্দ্ধবাহু হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিতে বলিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে বালকের মত সঙ্কীর্ত্তনস্থলে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেন। পরে ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর প্রায় তিনঘণ্টাকাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। অপরাহ্ণে আমরা সকলে যমুনায় স্নান করিয়া কুঞ্জে আসিলাম। শ্রীধর কীর্ত্তনস্থলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর নানা ভঙ্গীতে নৃত্যের বিবরণ, ঠাকুরকে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

১০ই শ্রাবণ, ১২৯৭; শুক্রবার।

শ্রীধর চলিয়া গেলেন। পরে আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'জন্মাষ্টমীতে উপবাসের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম। শাক্তদের সঙ্গে কখন কখন বৈষ্ণবদের মতের মিল হয় না, আমি কোন্ মতে উপবাস কর্‌ব?'

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রত উপবাসাদি বংশপরম্পরায় যাঁর যে নিয়ম, তিনি সেইমতই কর্‌বেন।"

আমি বলিলাম—আমাদের লক্ষ্য কি? কোন্ রূপে ভগবান্ আমাদের নিকটে প্রকাশ হবেন?

ঠাকুর বলিলেন—"আমাদের এই সাধনে কোন দেবতা লক্ষ্য নয়। একমাত্র ভগবানই

লক্ষ্য। তা হ'লেও যাঁর যেমন ভাব, যাঁর যে কুলদেবতা, ভগবান্ তাঁকে সেইভাবে সেইরূপেই প্রথম দর্শন দিয়ে থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তাঁহারা ত কোন দেব দেবীই ভাবেন না, মানেনও না ; তাঁদের নিকটে ভগবান্ কি ভাবে প্রকাশ হবেন ?

ঠাকুর বলিলেন—আমি কয়েকটি ঘটনা এরূপ দেখেছি ; কোন কোন ভাল ভাল ব্রাহ্ম অনেক দিন উপাসনাদি ক'রে আমাকে এসে বলেছেন, 'মহাশয় অমুক দেবতার ভাব ও রূপ কেন মনে এসে পড়ে ? কখনও ত ওসব ভাবি না, কল্পনাও করি না ; তবু এরূপ হয় কেন ?'। আমি তাঁদের কথায় অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, যাঁর যে কুলদেবতা, তাঁর ভিতরে সেই দেবতারই রূপ ও ভাব এসে পড়ে। পিতৃপিতামহাদি বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে যেসকল ভাব রক্ত মাংসের সহিত আমাদের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে, উহা কি সহজেই যায় ? ব্রহ্মোপাসক হ'লে কি হবে ? ব্রহ্ম যখন প্রকাশিত হবেন, তখন একটা ভাবে একটা রূপে তো প্রকাশ হবেন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যাঁর বংশের যে দেবতা, ব্রহ্ম তাঁর নিকটে সেই রূপেই প্রথম প্রকাশ হন, পরে উহা হইতে অন্যান্য দেব দেবী ও যাহা কিছু, ধীরে ধীরে প্রকাশ হ'তে থাকেন।

আমি বলিলাম—আমার মনে হয় ব্রাহ্মসমাজের পাল্লায় প'ড়ে আমার বিষম ক্ষতি হয়েছে ; সরল বিশ্বাস আর নাই। সবটাতেই সন্দেহ, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়েছে। ওখানে কেনই বা গেলাম ?

ঠাকুর বলিলেন—সরল বিশ্বাস ভেঙ্গেছেনও যিনি, এখন আবার গড়্ছেনও তিনি। সেজন্য আর তোমার ভাবনা কি ? এখন যেটি হবে, সেটি ঠিক হবে, তা আর ভাঙ্গ্‌বে না। ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে ক্ষতি কিছুই হয় নাই, বিস্তর উপকারই হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়াতেই নীতি চরিত্রাদি রক্ষা পেয়েছে। আর প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞানটি না হ'লে কোন প্রকারেই ঠিক তত্ত্ব জানবার অধিকার হয় না। এজন্য ঋষিরা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই শিক্ষা দিতেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলময়, নির্ব্বিকার, নিরাকার ইত্যাদি ভাব সকল ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে, যখন ক্রমে ক্রমে উহার ভিতর দিয়া অলৌকিক রূপের আশ্চর্য্য ছটা প্রকাশ হ'তে থাকে, তখনই উহা ধীরে ধীরে বুঝা যায়, ধরা যায়।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া সকলেই ত আসেন নাই, যাঁহারা হিন্দুসমাজে থেকে এই সাধন লাভ করেছেন, তাঁদের এসব তত্ত্ববোধ হয় না কি ?

ঠাকুর বলিলেন—তা হবে না কেন ? তবে একটু শক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তত্ত্ব সকল ধর্‌তে তাঁদের তেমন একটা কষ্ট হয় না। খুব সহজেই ধর্‌তে পারেন। আর ব্রহ্মজ্ঞানটি লাভ না হ'লে ত কিছু হবারই যো নাই। তাই প্রথম অবস্থায়ই উহা হওয়া ভাল, এতে সব দিকেই সহজ হ'য়ে আ'সে। যাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাই করা কর্ত্তব্য, তাই কর।

ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—অবশ্যই ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে অনেকের বিস্তর ক্ষতিও হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের ভাল যেটুকু, তাহা ত সকলে সহজে ধর্‌তে পারে না ; যাহাতে অনিষ্ট হয়, এমন সব বিষয়েই সাধারণ লোকে প্রায় জড়ায়ে পড়ে ; অবিশ্বাস, সন্দেহাদি কতকগুলি বৃথা সংস্কারে কেহ কেহ বড়ই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছেন ; সহজে ওসব সংস্কার যায় না ; ঐ সকল সংশোধন হওয়া বড়ই শক্ত।

এ সকল কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ চলিয়া গেল ; ঠাকুরের আদেশমত, মহোৎসবের পুরী কচুরী, মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিতে করিতে দেখিলাম—পুনঃপুনঃ একটি অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ লাল জ্যোতি ঝল্‌মল্ করিয়া এক একবার প্রকাশ হইয়া আবার অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল ; কতকক্ষণ এই জ্যোতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আহারের কিঞ্চিৎ পরে প্রাণায়াম আরম্ভ করাতে, মাঠাকরুণ নিষেধ করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—খুব খালি পেটে বা ভরপূর পেটে প্রাণায়াম কর্‌তে নাই। আহারের অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে কর্‌তে হয়।

অভয় বাবুর প্রতি কৃপা।

গোঁসাই ও কাঠিয়াবাবার প্রথম সাক্ষাৎকার।

আজ শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত কথায় বার্ত্তায় তাঁহার জীবনের একটি সুন্দর ঘটনা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অভয় বাবুর সঙ্গে আমার নূতন পরিচয় নয়, পূর্ব্বেও ফয়জাবাদে দাদার বাসায় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ছিল। তখন তাঁহাকে ধর্ম্মের কোনও বেশ ধারণ করিতে দেখি নাই। এবার শ্রীবৃন্দাবনে অভয় বাবুকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিতেছি। তাঁহারই মুখে শুনিলাম—কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিন তিনি মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; অমনি যমুনায় ডুবিবেন স্থির করিয়া, উহার তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের চৌরাশি ক্রোশের মহান্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা, অভয় বাবুর অভিপ্রায়

জানিতে পারিয়া অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাত মহাপুরুষ নিজ হইতেই স্নেহের সহিত সান্ত্বনাবাক্যে অভয় বাবুকে ভরসা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আমি দীক্ষা দিচ্ছি; সমস্ত অশান্তি চলে যাবে। তুমি ওরূপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।' সিদ্ধ মহাত্মা এই বলিয়া অভয় বাবুকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। অভয় বাবু তখন মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তবৎ লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং সম্মুখে একটি বৃক্ষের ডাল ধরিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায়ই তাহাতে ঝুলিতে লাগিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠিয়াবাবা উঁহাকে সুস্থির করিয়া চলিয়া গেলেন। অভয় বাবু বলিলেন, 'এবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বে কিছুকাল গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ছিলাম। এক দিন স্বপ্ন দেখিলাম, কাঠিয়াবাবা আমাকে বলিলেন, 'চলো, তোম্‌কো এক আসল মহাত্মা দর্শন করায়েঙ্গে।' এই বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমাকে দাউজীর মন্দিরে গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দাউজীর 'জগমোহনে' বসিয়াছিলেন; বিস্তর ব্রজবাসী, সাধু, ব্রাহ্মণাদি গোঁসাইয়ের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। আমাকে গোস্বামী প্রভু দয়া করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দাউজী ঠাকুর দর্শন করাইলেন এবং আদেশ করিলেন যে, 'ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ ও নিরাহারে একাদশী করিবেন।' এই মন্দির এবং এই গোস্বামী প্রভু আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। স্বপ্নদর্শনের কিছুকাল পরে, ঘটনাক্রমে আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম এবং দাউজীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে গোস্বামী মহাশয়কে দর্শনমাত্র তাঁহাকে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমেই আমি বাস করিতে লাগিলাম। এক দিন শুনিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে কাঠিয়াবাবা আসিয়াছেন। অমনি আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'দেখ্ স্বপন তো প্রত্যক্ষ হুয়া হ্যায়্? উন্‌হিকা নাম গুরু। ওহি সাচ্চা সাধু। চল্, হাম্‌ভি দর্শন করনেকো আস্তে তোমারা সাথ্ যায়েঙ্গে।' এই বলিয়া কাঠিয়াবাবা আমার সঙ্গে গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা একে অন্যকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় আলাপাদি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ঐ দিন গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে পরম সমাদরে ভোজন করাইলেন। পরদিন আমার সহিত গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে দর্শন করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে একই স্থানে বসিয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন; একটি কথাও হইল না। এইপ্রকার ক্রমান্বয়ে তিন চার দিন উঁহাদের পরস্পর সঙ্গ হইল; কিন্তু একেবারে নীরব, একটি বাক্যও নাই। তখন এক দিন আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা তো কোন কথাবার্ত্তাই বলেন না।' গোঁসাই বলিলেন, 'মুখে না বলিলেও মহাপুরুষেরা সমস্ত কথা অন্তরে প্রেরণ করেন, ভিতরে ভিতরে কথা হয়।' এক দিন গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। উভয়েই ধ্যানমগ্ন ভাবে নির্ব্বাক্ ও নিবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন, হঠাৎ কাঠিয়াবাবা, গোঁসাইয়ের অঙ্গ স্পর্শ

শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ।

(কাঠের কৌপীন পরা অবস্থা)

১১৪ পৃঃ

করিয়া অবনত ভাবে বলিলেন, 'বাবা! হাম্ আপ্‌কা বালক হ্যায়।' গোঁসাই অমনি কাঠিয়াবাবাকে দুই হাতে বুকের উপরে লইয়া জড়াইয়া ধরিলেন।"

কাঠিয়াবাবা বহুকালযাবৎ প্রত্যহ দিবসের অধিকাংশ সময়ে সেবাকুঞ্জের দ্বারে আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই বাবাজীর সর্ব্বপ্রথমে অপ্রাকৃতলীলা দর্শন হয়। তাই প্রতিদিন এই স্থানে বসিয়া, তিনি এখনও নিত্যলীলা দর্শন করেন।

গোঁসাইয়ের অনুকম্পা।

কথায় কথায় অভয়বাবু বলিলেন, একদিন মথুরার সরকারী ডাক্তার শ্রীমনোমোহন দাস, একখানা সরা পরিপূর্ণ বড় বড় নাড়ু লইয়া, এই কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয়কে না পাইয়া তাঁহার সেবার্থে, উহা দামোদর পূজারীর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। দামোদর ঐ নাড়ু সামান্যমাত্র এখানে রাখিয়া, সমস্তগুলি নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন সকাল বেলা, দামোদর আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—"বাবা, মনোমোহন বাবু ৬টি নাড়ু দিয়াছিলেন; আপনার জন্য দুটি রাখিয়া, দাউজী-ঠাকুরকে দুটি, অভয় বাবুকে একটি এবং শ্রীধর বাবুকে একটি দিয়াছি।" এই কথা আমি কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়া শুনিলাম। পরে, দামোদরের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, গোঁসাইকে বলিলাম—'মনি-অর্ডার যাহা আসে, তাহা তো আপনি স্বাক্ষরমাত্র করেন; সমস্তই দামোদর লইয়া যায়, আর যা'তা আপনাকে আহার করিতে দিয়া কষ্ট দেয়। কল্যও নাড়ুগুলি সমস্ত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে, এ কিরূপ ব্যবহার?' গোস্বামী মহাশয় খুব হাসিয়া প্রফুল্ল মুখে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'আহা, আহা! বেশ করেছে। ছোট ছোট ছেলে পিলে পরিবারাদি আছে, তারা খাবে। ভালই হয়েছে।' আমি শুনিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলাম। একটু পরে গোঁসাই বলিলেন—"আমার গুরুর আদেশ, এক বৎসর কাল এই আসনে আমাকে বাস করতে হবে, তাতে যত ক্লেশ-কষ্ট হয় হউক। আমি জানি আপনাদের আহারাদির কষ্ট হ'চ্চে। নিজের নিজের কিছু কিছু খরচ ক'রে, বাজার থেকে খরিদ ক'রে এনে খাবেন। আর রুখা-শুকা খাওয়াও ভাল, তাতে ইন্দ্রিয়সংযম হয়।"

মহাত্মা গৌর শিরোমণি।

২৫শে শ্রাবণ, ১২৯১।

আজ আহারান্তে গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা উঠিল। শুনিলাম, এক দিন শ্রীধর, শিরোমণি মহাশয়কে দর্শন করিতে তাঁহার কুঞ্জে যাইয়া দেখিলেন, তিনি নিদ্রিত আছেন, সুতরাং সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে দর্শন করিয়া চরণের দিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় নিদ্রিত

থাকিলেও, তাঁহার চরণ দু'টি তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গেল। শ্রীধর আবার তাঁহার চরণের দিকে যাইয়া নমস্কার করিলেন; উঠিয়া দেখিলেন, শিরোমণি মহাশয়ের চরণ দু'টী আবার অন্য দিকে গিয়াছে। শ্রীধর পুনরায় চরণের দিকে চার পাঁচ হাত অন্তরে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িলেন, এবারও শ্রীধর উঠিয়া দেখিলেন চরণ দু'টি আর সেখানে নাই; নিদ্রিতাবস্থায়ই শিরোমণি মহাশয়ের চরণ সরিয়া গিয়াছে। তিনবারই এই প্রকার ঘটনা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া চলিয়া আসিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাহারও নমস্কার করিবার সাধ্য নাই, দূরে থাকিয়াও তাঁহার অজ্ঞাতসারে কেহ তাঁহাকে অগ্রে নমস্কার করিতে পারে না। অবিচারে সকলকে তিনি সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম করেন। রাস্তায় তাঁহার সহিত চলা এক মহা মুস্কিল ব্যাপার। তিনি চলিতে চলিতে রাস্তার দুই দিকে বিড়াল, বানর, গরু, স্ত্রীলোক, পুরুষ এবং বিগ্রহাদি সকলকেই একভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে অগ্রসর হন। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত স্ত্রীলোক ও পুরুষ, শিরোমণি মহাশয়কে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন।

ঠাকুর বলিলেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই শ্লোকের যথার্থ দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে হ'লে শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে দেখ; বর্ত্তমান সময়ে এরকমটি আর দেখা যায় না।

শিরোমণি মহাশয়ের পূর্ব্বকালীন ঘটনা ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—শিরোমণি মহাশয় দেশে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন; ছয়টি দর্শনে, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এক দিন দেশে একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত শুন্‌তে যান। বহু গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠক ব্রাহ্মণ, ভাগবত-পাঠের পূর্ব্বে গৌরবন্দনা পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম আছে, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়, উহা শুনেই আগুন হ'য়ে উঠ্‌লেন। পাঠক ব্রাহ্মণকে ডেকে বল্‌লেন, "এ কি মহাশয়, এ কি ভাগবত পাঠ হ'চ্ছে? আপনি ভাগবত পাঠ কর্‌তে বসেছেন, সম্মুখে ভাগবত খোলা রয়েছে; ওদিকে দৃষ্টি ক'রে আপনি গৌরচন্দ্রিকা পাঠ কর্‌ছেন কেন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে ব'সে, সম্মুখে শালগ্রাম রেখে, ভাগবত পড়্‌বেন ব'লে, এসব মিথ্যা বচনের আবৃত্তি? ভাগবতে ওসব কোথায় লেখা আছে?" ভক্ত ব্রাহ্মণ করজোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে বল্‌লেন, "প্রভো! ভাগবতই আমি পাঠ কর্‌ছি। এই সমস্তই ভাগবতে আছে। আমি অসত্য বাক্য উচ্চারণ করি নাই।" শিরোমণি মশায় তখন আসন হ'তে লাফায়ে উঠ্‌লেন, পাঠকের নিকটে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন—'মশায়, 'অনর্পিতচরীং' ভাবগতের কোথায় আছে একবার দেখান দেখি।' ব্রাহ্মণ অমনি প্রতি

দু'লাইনের ভিতরের ফাঁক্ দেখায়ে বল্‌লেন, 'এই সাদা স্থানে দৃষ্টি ক'রে দেখুন।' শিরোমণি বল্‌লেন, 'কোথায়? এ তো সাদা স্থান দেখাচ্ছেন।' ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, 'আপনার দৃষ্টিশক্তি নাই, কি প্রকারে দেখ্‌বেন? চোখ্ দুটি একটু পরিষ্কার ক'রে নিন, পরে দেখ্‌তে পাবেন।' শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বল্‌লেন, 'শালগ্রাম সম্মুখে রেখে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, এতগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যে আপনি অনায়াসে মিথ্যা কথা বল্‌ছেন।' ব্রাহ্মণ তখন খুব তেজের সহিত বল্‌লেন, 'আপনি ওরূপ কথা বল্‌বেন না, চুপ্ করুন। এই ব্রাহ্মণের সভায় শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, আমি যথার্থই বল্‌ছি ভাগবতের প্রতি দু'লাইনের মধ্যে 'গৌরবন্দনা' লেখা রয়েছে, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনি সিদ্ধ কোনও বৈষ্ণব মহাত্মার নিকট গিয়ে দীক্ষা নিয়ে আসুন, পরে আমি যেসব নিয়ম ব'লে দিব, ঠিক সেইমত এক সপ্তাহ কাল চলুন; অষ্টম দিবসে এখানে আস্‌বেন, তখন ভাগবতের ফাঁকে ফাঁকে গৌরচন্দ্রিকা যদি পরিষ্কার দেখাতে না পারি, আমার জিব কেটে দিব, সকলের সমক্ষে আমি এই শপথ কর্‌ছি।' শিরোমণি মহাশয় মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তখনই তিনি গিয়ে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকটে দীক্ষা নিলেন, পরে পাঠক ঠাকুরের কাছে এসে, তাঁহার নিয়ম প্রণালী গ্রহণ কর্‌লেন। সাত দিন ঠিক সেইমত চ'লে, ব্রাহ্মণের নিকট পুনরায় এসে বল্‌লেন, 'মশায়, এখন আপনি সেই গৌরবন্দনাগুলি ভাগবতে দেখাবেন ত?' পাঠক ব্রাহ্মণ অমনি ভাগবত খুলে বল্‌লেন, 'আচ্ছা, এবার এসে দৃষ্টি করুন।' তখন গৌর শিরোমণি মহাশয় ভাগবতের শ্লোকের প্রত্যেক দু'লাইনের ভিতরে দৃষ্টি করামাত্র দেখ্‌তে পেলেন, উজ্জ্বল স্বর্ণ অক্ষরে গৌরবন্দনা পরিষ্কার লেখা রয়েছে। তখন তিনি মাটিতে প'ড়ে গড়াতে লাগ্‌লেন; কেঁদে কেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন। অমনি সমস্ত ছেড়ে, শ্রীবৃন্দাবনে পদব্রজে যাত্রা কর্‌লেন। সেই থেকে ইনি এখানে আছেন। এ অবস্থার লোক শ্রীবৃন্দাবনে আর নাই। ইনিই যথার্থ বৈষ্ণব।

মৎস্যাহারের অনিষ্টকারিতা।

অশুদ্ধ দেহের হেতু ও পরিণাম এবং শুদ্ধির উপায়।

ঠাকুর, গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণবাচারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন আমি অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'যোগসাধনের পক্ষে মাছ, মাংস খাওয়াতে কি কিছু অনিষ্ট করে?

ঠাকুর বলিলেন—কিছু কি ? ঢের অনিষ্ট করে।

আমি আবার বলিলাম—মাংস খেলে ক্ষতি হয়, ইহাই ত শুনেছি; মাছ খেলেও কি ক্ষতি করে ?

ঠাকুর বলিলেন—মাছ খাওয়াতেও ক্ষতি করে। তবে প্রথম প্রথম যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের তত ক্ষতি হয় না, একটু উন্নতি হ'লেই উহাতে কত ক্ষতি করে, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝ্‌তে পারেন। মাছ খেলে সূক্ষ্ম-শরীরে গতিবিধি কর্‌তে বড়ই ক্লেশ হয়। এজন্য অনেকেই তখন মাছ ছাড়্‌তে বাধ্য হন। আমি মুসলমান ফকিরদের এবং বৌদ্ধ যোগীদের ভিতরেও ঢের দেখেছি যাঁহারা বহুকাল মাছ মাংস খেয়েছেন, তাঁহারাও যোগ আরম্ভ ক'রে কিছু উন্নতি লাভ কর্‌তেই ঐ সব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আমি বলিলাম—সূক্ষ্মশরীরে গতিবিধি ত অনেক উপরের কথা মনে হয়। মাছ, মাংস খাওয়াতে অন্য কোনও অনিষ্ট হয় কি ?

ঠাকুর বলিলেন—আহারের সহিত মনের খুব নিকট সম্বন্ধ; আহারটি সাত্ত্বিক হ'লে মনটিও সাত্ত্বিক হয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে মনটিও সেইরূপ হ'য়ে পড়ে। মাছ, মাংস রজস্তমোগুণী আহার, এসব আহার বিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সাবধান থাক্‌তে হয়।

পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের উপরে ভক্তি হয় না কেন ? ইহার উপায় কি ? কোন ব্যক্তির এই প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন—পূর্ব্বজন্মে শরীর অশুদ্ধ থাক্‌লে পিতা, মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনের উপর অভক্তি ও ঘৃণা হয়। তাঁহারা ভালবাসিলেও অশ্রদ্ধা হয়। এমন কি ভগবানের উপরেও ভক্তি হয় না। পূর্ব্বজন্মের সূক্ষ্ম পরমাণু পরজন্মে সূক্ষ্ম দেহের সহিত স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হয়। এজন্য পরজন্মেও পিতামাতা প্রভৃতির উপরে অশ্রদ্ধা হয়। এই ভক্তির, শরীরের সহিত যোগ। ইহার সহিত আত্মার বিশেষ কোন যোগ নাই। পিতা-মাতার সহিত দেহের যোগ। পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে দেহের সৃষ্টি। এই দেহ শুদ্ধ কর্‌তে হবে, শুদ্ধ রাখ্‌তে হবে, নচেৎ পিতামাতার প্রতি ভক্তি হবে না। গঙ্গা স্নান, তীর্থ পর্য্যটন, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি কর্‌লে দেহ শুদ্ধ হয়।

ঠাকুর কয়েকদিনযাবৎ আমার শরীর অসুস্থ দেখিয়া দাদার নিকটে যাইতে বলিতেছেন। আগামী কল্যই আমি ফয়জাবাদে যাইব স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকটে অনুমতি চাহিলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনের সকল মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রে

এসো। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া কুঞ্জে ফিরিলাম।

ঠাকুরের চরণে বিদায়গ্রহণ ; মাঠাকুরাণীর শেষ আদেশ।

সকালবেলা ঝোলা কম্বল বাঁধিয়া ফয়জাবাদ রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলাম। গুরুভ্রাতাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া দামোদর পূজারীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। উঁহার চরণে আট আনা পয়সা দিয়া নমস্কার করিতেই পূজারী আমার পিঠে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন 'সুফল, সুফল, সুফল। আব্ তোমারা শ্রীবৃন্দাবনবাস সুফল হো গিয়া।' আমি উপরে আসিয়া গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে মাঠাকুরুণ আমাকে ডাকিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া নমস্কার করিতেই, তিনি আমার মাথায় ডান হাতখানা রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—"কুলদা! ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা যায় না, আমার এই কয়টি কথা তুমি চিরকাল মনে রেখো ; যোগজীবন আমার যেমন পুত্র, তোমাকেও আমি ঠিক সেইরূপ পুত্র ব'লেই জানি ; ইহা শুধু একটা কথার কথা মনে ক'রো না ; তোমাকে সত্যি ক'রে বলছি—নিজের ছেলের মতই তোমাকে দেখি ; তুমি যোগজীবনের আপন ভাই, এটি মনে ক'রে সর্ব্বদা তার বল হ'য়ে থেকো। শান্তিসুধার ক্লেশে, কেহ সহানুভূতি করতে পারে না। তাকে ক্লেশের সময়ে সান্ত্বনা দিও। আর ভবিষ্যতে মা যেন দশ জনার গলগ্রহ না হন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখো। ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছ, ভালই হয়েছে, শরীরটি বেশ্ সুস্থ হ'লে বিবাহ করতে ক্ষতি কি? গোঁসাইয়ের অনুমতি নিয়ে, এর পর বিবাহ করতে পার, তাতে ধর্ম্ম-কর্ম্মের, সাধন-ভজনের কোন অনিষ্টই হবে না।" এইসব কথা বলিয়া মাঠাকুরুণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি গুরুদেবের নিকটে আসিয়া, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহ-দৃষ্টিতে একটু সময় আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—বেশ্ এখন এসো; যা ব'লে দিয়েছি তা ক'রতে চেষ্টা ক'রো ; সময়ে সময়ে চিঠি লিখো ; প্রয়োজন মত উত্তর পাবে।

২৭শে শ্রাবণ, ১২৯৭ ; সোমবার, একাদশী।

আমার ফয়জাবাদ যাত্রা ; রাস্তায় সঙ্কট।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে ট্রেনে চাপিয়া একেবারে কানপুরে আসিলাম। মন্মথ দাদার বাসায় উঠিলাম। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বহুকালযাবৎ ছিল। তিনি আমাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আগামী কল্য বা পরশ্বই আমি ফয়জাবাদে যাইব শুনিয়া, তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। দশ পনের দিন না রাখিয়া, আমাকে কখনই তিনি ছাড়িবেন না, পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। মন্মথ দাদার জ্ঞাতসারে আমার অবিলম্বে ফয়জাবাদ যাওয়া অসম্ভব বুঝিলাম। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে তিনি যেমন কাছারীতে গেলেন,

২৮শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

আমিও গোপনে একখানা এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া কানপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। দুরদৃষ্টবশতঃ তখনই ট্রেনখানা ছাড়িয়া দিল। একটি ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন—এখনই এই এক্কায় পোল-ঘাটে চলিয়া যান, গাড়ী পাবেন। আমি অমনি ঐ এক্কাতে উঠিয়া পোল-ঘাটে চলিলাম। ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি, একটু পূর্ব্বেই ট্রেনখানা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি তখন বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম; এদিকে এক্কাওয়ালা ভাড়ার জন্য তাড়া করিতে লাগিল। কাগজে মোড়ান পাঁচটি টাকা ট্যাঁকে রাখিয়াছিলাম, ভাড়া দিতে ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখি ট্যাঁক শূন্য; আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঐ টাকাই আমার রাস্তার সম্বল। আমি বিষম বিপদে পড়িয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর! এই বিপদে আমাকে রক্ষা কর।' ভাবিলাম বুঝি কানপুর ষ্টেশনে যেখানে বসিয়া ছিলাম, টাকা সেইখানে পড়িয়া গিয়াছে। ঝোলা কম্বল এক্কাতে রাখিয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য অবস্থায় বড় রাস্তা ধরিয়া দৌড় মারিলাম। দু' তিন মিনিট দৌড়িয়া, হঠাৎ রাস্তার উপরে টাকা পড়িয়া আছে দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছিন্ন মোড়ান কাগজের কিঞ্চিৎ তফাতে টাকা পাঁচটি দেখিয়া তুলিয়া লইলাম। প্রশস্ত রাজপথে শত শত কুলি, মজুর, দীন দুঃখী নিয়ত যাতায়াত করিতেছে, এতক্ষণ কাহারও চক্ষে এই টাকা পড়ে নাই—এ কি কাণ্ড! রাস্তার মাঝামাঝি না চলিয়া যদি আমি কোনও ধার ধরিয়া ছুটিতাম, তাহা হইলে কখনও এ টাকা আমার নজরে পড়িত না। ইহা ভাবিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলাম। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিয়া এক্কাওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। গাড়ী আবার না পাওয়া পর্য্যন্ত কানপুর ষ্টেশনে যাইয়া অপেক্ষা করিব, স্থির করিলাম।

এই সময়ে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে বলিলেন—'মশায়, আপনি ফয়জাবাদ যাইবেন, আমাকেও আজই লক্ষ্ণৌ যাইতে হইবে। চলুন, তিন ক্রোশ পথ চলিয়া নাওঘাটে যাই, ওখানে নিশ্চয়ই গাড়ী পাইব। এই গাড়ী নাওঘাটে যাইয়া দু'ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করে। আমাদের সেখানে পঁহুছিতে আর কত সময় লাগিবে?' আমি, এই যুক্তি ভাল মনে করিয়া, ঝোলা কম্বল মাথায় তুলিয়া লইলাম এবং উঁহার সঙ্গে দ্রুতপদে পাকা পথ ধরিয়া নাওঘাট চলিলাম। পাকা রাস্তাটির এক দিকে বড় নদী, অপর দিকে বিস্তৃত মাঠ; এখন বর্ষার জল বৃদ্ধি পাইয়া নদী, মাঠ, রাস্তা, সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। নদীর জল প্রবল বেগে রাস্তাটির উপর দিয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। রাস্তার উপরে জল প্রায় আড়াই ফুট; রাস্তার দুই পাশে বড় বড় বৃক্ষ থাকায় ঠিক পথ বুঝিতে কোনও অসুবিধা নাই। আমরা কোমরজলে স্রোত ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় এক মাইল পথ চলিয়াই আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার উপরে প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকবৎ পাথরকুচা ও কঙ্কর পায়ে বিঁধিতে লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল; মাথার বোঝাটি ভিজিয়া ওজনে চতুর্গুণ হইল। বিষম বিপদে পড়িয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মাথার বোঝাটি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলাম। এই সময়ে সঙ্গীটি আসিয়া আমার বোঝাটি নিজ মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং হাতে ধরিয়া স্রোত কাটাইয়া আমাকে টানিয়া

লইয়া চলিলেন। দুই ক্রোশ পথ এই ভাবে চলিয়া আমরা নাওঘাটে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে যাইয়াই নিজের বোঝাটি ঘাড়ে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ফটকের দিকে দৌড়িলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি 'প্লাটফর্মে' যাইবার ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন এক হাতে মাথার বোঝা, অপর হাতে ফটকটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অমনি ট্রেন ছাড়িবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তখন আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল, আমি অবাক্ হইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই সময়ে, দূর হইতে 'গার্ডসাহেব' আমার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া ফটকের নিকটে আসিলেন এবং আমার হাতে ধরিয়া "জল্‌দি চলিয়ে, জল্‌দি চলিয়ে" বলিতে বলিতে টানিয়া লইয়া চলন্ত গাড়ীর উপরে তুলিয়া দিলেন। "টিকিট পিছে মিল্ যায়েগা" বলিয়া গার্ডসাহেব দৌড় মারিলেন। পরের ষ্টেশনেই আমি টিকেট পাইলাম।

অকস্মাৎ একটি বিষম বিপদে পড়িয়া বিনা চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার হইলে উহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু একটির পর একটি উৎকট সঙ্কটে, সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণের উপায় ঘটিলে, উহা আর আকস্মিক মনে করিব কি প্রকারে? প্রতি চা'লে "পোয়া বারো" পড়িলে, হাতের কৌশল না ভাবিয়া পারা যায় না। এই সকল অঘটন সঙ্ঘটন, গুরুদেবেরই হাত মনে করিয়া, আমি তাঁহার অভয় চরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা ফয়জাবাদে পৌঁছিলাম।

চাক্‌রীর তাড়া; মরণাপন্ন ব্যাধি; মাঠাকুরাণীর পত্র।

ভাদ্র, ১২৯৭।

ফয়জাবাদে পঁহুছিলাম। পরে, দাদা আমার বহুকালের শূলরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। কি প্রকারে আরোগ্য লাভ করিয়াছি শুনিয়া, তিনি বলিলেন—'ইহা শুধু তোমার ঠাকুরেরই কৃপা। গোস্বামী মহাশয়ের এমন সঙ্গ ছেড়ে তুমি এলে কেন?' আমি বলিলাম—'এখন আপনার সেবা কর্‌তে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। মায়ের এবং আপনার সেবা না কর্‌লে আমার কল্যাণ নাই।' দাদা বলিলেন—'সেবায় লোকের ত আমার অভাব নাই। আচ্ছা, তুমি এখানে থেকে তাঁর আদেশমত সাধন ভজন কর; তা হ'লেই আমি মনে কর্‌বো, আমার যথেষ্ট সেবা কর্‌ছ।' দাদার কথামত আমি সময় নির্দ্ধারণ করিয়া, সাধন ভজন করিতে লাগিলাম। অবসরমত দাদার সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ফয়জাবাদে দাদার বাসায় ঠাকুর কয়েক দিন থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সমস্ত শুনিলাম। বেশ আনন্দে, সাধন ভজনে, সৎপ্রসঙ্গে আমার দিন কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে মেজ দাদা বহুদিনের সরকারী কার্য্যটি পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে ফয়জাবাদে আসিলেন। আমার শরীর সবল ও সুস্থ দেখিয়া একটি চাক্‌রী জুটাইয়া দিয়া ফয়জাবাদেই আমাকে রাখিবার জন্য দাদাকে বলিলেন। দাদাও সেইমত একটি ভাল কর্ম্মের জোগাড় করিলেন। এদিকে চাক্‌রীর কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। "ব্রহ্মচর্য্যব্রতে চাক্‌রী করা নিষেধ" দাদাকে

বুঝাইয়া বলিলাম। দাদা কহিলেন—"ব্রতভঙ্গ ক'রে চাক্‌রী কর, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়; শুধু তোমার মেজ দাদার কথায়ই আমি চাক্‌রীর জোগাড় করেছি; তাঁকে তুমি বুঝিয়ে বল।" মেজ দাদাকে এসব কথা বলাতে তিনি বলিলেন—'ওসব কিছু না; চাক্‌রী করার ইচ্ছা নাই, তাই ঐ সকল কথা বলা হ'চ্ছে।' আচ্ছা চাক্‌রী নাই কর্‌লে, ব্যবসা কর, দাদার পেটেন্ট্‌ ঔষধগুলি ঘরে ব'সে প্রস্তুত কর আর বিক্রয় কর; সংবাদপত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া দেই।' আমি বলিলাম—'এতেও ব্রতভঙ্গ হবে। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কর্‌তেও নিষেধ।' মেজ দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ওসব কিছু না, সব চালাকী।"

এই সঙ্কটে 'আমি কি করিব' ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিলাম। এদিকে বিষম মাথার যন্ত্রণায় আমি শয্যাগত হইলাম। ১০৫ ডিগ্রী জ্বর হইল। জ্বলন্ত কয়লারাশি যেন মাথার ভিতরে পূরিয়া রাখিয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। দাদা বহু চেষ্টা করিয়া মাথার অসহ্য যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও উপশম করিতে পারিলেন না; বরং আরও অনেক প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইল। পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাতে প্রলাপ বকিতে লাগিলাম। দাদা ভয় পাইলেন, 'এবার দেখ্‌ছি রাখা গেল না' বলিয়া, তিনি বিষম চিন্তায় পড়িলেন।

দুই সপ্তাহ পরে আমার চিঠির উত্তর আসিল। মাঠাকরুণ আমার পত্রের উত্তর দিলেন—

কল্যাণবরেষু,

কুলদা, তোমার পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম এবং গোস্বামী মহাশয়কে পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি কহিলেন, তোমার শরীরের যে অবস্থা দেখিয়াছেন তাহাতে বিষয়কার্য্যে রত হইলে পীড়া আরও বৃদ্ধি হইবে। তোমার দাদাদের কহিবে যে, তাঁহাদের সংসারে যে কার্য্য করিতে পার; তাহা তোমাকে দিয়া করান। তাঁহাদের দাসত্ব করিতে কহিলেন। ভগবানের রাজ্যে একমুষ্টি আহার ভগবান্‌ কোনও প্রকারে দিয়া থাকেন। সকলের একই প্রকার করিতে হয় না। যাকে যে ভাবে রাখেন। মন স্থির করিয়া চলিবে, সংসারে কত অবস্থায় পড়িতে হয়! ধৈর্য্য সম্বল। ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন। এখানে একপ্রকার সকলে ভাল।

আশীর্ব্বাদিকা
যোগমায়া।

পত্রখানা পড়িয়া দাদা ও মেজ দাদা সমস্ত বুঝিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন—'চাক্‌রী আর তোমায় কর্‌তে হবে না; এখন ভাল হ'লেই হয়।' রোগের অষ্টাদশ দিবসে দাদাদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার ভিতর যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল; ঊনবিংশ দিবসে অকস্মাৎ মাথাধরা কমিয়া গেল, শারীরিক কোন গ্লানিই আর রহিল না। বিংশ দিবসে পথ্য পাইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম।

এতকাল সাধন ভজন, ব্রত নিয়ম সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল। আরোগ্যলাভের পরে আবার সাধন করিতে প্রবল স্পৃহা জন্মিল। আমি নিয়ম করিয়া ঠিক সেইমত চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ছয়টা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত নাম, প্রাণায়াম, পাঠ ও ধ্যান করিতে লাগিলাম।

আহারান্তে সাড়ে বারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত নাম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি। রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বারটা কখনও বা একটা পর্য্যন্ত নিদ্রায় যায়; তৎপরে ভোরবেলা পর্য্যন্ত প্রাণায়াম, কুম্ভক, নাম ও ধ্যান করিয়া সময় কাটাইয়া থাকি। এই ভাবে পরমানন্দে আমার দিন রাত চলিয়া যাইতেছে।

সদ্গতিপ্রার্থী শক্তিশালী মৃতাত্মার উপদ্রব।

এবার ফয়জাবাদে আসিয়া অনেক নূতন নূতন ব্যাপার দেখিলাম। তাহার মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। এখানে আসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজনের সুবিধার জন্য ঠাকুরঘরে আসন করিয়াছি। উপরে দুইটি মাত্র কোঠা। দাদার থাকিবার ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বেই ঠাকুরঘর; এই ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি বড় জানালা আছে। নীচেই বিস্তৃত বাগান। জানালায় পাঁচ ছয় হাত অন্তরেই একটি সুন্দর বেলগাছ। বেলগাছের নীচে একটু দূরেই বাহিরের পায়খানা। ঠাকুরঘরে, জনৈক পরমহংসপ্রদত্ত দাদার শালগ্রাম রহিয়াছেন। এই ঘরের এক কোণে আসন পাতিয়া আমি সাধন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে সুস্পষ্ট শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আমার কাণে আসিতে লাগিল; ঠিক যেন কোন এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে বসিয়া সজোরে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া ফেলিয়া প্রাণায়াম করিতেছে। আমি চোখ মেলিয়া চারি দিকে তাকাইতে লাগিলাম; শূন্য ঘরে মুহুর্মুহুঃ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। অনুসন্ধানে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আসনে স্থির হইয়া বসিলেই এইপ্রকার শব্দ আরম্ভ হয়, যতক্ষণ আসনে বসিয়া থাকি, এই শব্দের বিরাম নাই; ইহাতে আমার বড়ই উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। তিন চার দিন পরে দাদাকে এ বিষয় জানাইলাম। দাদা বলিলেন—'গোস্বামী মহাশয়ের যাওয়ার পর হইতে এখানে এই এক নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুরঘরে গেলেই আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাই। বাসার কেহই সহজে ঐ ঘরে যায় না; সকলেই ঐপ্রকার শব্দ শুনিয়া থাকে; চোখে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু দেখে নাই। একাকী কখনও আমি ঐ ঘরে বসি না। তুমি এতদিন যে ঐ ঘরে আছ, ইহা খুব আশ্চর্য্য।' আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'গোস্বামী মহাশয় যখন এখানে এসেছিলেন তখন কি তিনি এখানে কোন ভূত প্রেত আছে এরূপ বলেছিলেন?' দাদা বলিলেন—"গোঁসাই যেদিন এখানে এলেন, ভোরে বাহিরের পায়খানায় যাইতেই একটি ভূত তাঁর নিকট উপস্থিত হ'ল, আর নানা প্রকার গোলমাল আরম্ভ কর্‌লো। এদিকে চা প্রস্তুত, সকলে গোঁসাইয়ের অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন; গোঁসাইয়ের আস্‌তে অত্যন্ত বিলম্ব দেখে সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। কেহ কেহ দূর হ'তে দেখতে লাগ্‌লেন গোঁসাই আস্‌ছেন কি না। পরে আমাকে উঁহারা জিজ্ঞাসা করায় আমি বল্‌লাম 'গোঁসাইকে ভূতে ধ'রেছে।' উঁহারা সকলে আমার কথা শুনে তামাসা মনে কর্‌লেন।

আধ ঘণ্টারও পরে গোঁসাই এলেন। হাত মুখ ধুয়ে দরজার সম্মুখে দাঁড়ায়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গোঁসাই বল্‌লেন—

"দুর্গা! দুর্গা!! বাবা! কি উৎপাত! কি উৎপাত! বাঁচা গেল!"

শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন—'কি?'

গোঁসাই বল্‌লেন—বেলগাছে একটি ভূত আছেন, তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ। সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন; যানও না, মহামুস্কিল! তাই বিলম্ব হলো।

ভূত কি বলিল জিজ্ঞাসা করাতে গোঁসাই বলিলেন—পায়খানায় যাওয়ামাত্রই ভূত সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বল্‌লেন—"আপনি এখানে আস্‌বেন জেনে আজ বার বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় এখানে আছি, এখন আমার গতি করুন।" আমি তাঁকে বল্‌লাম—'আপনি এখন সরে যান; আমি পায়খানা সেরে নেই, পরে যা হয় শুন্‌বো এখন।' তিনি কিছুতেই দরজা ছাড়্‌লেন না; কান্নাকাটি গোলমাল আরম্ভ কর্‌লেন; তাঁর সদ্‌গতির জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন; এখানে তিনি কাহারও কোনও অনিষ্ট কর্‌বেন না, যথাসাধ্য উপকারই কর্‌বেন, স্বীকার কর্‌লেন। তাঁর আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর্‌তে হবে, বল্‌লাম। পরে তাঁকে সরায়ে দিয়ে পায়খানা সেরে এলাম; তাতেই এতক্ষণ বিলম্ব হ'লো।

দাদার এসকল কথা শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইল। আমি ঠাকুরঘরেই আসন রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে দিবারাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মোপাসনা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সহজে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।' আমি নাম করিবার সময়ে গুরুর ধ্যান ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্‌, নিরাকার পরব্রহ্মের অস্তিত্বমাত্র ধ্যান করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ এইরূপ উপাসনায় আমার খুব আনন্দই বোধ হইতে লাগিল। আর আর দিনের মত রাত্রি ১ টার সময়ে জাগিলাম; হাত মুখ ধুইয়া, শুষ্ক মোটা কাঠের ধুনি জ্বালিয়া, আসনে বসিলাম। প্রাণায়াম, কুম্ভক যথামত করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। শরীর একটু অবসন্ন বোধ হওয়ায়, বালিশের উপরে একটি বাহু রাখিয়া কাৎ হইয়া রহিলাম। উপরের একটি পা গুটাইয়া রাখিয়া, অপরটি দেওয়ালের দিকে ছড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে আমার ধুনি 'ধা ধা' করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কখনও চোখ মেলিয়া, কখনও বা বুজিয়া, নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। একটু পরেই সুস্পষ্টভাবে ঠাকুরের রূপ আমার মনে পুনঃপুনঃ উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আমি উহা মন হইতে সরাইয়া দিয়া, ব্রহ্মধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে লাগিলাম। এই সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি আমার পায়ের দিকে আসনের উপরে একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটির আকৃতি ভয়ঙ্কর ডনগীরের মত

—বর্ণ কালো, মাথা নেড়া, চক্ষু দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তার চ'খে চোখ্ পড়াতে সে আমাকে ইঙ্গিত করিয়া আসনে উঠিয়া বসিতে বলিল এবং তাহার সহিত প্রাণায়াম করিতে সঙ্কেত করিল। 'সাধনের আসনে অপরে বসিলে সাধনের জমাট ভাব নষ্ট হইয়া যায়, অন্যের ভাবে আসন দুষ্ট হয়, এজন্য অন্যকে ভজনের আসনে বসিতে দিতে নাই' এই কথা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং উহাকে আমার আসনে বসিতে দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইল। নামিয়া বসিতে এক বার আমি উহাকে বিরক্তির সহিত বলিলাম, কিন্তু আমার কথা সে গ্রাহ্য না করিয়া, স্থিরভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন আমি ক্রোধভরে গুটান বাম পা আকর্ষণ করিয়া সজোরে উহার বুক লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিলাম। পা'টি উহার শরীর ভেদ করিয়া ক্রম্ শব্দে দেওয়ালে গিয়া লাগিল; কিন্তু উহার শরীরের স্পর্শ বিন্দুমাত্রও অনুভব হইল না। লাথি মারা মাত্রেই লোকটি এক অদ্ভুত শক্তি প্রয়োগ করিল। অকস্মাৎ প্রাণায়ামে ভয়ানক দম দিয়া খট্ খট্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। উহার বাহুদ্বয়ের, গলার ও মস্তকের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম। তখন আমার ভিতরের বায়ু ঐ ভূতটি প্রাণায়ামের প্রবল টানে আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ দম চড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও বায়ু টানিয়া লইতে পারিলাম না। কুম্ভকদ্বারা ঘরের সমস্তটা বায়ু স্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছে বুঝিলাম। তখন সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল, নড়িবারও আমার শক্তি রহিল না। আমি আসন্নকাল উপস্থিত বুঝিয়া অভ্যাসবশতঃ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলাম। এসময়ে ভাঙ্গের নেশার মত কি যেন আমাকে এক একবার শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া ভয়ানক আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। উঠাপড়ার পাকে অস্থির হইয়া, তখন গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইল। এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলাম, কিছুই জানি না; পরে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস চলিতে লাগিল। একটু পরেই আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি ঝাঁ করিয়া আসনে উঠিয়া বসিলাম। তখন তেজের সহিত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ভূতকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও এই দিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাগ্রত অবস্থায় এই প্রকার ভূতের উপদ্রবে আমি আর কখনও পড়ি নাই। এই ভূতটি যে মহাশক্তিশালী পুরুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, এক দিন রাত্রি প্রায় একটার সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম—একটা দস্যু দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়া দাদাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে একগাছি বড় লাঠিদ্বারা দাদার মাথায় ঠনাঠন আঘাত করিতেছে, আর আমি দাদাকে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া যাইতেছি। স্বপ্নটি দেখিয়াই নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়াই দাদার ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ এবং মহা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। প্রাণ আমার চমকিয়া উঠিল। আমি দাদার ঘরে ছুটিয়া গেলাম; গিয়া দেখি দাদা বিছানায় বসিয়া হাত পা আছড়াইতেছেন, শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে দাদাকে

জড়াইয়া ধরিলাম। কতক্ষণ পরে, দাদা শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে সমর্থ হইলেন। সুস্থ হইয়া দাদা বলিলেন—'স্বপ্নে দেখিলাম—একটা লোক আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে; তাহাতেই আমার শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল।'

সত্য স্বপ্ন, চক্ষের অসুখ।

আর এক দিন, নাম করিতে করিতে শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম—একটি গৌরবর্ণ পবিত্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওহে, তোমার বামচক্ষুটি আজ উঠবে, ৩।৪ দিন একটু যন্ত্রণা হবে, পরে সেরে যাবে ; ব্যস্ত হইও না।' সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া দাদাকে চক্ষু দু'টি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমার কি চোখ উঠ্‌বে?' দাদা দেখিয়া বলিলেন—'চোখ্ বেশ পরিষ্কার, চোখ্ উঠ্‌বার কোন লক্ষণই দেখ্‌ছি না।' কিছুক্ষণ পরে, স্বপ্নের কথা ভুলিয়া গেলাম। বেলা ৮টার সময়ে চোখ্ একটু 'আস্ আস্' (ভারি) বোধ হইতে লাগিল। একটু পরেই বাম চক্ষুটি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ভয়ানক জ্বালা আরম্ভ হইল ; দাদা আসিয়া চক্ষের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। চার দিন খুব যন্ত্রণা ভোগ হইল, পরে সারিয়া গেল। কোনও ঔষধ ব্যবহার করিলাম না। অক্ষরে অক্ষরে স্বপ্ন সত্য হইল দেখিয়া, বড়ই আনন্দ হইল।

ক্ষুধার্ত্ত শালগ্রাম।

এক দিন সকাল বেলা, আসনে বসিয়া নাম কবিতেছি, যজ্ঞধূমেব অতি পবিত্র গন্ধ পাইতে লাগিলাম। কোথা হইতে এই গন্ধ আসিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পাবিলাম না। অন্য কোথাও এই গন্ধ নাই, শুধু ঠাকুরঘরেই সুগন্ধ 'গম গম' করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একই ভাবে সমস্ত দিন এই আশ্চর্য্য গন্ধ রহিল। গন্ধের গুণে চিত্ত প্রফুল্ল হইতে লাগিল। সকলেই ঠাকুরঘরে সারাদিন এই গন্ধ পাইয়া বিস্মিত হইলেন। গন্ধের কোন প্রকার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া দাদা বলিলেন—'ইহা আমার শালগ্রাম ঠাকুরের গায়ের গন্ধ ; তাহা না হইলে, ঘরের বারেন্দায় পর্য্যন্ত এই গন্ধ নাই কেন?' আমি দাদার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। দাদা তখন শালগ্রামের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন—'আমার নারায়ণকে তুমি বিশ্বাস কর না। আমিও উঁহাকে পাথর ভিন্ন কিছুই মনে করিতাম না; কিন্তু এখন শালগ্রামের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বাস না করিয়া পারিতেছি না। এক দিন হঠাৎ একটি দীর্ঘাকৃতি জটাজুটধারী, সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র, তিনি শালগ্রামটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'এই শালগ্রাম ঘরে রাখিয়া আপনি সেবা পূজা করুন, আপনার বিশেষ কল্যাণ হইবে।' আমি ওসব বিশ্বাস করি না ; সেবা পূজাও করিতে পারিব না বলিয়া, উহা লইতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন—'আচ্ছা, আপনি শুধু এই চক্রটি ঘরে রাখিয়া দিন, ইনি নিজেই নিজের সেবা পূজার

ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।' আমি সন্ন্যাসীর কথামত, ঘরের একটি স্থানে উহা রাখিয়া দিলাম, খোঁজ খবর কিছুই রাখিতাম না। এক দিন রাত্রে, শালগ্রাম স্বপ্ন দিলেন—'দেখ এই আবর্জ্জনার ভিতরে আমাকে ফেলে দিয়েছে!' সকালে উঠিয়া আবর্জ্জনার ভিতর হইতে শালগ্রামটি লইয়া আসিলাম। কে কখন কি ভাবে উহা ফেলিয়া দিয়াছিল, কিছুই জানি না। তাই একটু আশ্চর্য্য হইলাম। এই ঘটনায় শালগ্রামের উপরে একটু ভক্তিও হইল। আমি শালগ্রামটি আনিয়া ঘরে একখানা ছোট চৌকীর উপরে রাখিয়া দিলাম; প্রত্যহই আমি স্নানের পর কিছু সময় আসনে বসি, সেই সময়ে শালগ্রামটিকে স্নান করাইয়া, ফুল তুলসী দিতে লাগিলাম। এই সময় হইতেই শালগ্রামটি পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে আমাকে এমন ভাবে কৃপা করিতে লাগিলেন যে, তাহা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। যেমন শালগ্রামের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, তেমনই আমারও শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের এখানে আসার পর হইতে, তাঁহার কথায় রীতিমত শালগ্রামের সেবা পূজা করিতেছি। ঠাকুর আমার পাথর নন, জাগ্রত দেবতা; তিনিও ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এক দিন তিনি অযোধ্যায় যাইয়া সমস্ত ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিলেন। বাসাতে পঁহুছিয়াই, আমার ঠাকুর দর্শন করিতে, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটুকু সময় শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি করিয়াই, তিনি বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন, চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল; তিনি ব্যস্ত হইয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া পরে নিজের আলখিল্লার পকেটে হাত দিলেন এবং কিছু পেঁড়া বরফি বাহির করিয়া ঠাকুরের কাছে ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। মিষ্টি কোথায় পাইলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম! তিনি বলিলেন—"আমি কিছু মিষ্টি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলাম; ঠাকুরঘরে যেতেই, ঠাকুর প্রকাশ হ'য়ে আমার নিকটে দুহাত পেতে বল্লেন, 'শীঘ্র আমাকে কিছু খেতে দাও; অনেক দিন আমি উপবাসী আছি, ইহারা আমাকে খেতে দেয় না।' আমার পকেটে যাহা ছিল, তাহাই নারায়ণকে দিলাম। সমস্ত মন্দির ও দেবালয় দেখে এলাম, কিন্তু এরূপটি আর কোথাও দেখ্‌লাম না। এখানে, বামনদেব সর্ব্বদা জীবন্তভাবে প্রকাশ রয়েছেন। নিয়মমত ঠাকুরের সেবা পূজা কর্‌তে হয়।"

দাদা বলিলেন—'হাঁসপাতালের কাজকর্ম্ম করিয়া শালগ্রামের পূজা করিতে বড়ই অসুবিধা হয়, ভোগের বন্দোবস্ত এখানে করা আরও কঠিন।' গোঁসাই এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"হাঁসপাতালে যাওয়ার পূর্ব্বে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে একবার গিয়ে নারায়ণকে স্নান করায়ে চন্দন তুলসী দিবেন; আর একটুকু মিষ্টি ও জল তুলসী নিবেদন ক'রে দিলেই হবে।" আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথামতই এখন শালগ্রামের পূজা করিতেছি। আমি দাদাকে বলিলাম, 'এখানে যখন ঠাকুর আসিয়াছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আর কে কে ছিলেন? বাসায় সুবিধামত

সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ত? ঠাকুর কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন? সারাদিন কোথায় কোথায় বেড়াতেন? এসকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়।'

ফয়জাবাদে গোঁসাইয়ের অবস্থিতি।

দাদা বলিতে লাগিলেন—তোমার পত্র পাইয়াই আমি তিন চারি দিনের ছুটি লইয়া গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে কাশীতে গেলাম। তাঁহাকে বহুকাল পরে দেখিলাম, দেখিয়াই মনে হইল তিনি আর সে মানুষ নাই, এখন তিনি আকৃতি প্রকৃতিতে সাক্ষাৎ মহাদেব হইয়াছেন। আমার বড়ই আনন্দ হইল। ছুটি অল্প দিনের ছিল বলিয়া আমাকে শীঘ্রই চলিয়া আসিতে হইল। আসিবার সময়ে গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার পথে ফয়জাবাদ হইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া আসিলাম; তিনি দয়া করিয়া আমার কথায় সম্মত হইলেন। গোঁসাই কয়েকদিন পরেই এখানে আসিলেন; তাঁর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, যোগজীবন, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাণিকতলার মা ও তাঁর স্বামী ব্রজ বাবু আসিয়াছিলেন। আমার বাসায়ও তখন দেবেন্দ্র পাল প্রভৃতি চার পাঁচটি ছিলেন; স্থানাভাব বশতঃ বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া আমরা সকলে থাকিতাম। আমি গোস্বামী মহাশয়ের পাশেই শয়ন করিতাম, দেবেন্দ্র আমার অপর পাশে থাকিত। গোঁসাই ঘুমাইতেন না, সারারাত্রি বসিয়া কাটাইতেন। এক দিন রাত্রি আড়াইটার সময়ে, কেন জানি না, দেবেন্দ্র আমার বুকে একটি চাপড় মারিল। শক্তিচুরির এবং বশীকরণাদির ক্ষমতা উহার ছিল। চাপড় পাইয়া আমি জাগিয়া পড়িলাম। ভিতরটা যেন নিস্তেজ, শূন্য হইয়া গেল, মনটি বড়ই বিশ্রী হইল। তখন গোঁসাই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—"অবিশ্বাসীর সংসর্গ হ'তে সাধু সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! গোঁসাইয়ের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে এমন একটা শক্তিসঞ্চার হইল যে, মনে হইতে লাগিল—ইচ্ছা করিলে আমি সমস্ত বাড়ী, ঘর, দালান, কোঠা লাথি মারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। দেবেন্দ্র তখন আমার পাশে আর থাকিতে পারিল না, উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

এক দিন গোস্বামী মহাশয় সকলকে লইয়া লেঙ্গা বাবার দর্শনে গেলেন। গোঁসাইকে দেখিয়া, লেঙ্গা বাবা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরে, সুস্থির হইয়া, গোঁসাইকে ওখানে একরাত্রি বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন, বাবাজী মোটা চাউলের ভাত এবং রসুন দেওয়া ডাল প্রস্তুত করিয়া অতিথিসেবা করিলেন। শীতকালের রাত্রিতে সরযূর অনাবৃত চড়াতে সকলে থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, শ্রীধর, হরিমোহন এবং দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাত্র গোঁসাইয়ের সহিত রহিলেন; অবশিষ্ট সকলে চলিয়া আসিলেন। আমার বন্ধু দেবেন্দ্র ওখানে রাত্রি কাটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু লেঙ্গা বাবা তাহাকে থাকিতে দিলেন না। দেবেন্দ্র বাসায় আসিয়া, গোপনে আমার নিকট সকলের কুৎসা করিতে লাগিল; গোস্বামী মহাশয়কেও একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিবে, এই প্রকার আস্ফালন আরম্ভ করিল। উহার কথা শুনিয়া আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা, সকলকে লইয়া গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিবার সময়ে, দরজার নিকটে আসিয়াই বলিলেন—'ওহে! এখানে সাধুনিন্দা হয়েছে; আর থাকা চল্‌বে না, তোমরা সকলে আসন তোল।' এই বলিয়া গোঁসাই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসনে বসিয়া খুব তেজের সহিত নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—"এঁদের জান্‌তে তোর ঢের দেরি! কতটুকু বুঝিস্? কি জানিস্? হয়েছে কি? কিছুইত না—অনেক ঘুরপাক খেতে হবে, অনেক ভুগ্‌তে হবে। তুই আবার পরীক্ষা কর্‌বি কি?"

গোঁসাই যখন এসব কথা বলিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তার মুখখানা কাল হইয়া গেল, সে চারি দিকে ব্যস্তভাবে তাকাইয়া, অমনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

চা খাওয়ার পরে, সকলে বসিয়া গত রাত্রির দর্শনাদি বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করিলেন। ভূত প্রেত সঙ্গে মহাদেবকে, ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে কালীকে এবং মহাবীরকে যিনি যে ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। গোঁসাই সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"লেঙ্গা বাবার প্রার্থনাতেই সকলে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। লেঙ্গা বাবা তোমাদের খুব কৃপা কর্‌লেন। তাঁর আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবেই, এই প্রকার চড়াতে আমরা সামান্য শীতও অনুভব কর্‌লাম না। এটি বড় সহজ কথা নয়।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—গায়ে ত আপনাদের সকলেরই মাত্র এক একখানা কম্বল, এই দারুণ শীতে সারারাত সরযুর খোলা চড়াতে আপনাদের কি শীতে কষ্ট হয় নাই?

ঠাকুর বলিলেন—কই না, আমাদের ত কোন কষ্টই হয় নাই, ছাপ্পরের ভিতরে বেশ আরামে ছিলাম।

হরিমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হাঁ, চমৎকার ছাপ্পর, দু'দিকে দু'টিমাত্র ভাঙ্গা টাটি, সম্মুখে ও পশ্চাতে খোলা, মাথার উপরে পরিষ্কার আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের ছাপ্পর। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কিছুক্ষণ পরে গায়ের কম্বল ফেলে দিতে হ'লো। গরম বোধ হ'তে লাগ্‌ল। তখন যোগজীবন বল্‌লেন—আমারও মনে হ'তে লাগ্‌ল, যেন একটা গরম হাওয়ার কুণ্ডলিতে আছি। শেষ রাত্রে ৪টার সময়ে ঐ কুণ্ডলিটি অন্তর্দ্ধান হ'লো। তখন সামান্য একটু শীত বোধ হয়েছিল। এই সময়ে ঠাকুর, দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি সাধন লেঙ্গা বাবা করেছিলেন জান? দাদা বলিলেন—শুনেছি, শব-সাধন করেছিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাই সম্ভব। নইলে এ প্রকার শক্তি এত সহজে লাভ হ'তে বড় দেখা যায় না। কিন্তু এই শক্তি বেশী দিন থাকে না। এই সাধনমার্গের সাধুদের প্রকৃতি যেরূপ উগ্র হয়, লেঙ্গা বাবার তেমন নয়। ইনি বেশ শান্ত। এই বলিয়া লেঙ্গা বাবার তপস্যার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সব তপস্যায় সিদ্ধ হ'লেই কি মানুষ দীর্ঘজীবী হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—না, সিদ্ধ হ'লেই যে মানুষ দীর্ঘজীবী হবে তা নয়। কায়াকল্পে সিদ্ধ হ'লে শরীর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বলিয়া তিনি একটি ফকির সাহেবের কথা বলিলেন—

কায়াকল্পি ফকিরের কথা।

(এই গল্পটি ঠাকুরের মুখে আমি যে প্রকার শুনিয়াছিলাম, দাদার ডায়েরিতেও অবিকল সেইরূপ দেখিয়া লিখিয়া রাখিতেছি।)

ঠাকুর কহিলেন—গয়াতে যখন ছিলাম, প্রায়ই একটি ফকিরের নিকটে যাওয়া আসা কর্‌তাম। ফকিরটি নির্জ্জন স্থানে জঙ্গলের ভিতরে একটি ভাঙ্গা মস্‌জিদে থাক্‌তেন। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্‌জিদের বারেন্দায় লম্বা হ'য়ে বেহুঁস অবস্থায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছেন। ওদিন কিছুক্ষণ সেখানে চুপ ক'রে ব'সে থেকে চ'লে এলাম। এইরূপ পাঁচ সাত দিন গেল, রোজ আমি একবার ক'রে ফকির সাহেবকে দেখ্‌তে যেতাম। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকিরের শরীরটি ভয়ানক ফুলে গেছে, আর তাহাতে বিষ্ঠার কীটের মত লেজওয়ালা বড় বড় পোকা সর্ব্বশরীরে ব'সে রক্ত পান কর্‌ছে। সরিসার মত স্থানও ফাঁক নাই, ফকির সাহেব পোকার কামড়ের যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে গোঁ গোঁ কর্‌ছেন। দেখে বড়ই কষ্ট হ'লো ; ওখানে এমন একটি পাখীও ছিল না যে, পোকাগুলিকে এসে খায়। এমনই ভগবানের লীলা !

তখন এক দিন একটি মুসলমান্ তালুকদার এসে, আমাকে সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁকে ফকির সাহেবের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি যেন উঁহার কোন প্রকার প্রতিকার কর্‌তে গিয়ে, ফকির সাহেবকে বিরক্ত না করেন, বিশেষ ক'রে বল্‌লাম। কিন্তু তিনি আমার কথা শুন্‌লেন না ; ধীরে ধীরে ফকিরের নিকটে গিয়ে ব'সে, আস্তে আস্তে দুই তিনটি পোকার লেজ ধ'রে টেনে তুল্‌লেন। আর অমনি সে স্থান হ'তে অজস্র রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো। ফকির সাহেব চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। তালুকদার তখন চম্‌কে গেলেন। সেই সেই স্থানে পোকা কয়টিকে তুলে আবার বসায়ে দিতে ফকির সাহেব বারম্বার চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন। মুসলমান্‌টি ঐরূপ করার পরে, ফকির নীরব হলেন। তালুকদার খুব আক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন। আমিও বাসায় এলাম। ইহার কয়দিন পরে, এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্‌জিদের বারেন্দায় পায়চারি কর্‌ছেন। মুখশ্রী সুন্দর প্রফুল্ল, শরীরে যেন একটা জ্যোতি খেল্‌ছে। তখন বুঝ্‌লাম ফকির সাহেবের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে, কিছুদিন পরে আর তাঁকে দেখা গেল না। কোথায় চ'লে গেলেন।

শুনিয়াছি—দেহকল্পে তিন শত বৎসর, পাঁচ শত বৎসর, হাজার বৎসর পরমায়ু লাভের জন্য সঙ্কল্প করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাধন, আচার, নিয়ম ও ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষারম্ভ হইতে পক্ষান্ত পর্য্যন্ত পনের দিন, কেহ বা এক মাস, আবার তেমন সমর্থ তপস্বী ব্যক্তি দীর্ঘ পরমায়ু লাভের জন্য ঔষধ সেবন পূর্ব্বক দেড় মাস কাল, নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া দেহকল্পে সিদ্ধ হন।

আমি যখন ভাগলপুরে ছিলাম, তখন দু'টি সাধু গঙ্গাতীরে বারোয়ারির নির্জ্জন বহুপুরাতন অন্ধকার 'গোহফাতে' তিনশত বৎসরের জীবনলাভ সঙ্কল্প করিয়া পনের দিনের জন্য এই সাধনে প্রবৃত্ত হন। ঔষধের গুণে নাকি, দিন দিন তাঁহাদের শরীরের মাংস ধীরে ধীরে পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, অমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানে নূতন মাংস গজাইতে আরম্ভ করিল, একটি সাধুর যন্ত্রণায় মৃত্যু হইল। অপরটি সিদ্ধিলাভ করিয়া পনের দিন পরে কোথায় চলিয়া গেলেন, খোঁজ পাওয়া গেল না। ভগবানের সৃষ্টিতে কত কি আছে জানিবার পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করা যায় না!

গোস্বামী মহাশয় এক দিন অযোধ্যা যাওয়ার সময়ে গাড়ীতে বসিয়া, রামুপালীর প্রকাণ্ড ময়দানে, অপূর্ব্ব রাজবেশে রাম-সীতার দর্শন পাইলেন। সে দিন তিনি সরযূতে স্নান করিয়া হনুমানগোরী, রংমহল, রাম-সীতার মন্দিরাদি অনেক ঠাকুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন। মাধুদাস বাবার আশ্রমে যাইয়া, তাঁর শিষ্য নারায়ণদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মণি বাবার আশ্রমে গেলেন। অযোধ্যাতে সকলেই মণি বাবাকে সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া জানেন। গোঁসাইকে দর্শন করিয়া, তিনি আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। কতক্ষণ পরে উঠিয়া করজোড়ে গোঁসাইকে বলিলেন—"কৃপা করকে দর্শন তো দিয়া, আউর হামারা রয়্‌নেকা প্রয়োজন ক্যা? আপ্‌ হামারা স্থান পর্‌ রহিয়ে, হাম্‌ দেহ ছোড় দেস্তে।" গোঁসাইও যেন কতকালের পরিচিত লোক পাইয়া, তাঁর সঙ্গে সেইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পতিতদাস বাবাজীকে দর্শন করিতেও গোঁসাই গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের সম্মিলনে যে আনন্দোচ্ছ্বাস ও ভাবাবেশ হইয়াছিল, তাহা আমরা আর কি বুঝিব?

দাদা কহিলেন—আহারাদি আমাদের সকলের এক সঙ্গেই হইত। যাঁহারা মাছ খান, তাঁহারা পূর্ব্বেই আহার করিতেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পাশেই বসিতাম। এক দিন আহার করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, আমি মাছ খাই; অমনি তিনি রসুইয়ে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আমাকে মাছ দিতে বলিলেন। আমি পুনঃপুনঃ আপত্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে তাঁহার একান্ত আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া, আমি মাছ খাইলাম। গোঁসাই বলিলেন—"আপনি স্বচ্ছন্দে মাছ খান, ওতে আমার কোন অসুবিধাই হয় না।" আহারের সময়ে আমার মুখে খাওয়ার শব্দ হইত। তাহা শুনিয়া এক দিন বলিলেন—"আহারে খাওয়ার শব্দ না হওয়াই ভাল।" আমি সেই হইতে সাবধান হইয়া আহার করি। মাণিকতলার মা, বহুকালবাবৎ আহারত্যাগী, তিনি এক গণ্ডূষ জলও খাইতেন না; অনুরোধ করিয়া কোন ভাল জিনিস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বমি হইয়া যাইত। এইপ্রকার অদ্ভুত অবস্থা কোথাও দেখি নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধে ঠাকুরের পরমাত্মীয় নানকপন্থী সিদ্ধ মহাত্মা মাধুদাস বাবাজীর অনেক শিষ্য, ভজননিষ্ঠ কানাইয়ালাল বাবা প্রায় সর্ব্বদাই গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে থাকিতেন। তিনি একদিন অপ্রাকৃত অম্বুরাশিমধ্যে মৎস্যাবতার ভগবান্‌কে গোঁসাইয়ের সম্মুখে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে দেখিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাধুদাস বাবার বহু গণ্য মান্য ইংরাজী শিক্ষিত শিষ্যগণ, অনেক সময়েই গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে থাকিতেন। তাঁহারা ওখানে নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্য ও নিজ অভীষ্টদেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন।

ঠাকুরের ফয়জাবাদে অবস্থানকালে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা ঠাকুরের মুখে শুনিয়া লিখিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

ফয়জাবাদে প্রায় দুই মাস কাল দাদার সঙ্গে খুব আনন্দে কাটাইলাম; অকস্মাৎ এক দিন বাড়ী হইতে খবর আসিল, মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা হইয়াছেন। দাদা আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই কয়মাস যে ভাবে আমার নিকটে কাটাইলে, তাহাতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি একান্ত প্রাণে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করুন। গোস্বামী মহাশয় তোমাকে মা'র সেবা করিতে বলিয়াছেন; এখন তুমি বাড়ীতে যাইয়া মায়ের সেবা কর, তাহাতেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হইবে।' দাদার আদেশ মত আমি বাড়ী রওয়ানা হইলাম; কাশীতে, ভাগলপুরে, কলিকাতা ও ঢাকাতে প্রায় এক মাস কাল আমার বিলম্ব হইল। রাস্তায় যে যে স্থানে, যে সকল অবস্থায় পড়িলাম, তাহা বিস্তারিত লেখা অনাবশ্যক। শ্রীবৃন্দাবনে গুরুদেবের দয়ায় ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, যে দেবদুর্লভ অবস্থা ভোগ করিয়াছিলাম, আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় পড়িয়া তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। কি প্রকার দুর্ঘটনায় কি ভাবে কতদূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাই স্মৃতিতে রাখিবার জন্য ঘটনার আভাসমাত্র সামান্যরূপে উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যের অদ্ভুত অবস্থা।

গুরুদেব যে দিন আমাকে ঋষিগণের আদরের পরম পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত দিলেন, সে দিন আমাকে তিনি কি যে করিলেন, তিনিই জানেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, আমি আর সেই মানুষ নাই। আমার সমস্ত দেহ মন অন্যপ্রকার হইয়া গেল, নিজের শরীরের প্রতি যখন আমি দৃষ্টি করিতাম, চর্ম্ম-মাংস বর্জ্জিত স্বচ্ছ কাচের দেহ মনে হইত। রাস্তা ঘাটে চলিতে ফিরিতে তুলার মত হাল্‌কা দেহটি যেন মাটির উপরে বায়ু অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, অনুভব করিতাম। উপবীত স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মচর্য্যের বৈদিক মন্ত্র আপনা আপনি স্মৃতিতে আসিয়া, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ঋষি' এইপ্রকার একটা ভাবের সঞ্চার করিয়া দিত। জপের সময়ে নামটি একটি সারবান্, সজীব শক্তিশালী মন্ত্র বলিয়া বোধ হইত। তাহাতে নূতন নূতন উল্লাস ও ভাবের তরঙ্গ অন্তরে প্রায় সর্ব্বদাই খেলিতে থাকিত। বহুকালের অভ্যস্ত কামিনীকল্পনা, প্রমোদবাসনা অজ্ঞাতসারে অন্তরে উদয় হইলে বিষম বিরক্তি জন্মিত, জ্বালা উপস্থিত হইত। শুধু শুদ্ধ দেহের অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করিয়াই, সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়া

পড়িতাম। ভাবিতাম 'এ কি হইল? গুরুদেব আমাকে এ কি করিলেন?' গুরুদেবের শ্রীচরণে বিদায়গ্রহণের পরেও, অনেক দিন তিনি আমাকে এই অপূর্ব্ব অবস্থা সম্ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। পরে, জানি না কেন, দয়াল ঠাকুর একটি ললনাকে সূত্র করিয়া, আমার অচল ব্রতের প্রলয় ঘটাইলেন; আমিও, ধীরে ধীরে নিস্তেজ, হীনপ্রভ হইয়া পড়িলাম।

প্রলোভনে অবিকার; অহঙ্কারে পতন।

মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা, এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার সেবার জন্য অবিলম্বে বাড়ীতে পৌঁছিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু বিধির পাকে, দুর্ম্মতিবশতঃ এদিকে সেদিকে মাসাধিক কাল ঘুরিয়া বেড়াইলাম। এই সময়ে কিছু দিন একটি পরিচিত লোকের ভবনে, আমায় অবস্থান করিতে হইল। তিনি উপর্য্যুপরি কতকগুলি অনর্থে উত্তেজিত হইয়া, উহার উপশম প্রয়োজনে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। ঘরে একটি স্ত্রীলোক মাত্র রহিলেন। চাকর চাকরাণী ব্যতীত অন্য পরিজন না থাকায়, কামিনীর তত্ত্বাবধানের ভার, বাবু আমারই উপরে রাখিয়া গেলেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হেতু সজনে, নির্জ্জনে নিঃসঙ্কোচে আমার সহিত উঁহাদের আলাপন, উপবেশন বহুকালযাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আমার আসন ও শয়নের স্থান উঁহাদের আগ্রহ ও জেদে ভিতরেই হইল। বেলা বারটা পর্য্যন্ত আমি নির্জ্জন সাধন ভজনে কাটাইতাম, রমণী তখন আপন গৃহকর্ম্মে রত থাকিতেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে, ভৃত্যবর্গ বাহিরে চলিয়া যাইত। কামিনী তখন একাকিনী এক ঘরে না থাকিয়া আমার ঘরে আসনের কিঞ্চিৎ অন্তরে শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম্মপ্রস্তাব তুলিয়া, সরলতার ভানে, নিজের আভ্যন্তরিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষম সঙ্কট সমস্যায় পড়িয়া, কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।

উঁহার কোন চেষ্টায়ই বাধা দিতে আমি সাহস পাইলাম না। মনে হইল এই অবস্থায় উঁহাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমার কোন বিরুদ্ধ ব্যবহারে, যদি উঁহার মর্ম্মে ও অভিমানে আঘাত পড়ে, এখনই যুবতী আমার নামে কুৎসিত কথা বলিয়া, চীৎকার করিয়া দশ জনকে একত্র করিবেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে অপদস্থ করিয়া চিরকালের মত আমার অখ্যাতি অপযশ দেশে বিদেশে রটনা করিবেন। এক দিবস আমি বিষম বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া, আতঙ্কে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুর কতবার বলিয়াছেন—'পুরুষ অভিভাবক উপস্থিত না থাকিলে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষণকালও, অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নয়।' মনে হইল ঠাকুরের এই অনুশাসন বাক্য, সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াই, আজ আমি বিপন্ন হইলাম। তখন গুরুদেবের অভয় চরণ স্মরণ করিয়া, পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিরিক্ত সাহসে বিষম চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া, অবশেষে 'ও হরি! তাই তুমি ব্রহ্মচারী!' বলিয়া সলজ্জ হাসিমুখে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি তখন স্পর্দ্ধিত মনে ভাবিতে লাগিলাম—'ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া, নিশ্চয়ই আমার অপূর্ব্ব শক্তিলাভ হইয়াছে; তাই ঈদৃশ ব্যাপারে আমি

নির্ব্বিকারে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি ; আমি যথার্থই সাধনরাজ্যের পিচ্ছিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, নিরাপৎ ভূমি লাভ করিয়াছি।' কিন্তু হায়, এই প্রকার অযথা অহঙ্কারের কয়েক দিন পরেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বুঝিলাম। ঘটনার সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে আমার ভিতরে আগুন লাগিল। বেড়াপাক বহ্নির কালধূমে, দুর্লভ ব্রহ্মচর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে অন্তর্হিত করিল। আমি পূর্ব্বের অপূর্ব্ব পবিত্র অবস্থা হইতে খলিত হইলাম। পরদিবসেই বাবুটি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমিও অমনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

স্বপ্নে গুরুজীর অনুশাসন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই, উপর্য্যুপরি কয়েকটি স্বপ্ন দেখিলাম। একটা স্থানে পরিচিত অপরিচিত বহুলোক একত্র হইয়াছি। গুরুদেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার পিছনে পিছনে চল।' আমি গুরুদেবের আদেশমত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিস্তৃত ক্ষেত্রে, ছাগল ও ভেড়ার বিচিত্র ক্রীড়া দেখিয়া এক একবার দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেব তখন পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া আমাকে তাড়া দিতে লাগিলেন। আমিও অমনি ছুটাছুটি করিয়া গুরুদেবের সঙ্গ ধরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রকারে আমি ঠাকুরের সহিত একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতে উঠিবার জন্য বহু গুরুভ্রাতা তথায় সমবেত আছেন দেখিলাম। গুরুদেব সেখানে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'তুমি এখানে থাক, আমি এখন যাই।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি কান্দিয়া ফেলিলাম, এবং খুব আকুলভাবে বলিলাম—'আমি আপনার সঙ্গেই এই পর্ব্বতে উঠ্‌বো, আমাকে আপনার সঙ্গে নিন্।' ঠাকুর আমাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'তুমি বিষম একগুঁয়ে ছেলে। যা ইচ্ছা তুমি তাই ক'রে থাক। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কি শেষকালে উৎপাতে পড়্‌বো ? এখানে কিছু কাল থাক ; সকলে যখন যাবে, তুমিও তখন যেও ; এখন আমার সঙ্গে পার্‌বে না।' এই বলিয়া গুরুদেব পাহাড়ে উঠিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, আমিও কান্দিতে কান্দিতে জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটি দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। খুব নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম। গুরুদেবের নিকটে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তখন এক দিন স্বপ্নে দেখিলাম—একটি স্থানে হরিসঙ্কীর্ত্তনের মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া বহু লোক ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। 'দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই' বলিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন। আমি ভাবিলাম—নিতাই পতিতপাবন, তাঁকে ডাকি। এই ভাবিয়া 'দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই' বলিতে বলিতে কান্দিতে লাগিলাম। এই স্বপ্নটি দেখিয়াও আমার প্রাণে শান্তি আসিল না, সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল—নিজের দোষেই দুর্লভ অবস্থা হারাইলাম। অনুতাপে ও ক্লেশে আমার সময় কাটিতে লাগিল। এক দিন খুব কাতরভাবে নিজের দুরবস্থা গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিয়া, শয়ন করিলাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম—অনেকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া গুরুদেব একটি মহাসঙ্কীর্ত্তনে চলিলেন। আমি

নিজের দুরবস্থায় ম্রিয়মাণ হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেব আমাকে বলিলেন—'চল, সঙ্কীর্ত্তনে যাই ; আজ কীর্ত্তনে তুমি বিশেষ কৃপা লাভ কর্‌বে।' আমি নিজেকে পতিত ভাবিয়া, করজোড়ে কাঁপিতে লাগিলাম। ঠাকুরের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন গুরুদেব আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার শরীর প্রস্তরবৎ কঠিন বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোলে উঠিয়া ঠাকুরের দেহ তুলার মত নরম, অনুভব করিতে লাগিলাম। সঙ্কীর্ত্তনস্থলে আমাকে কোল হইতে নামাইয়া বলিলেন, 'কিছু কাল তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি এখনই আবার আস্‌ছি।' এই বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমিও অমনি জাগিয়া পড়িলাম।

এই স্বপ্নটি দেখার পর, ঠাকুরের দয়া ভাবিয়া প্রাণে অনেকটা শান্তি পাইলাম ; কিন্তু গুরুদেবের অসাধারণ কৃপায় যে অদ্ভুত অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তাহা আর ফিরিয়া আসিল না। দাতা একমাত্র তিনি, তাঁর দয়ায় মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সেই অবস্থা আমার লাভ হইতে পারে—এই ভাবিয়া স্থির মনে সাধন ভজন করিতে লাগিলাম।

গুরুবাক্যে অনাস্থাহেতু দুর্দ্দৈব।

ফয়জাবাদ হইতে বাড়ী যাইবার সময়ে কাশীতে কয়েক দিন থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা হইল। এক দিন দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিব স্থির করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এক দিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"তীর্থে গিয়ে প্রথমেই তীর্থগুরু কর্‌তে হয়, তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডার সাহায্যে স্নান দর্শনাদি তীর্থের সমস্ত কার্য্য কর্‌তে হয়—ইহাই ব্যবস্থা।"

এই প্রকার ব্যবস্থার তাৎপর্য্য কি, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্যই ইহা শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থা, মনে হয়। শক্ত সমর্থের জন্য এইপ্রকার বাধ্যবাধকতার কিছু প্রয়োজন আছে, বোধ হয় না। ইহা ভাবিয়া এই সকল নিয়মপদ্ধতিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি স্নান করিবার জন্য দশাশ্বমেধে উপস্থিত হইলাম ; ঘাটে যাইয়া স্নানের উদ্যোগ করামাত্রই পাণ্ডারা আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কল্পমন্ত্র না পড়িলে দশাশ্বমেধে স্নান করিতে দিবে না বলিয়া, গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। আমি 'মন্ত্র তন্ত্র বুঝি না,' 'ঠাকুর দেবতা মানি না' বলিয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে রাস্তায় আবার পাণ্ডাদের মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। সামান্য দু'চার আনা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট মনে সুবিধামত আমাকে দর্শন করাইবে, বলিতে লাগিল। কেহ কেহ দু' চার পয়সার ফুল বিল্বপত্রের ডালি আমার সম্মুখে ধরিয়া, পয়সার জন্য বিরক্ত করিতে লাগিল। এসমস্ত পাণ্ডাদের শুধু পয়সা আদায়ের ফন্দি মনে করিয়া, সকলকে ধমক দিয়া বলিলাম—'অন্ধ, খোঁড়া, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করায়ে গিয়ে পয়সা আদায় কর। তাদের জন্যই পাণ্ডা, আমি নিজেই বেশ দর্শন কর্‌তে পার্‌বো। ফুল, বেলপাতায় অনর্থক পয়সা ব্যয় কর্‌বো না। তিনি

বিশ্বনাথ, তিনি কি আর ফুল বেলপাতায় প্রত্যাশী? বাজে খরচের জন্ত পয়সা নয়।' সকলেই আমার কথা শুনিয়া 'আরে রাম রাম' বলিয়া, সরিয়া পড়িল। আমি মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া লোকের ভিড় দেখিয়া অবাক্ হইলাম। অনেক চেষ্টায় ভিতরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু বহু লোকের ধাক্কায় পড়িয়া দেওয়ালের ধারে যাইয়া দাঁড়াইলাম। এত স্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠেলিয়া বিশ্বেশ্বরদর্শন, আমার পক্ষে অসম্ভব বুঝিলাম। তখন বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটি সুন্দরী যুবতী, সুযোগ পাইয়া লোকের গোলমালে নানা কৌশলে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি বিপৎ বুঝিয়া অতি কষ্টে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। বিশ্বেশ্বরদর্শন হইল না বলিয়া, মনে কোনও উদ্বেগ আসিল না; বরং বিষম উৎপাতে নিষ্কৃতি পাইলাম ভাবিয়া সন্তুষ্টই হইলাম। বাসায় যাইবার সময়ে ভাল ভাল কমণ্ডলু দেখিয়া একটি ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইল। মূল্য দিতে টাকার অনুসন্ধান করিয়া দেখি পকেট শূন্য। ভিতরের জামার উপরের পকেটে ৩৫৲ টাকা ছিল তাহার একটিও নাই। আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, যদি আট দশ আনা পয়সা পাণ্ডাদের হাতে দিয়া মন্দিরে যাইতাম, তাহা হইলে তাহারা আমার দর্শনের সুব্যবস্থা অনায়াসে করিয়া দিত। অন্য কোন উপদ্রবও আমাকে স্পর্শ করিত না, টাকাগুলিও এইভাবে হারাইত না। শাস্ত্রব্যবস্থার অমর্য্যাদা হেতু, ইহা আমার প্রতি গুরুদেবেরই অনুশাসন বুঝিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলাম। কাশীতে আমার থাকিতে আর উৎসাহ রহিল না; বিরক্তির নানাবিধ কারণ উপস্থিত হইল। আমি অবিলম্বে কাশী ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে পৌঁছিলাম। কিছুকাল তথায় যোগজীবনের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। পরে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মাণিকতলার মা।

কলিকাতা আসিয়া এক সপ্তাহ থাকিলাম। দাদা আমাকে মাণিকতলার মাতাজীর সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন; আমি দুইটি সমবয়স্ক বন্ধুকে লইয়া মাণিকতলায় মাতাজীর বাড়ীতে গেলাম। মাতাজীর স্বামী, দাদার পরিচয়ে আমাকে চিনিয়া, খুব আদরের সহিত সকলকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে মাতাজী ভাবাবেশে সমাধিস্থ ছিলেন। হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে করিতে করিতে ৫।৭ মিনিট পরে, তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমাকে কিছু জলযোগ করিতে বলিলেন। 'আমি প্রসাদ ব্যতীত কিছুই খাই না' বলাতে, মাতাজী কহিলেন 'মাটিতে স্পর্শ করায়ে খাও, তা হ'লেই মায়ের প্রসাদ পাওয়া হবে। মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে, সর্ব্বপ্রথমে এই মায়েরই আশ্রয় নিতে হয়েছে, মাটিই যথার্থ মা। এই মাকে নিবেদন ক'রে মাটিতে স্পর্শ করায়ে নিলে, বস্তুর অপবিত্রতা দোষ থাকে না।'

মাতাজী আমাকে নিজ হইতে অনেক উপদেশ করিলেন। আমি সেই সকল কথার কোন অর্থই বুঝিলাম না; তত্ত্বজ্ঞানের অতি দুর্বোধ্য বিষয় সকল, বিশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় দু' ঘণ্টা কাল অবাধে বক্তৃতা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার তেজঃপূর্ণ ভাষার যোজনা, শব্দের

পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম। মাতাজীর বক্তৃতা শেষ হইলে পর বলিলাম, আপনি এতক্ষণ কি যে বলিলেন, কিছুই বুঝিলাম না। মাতাজী কহিলেন—'তোমাকে দেখিয়া ভিতরে একপ্রকার ভাব হ'লো ; আপনা আপনি যাহা এসেছে, বলে ফেলেছি। কি যে বলেছি, তাহা আমিও জানি না। যাহা বলা গেল, সেই সকল অবস্থা তোমার যখন লাভ হবে, তখন তুমি আমার এসব কথা স্মরণ করবে। মনে হতেছে তুমি গোঁসাইয়ের শিষ্য। সেই ছেলে সাধারণ নয়। যাহারা তাঁহার আশ্রয় পেয়েছে, তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়েছে ; এটি নিশ্চয় জেনে রেখো, শিষ্যদের ভিতরে তিনি নিত্যধাম প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন ; যে ভাবে ইচ্ছা চল, সময়ে তিনি সমস্তই ক'রে নিবেন।

মাতাজীর কথা শুনিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরের মুখে মাতাজীর অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। বিনাসাধনে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারগুণে অনেকগুলি অদ্ভুত শক্তি ইঁহার স্বতঃই লাভ হইয়াছে। প্রায় দশবৎসরযাবৎ আহার ত্যাগ করিয়া সুস্থশরীরে রহিয়াছেন। রূপের উজ্জ্বলতা ও মুখের প্রভা দেখিয়া, ইঁহার দেহে, কোন দেবীর আবির্ভাব বলিয়া সকলে মনে করেন। মাতাজীর অসাধারণ স্নেহ মমতায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

হরিচরণ বাবু ও লালের অনুশোচনা।

কলিকাতা হইতে আসিয়া, ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে এক সপ্তাহ কাল রহিলাম। ভজননিষ্ঠ সংসারত্যাগী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগ্‌চী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইলাম। ঢাকার সকল গুরুভ্রাতার সহিতই আমার দেখা সাক্ষাৎ হইল। এক দিবস শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি না, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—শুনিয়াছি আপনারা ৩।৪টি গুরুভ্রাতা ঠাকুরের আদেশ অমান্য করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গ করার ফলে, বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ; তাঁর উপদেশ অনুসারে অদ্বৈতবাদ এবং প্রারব্ধ সংস্কারে জড়িত হইয়া, সাধন ভজন ত্যাগ করিয়াছেন ; গুরুদেবের প্রদত্ত সাধনে আপনাদের পূর্ব্ববৎ নিষ্ঠা, ভক্তি কিছুই নাই ; বরং এই সাধনের বিরোধী হইয়াছেন। তাই ঠাকুর কথায় কথায় এক দিন বলিলেন—'ইঁহারা যদি এখন হইতে নিয়ম মত সাধন করেন, তা হ'লে ৫।৬ বছর পরে হয় ত, পূর্ব্বের অবস্থা আবার লাভ করতে পারেন। না হ'লে এবার এই ভাবেই যেতে হবে।'

হরিচরণ বাবু বলিলেন—গোঁসাই ঠিক কথাই বলেছেন। দীক্ষাগ্রহণ ক'রে তাঁর কৃপায় যে অপূর্ব্ব অবস্থা ভোগ করেছি, তা আর নাই ; ব্রহ্মচারীর সঙ্গ করাতেই সেই অবস্থা হারিয়েছি। আহা! গোঁসাই দয়া ক'রে কি আনন্দেই রেখেছিলেন। কত দর্শনাদি হ'ত ; সে সব স্বপ্ন মনে হয়। এখন সে সকল বিষয় মনে ক'রে দিন রাত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। আবার গোঁসাই আমাকে কৃপা করবেন ত ? এই বলিয়া হরিচরণ বাবু কান্দিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যশালী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত লালবিহারীর সহিত আমার খুব মেলা মেশা হইল। সর্ব্বদা দু'জনে একসঙ্গেই থাকিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এক দিন লাল, আমাকে গেণ্ডারিয়ার নির্জ্জন জঙ্গলে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ভাই, গুরুজীর ওখানে আমার কথা কিছু হ'য়েছিল, কি? যাহা জান গোপন না ক'রে আমাকে সমস্ত খুলে বল।' আমি লালের সম্বন্ধে যে সকল কথা হইয়াছিল, পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। লাল শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'যথার্থই ব'লেছ, সেই সময়ে নিয়ত যে ব্রহ্মজ্যোতি আমার নিকট প্রকাশিত ছিল, তখন থেকে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। শক্তির কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা ছেড়ে দাও, এখন ও সব কিছুই নাই; এখন আত্মরক্ষাও অসম্ভব হয়েছে। দিনরাত অনুতাপে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছি। আহা! গোঁসাই আমাকে কত সাবধান করেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর কথা গ্রাহ্য করি নাই; তাঁর নিকট হ'তে আস্‌বার সময়েও আমাকে তিনি বলেছিলেন—"লাল! সম্পূর্ণ উত্তাপ-শূন্য হ'লে, বহু বিলম্বে মৃত্তিকার ঘাসে, চন্দ্র কিরণ প'ড়ে এককণা শিশির বিন্দু জন্মে; কিন্তু অভিমান-সূর্য্যের প্রকাশমাত্রে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা একেবারে শুকায়ে যায়; খুব সাবধানে থেকো।" আমি তখন গোঁসাইয়ের কথা বুঝি নাই, যাহা হউক আমার আর তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? ঐ সকল অবস্থা আমি ত আর সাধন ভজন ক'রে, পরিশ্রম ক'রে লাভ করেছিলাম না; তাঁর বস্তু, তিনি কৃপা করে দিয়েছিলেন, ভোগ করেছি। এখন তাঁর জিনিস তিনি নিয়েছেন; আমি আগে যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি।' লাল এই প্রকার অনেকক্ষণ আক্ষেপ করিলেন; পরে আমরা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

ছোট দাদার (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) মুখে মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলাম। ছোট দাদারও শরীর অতিশয় কাতর দেখিলাম। এবার তিনি 'বি, এ' পরীক্ষা দিবেন। রুগ্নদেহে অতিরিক্ত পড়াশুনা করিয়া, এখন বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পরীক্ষা দিতে পারিবেন কি না ভাবিয়া, সময়ে সময়ে বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন। ছোট দাদার কথামত আমি বাড়ী চলিলাম।

আমার দৈনন্দিন কার্য্য। মাতৃ-সেবায় অশেষ কল্যাণ লাভ।

বাড়ীতে আসিয়া মাকে অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় দেখিলাম। পিত্তশূল বেদনা এবং আমাশয়াদি রোগে বার্দ্ধক্যাবস্থায়, মা'র শরীর অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দিবানিশি রোগের যন্ত্রণায় অবসন্ন থাকিয়াও, বৃহৎ-সংসারের সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ এবং নিজের আহারের যাহা কিছু আয়োজন, মাকেই করিতে হয়। মা, অচল না হইলে, অপরের সেবা গ্রহণ করেন না। মা'র দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই লাগিল। সংসারের যাবতীয় ভার এবং মা'র সেবা শুশ্রূষার যাহা কিছু কার্য্য, আমিই গ্রহণ করিলাম।

অগ্রহায়ণ, ১২৯৭।

আমার বহুকালের পিত্তশূল বেদনা এবং বায়ুরোগ একেবারে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। শরীর বেশ সবল ও সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া, মা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিসে তোর এই রোগ সেরে গেল ?' আমি রোগের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন ঠাকুরের কৃপায়, যে ভাবে আমি রোগমুক্ত হইয়াছি এবং রক্ষা পাইয়াছি মাকে বিস্তারিতরূপে বলিলাম। আমার 'ব্রহ্মচর্য্য' গ্রহণের কথাও মাকে পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম। মা সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। গোঁসাই তোর জীবন রক্ষা করেছেন বলিয়া, মা কাঁদিতে লাগিলেন। মা কহিলেন—'এমন গুরু যখন পেয়েছিস্, তখন তাঁকে ছেড়ে আর এলি কেন ? তাঁর সঙ্গে থাক্‌লে তোর আরও উপকার হ'তো।' আমি বলিলাম, তিনি আমাকে 'তোমারই সেবা করিতে বাড়ীতে পাঠায়েছেন।' আমার প্রতি গুরুর আদেশ শুনিয়া, মা বলিলেন—'বেশ, গুরুর আজ্ঞামত তুই আমার সেবা কর্।' মা'র আদেশ পাইয়া, আমি সমস্ত কার্য্যেরই একটা নিয়ম বাঁধিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমি প্রতিদিন শেষরাত্রে আসন হইতে উঠিয়া শৌচান্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করি ; পরে নির্জ্জন ঘরে আপন আসনে বসিয়া সাধন সমাপনান্তে, তিল, তুলসী, কুশোদকে, কখনও বা পঞ্চামৃতে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে গো-শৃঙ্গজলে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, মা'র নিকট উপস্থিত হই। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি ; মা তাঁর পা দুইটি আমার মাথায় তুলিয়া দিয়া, পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করেন—'তোর মনস্কামনা পূর্ণ হউক, সুখে থাক্।' আমি মনে মনে প্রার্থনা করি—'আমার সেবায় তুমি আরোগ্যলাভ কর ; তোমার তৃপ্তি হউক, আর আমার গুরুদেব আনন্দলাভ করুন।' মা যখন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া, পরম স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন, তখন আমার সমস্ত শরীর শীতল হইয়া যায়। ভিতরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে থাকে, আমি ধন্য হইলাম মনে হয়। মায়ের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর, আসনে বসিয়া বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সাধন ভজন করি। এ সময়ে মা, আমার ঘরে আসেন। গুরুগীতা, ভগবদ্গীতা ও সূর্য্যস্তবাদি মাকে পাঠ করিয়া শুনাই। ১০টার সময়ে মা'র জন্য রান্না করিতে যাই ; মাও তখন আহ্নিক করিতে বসেন। মায়ের পূজা ও জপ হইতে হইতে, আমারও রসুই হইয়া যায়। মাকে তখন আবার নমস্কার করিয়া, চরণামৃত গ্রহণ করি। মা শিবের মাথায় ফুল বিল্বপত্র দিয়া, নমস্কার করিতে করিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলেন—'ঠাকুর! ওর মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ কর।' পূজা শেষ করিয়া মা আহার করিতে বসেন ; মাকে খাবার দিয়া, আমিও মা'র সম্মুখে প্রসাদ পাইতে বসি। মা আহার করিতে করিতে যাহা ভাল লাগে, নিজে কম খাইয়া আমার পাতে ফেলিয়া দেন। পরমানন্দে মায়ের হাতে, মায়ের প্রসাদ পাইতেছি ; আমার রান্নাবস্তু খাইয়া মা প্রত্যহই খুব সন্তোষ লাভ করিতেছেন ; মায়ের তৃপ্তি দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হয়, বলিতে পারি না। এই সময়ে আমার দয়াল ঠাকুরের কথাই স্মরণ হয় ; তাঁরই কৃপায় আমার এই শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। আহারের পর গুরুদেবের শান্তিপ্রদ অভয়চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসি।

বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত নির্জ্জনে বসিয়া নাম করি। মা এই সময়ে বিশ্রাম করেন। ৩টার সময়ে মা, আমার আসন-ঘরে আসিয়া বসেন। তখন আমি মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণ পাঠ করিয়া মাকে শুনাই। এই সময়ে পাড়ার আরও অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ আসিয়া পাঠ শুনিতে থাকেন। বেলা ৫টা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, আসন হইতে উঠি। তখন সংসারের হাট বাজার, হিসাব পত্র লেখা ইত্যাদি যাহা কিছু কার্য্য করিয়া থাকি। সন্ধ্যার সময়ে মাকে নমস্কার করিয়া দু' চারটি সমবয়স্কের সঙ্গে ভগবানের নাম গান করি। পরে মায়ের নিকটে উপস্থিত হই। রাত্রে মা আমারই জন্য, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমাকে প্রসাদ দেন। মা শয়ন করিলে, কখন কখন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করিয়া দেই। মা, কিছু সময়ের জন্য আমাকে বুকে জড়াইয়া শুইয়া থাকেন এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া, মাথায় ফুঁ দিতে দিতে, পেটে পুনঃ পুনঃ টোকা মারিয়া, রক্ষা মন্ত্র পড়িতে থাকেন। মায়ের স্পর্শে আমার শরীর ও মন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মায়ের স্নেহ দেখিয়া, এই সময়ে আমি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দি। নিদ্রাবেশ হইলে নিজের আসন-ঘরে আসিয়া শয়ন করি। কখনও বিছানায়, কখন বা আসনেই কাত হইয়া পড়িয়া থাকি। রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে হাত মুখ ধুইয়া, ধুনি জ্বালিয়া, সাধন করিতে বসি। শেষরাত্রি পর্য্যন্ত নাম করিতে করিতে ভাবাবেশে, কখনও বা তন্দ্রাবেশে, আমার সময় কাটিয়া যায়। গুরুদেব আমাকে কত যে আনন্দে রাখিয়াছেন, প্রকাশ করিতে পারি না।

বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিদিন একই নিয়মে, সাধন ভজনে, মাতাঠাকুরাণীর সেবায়, আমার সময় অতিবাহিত হইতেছে; নিত্য নূতম নূতন উৎসাহ-আনন্দে, সাধন ভজনের স্পৃহা আমার বৃদ্ধি পাইতেছে। রাত্রি শেষে মনে হয়—কতক্ষণে সূর্য্য উদয় হইবে, কতক্ষণে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া মায়ের চরণধূলি মস্তকে লইব; তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন; কতক্ষণে মায়ের চরণামৃত পাইব; সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি মাকে রান্না করিয়া খাওয়াইব। বিশেষ বিশেষ পূজা উৎসবের দিনে, সকলের মনে, সূর্য্যোদয় হইতেই, যেমন একটা উৎসাহ আনন্দ প্রাণে খেলিতে থাকে, প্রতিদিনই, দিবসের প্রারম্ভে, আমার ভিতরে সেই প্রকার একটা উচ্ছ্বাস আনন্দের তরঙ্গ উপস্থিত হয়। গুরুদেবের অসীম কৃপাগুণে, মাতাঠাকুরাণীর প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ লাভে যথার্থই আমি কৃতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম! আমার প্রতি ঠাকুরের এই অসাধারণ দয়া, সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, নির্জ্জনে চীৎকার করিয়া কান্দিতে ইচ্ছা হয়; গুরুদেব যখন দয়া করেন, সমস্তই তখন অনুকূল হয়। মাতৃ-সেবার কথা শুনিয়া, দাদারা সন্তুষ্ট মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাকে লিখিতেছেন—'সাধন ভজনে তোমার উন্নতি হউক, তুমি সুখে থাক।' আত্মীয় স্বজন, অভিভাবকগণ, পূর্ব্বে যাঁহারা আমার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এখন তাঁহারাও আমার উপরে পরম সন্তুষ্ট; গ্রামবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরাও, আমার দৈনিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন। ব্রাহ্ম বলিয়া, এতকাল আমার উপরে যাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল, তাঁহারাও এখন আমার সঙ্গে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আনন্দলাভ করিতেছেন। সজ্জন

গুরুজনের স্নেহ মমতা ও আশীর্ব্বাদ গুণে, নিত্য নূতন উৎসাহ-উদ্যমে, সাধন ভজন করিয়া ভিতরে একটা অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করিতেছি। পরম আনন্দে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

গুরুকৃপার অলৌকিক নিদর্শন। ছোট দাদার রোগমুক্তি।

আমি পরিষ্কার অনুভব করিতেছি, সদ্‌গুরুর কোন একটি সামান্য আদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করিলেও, তাহাই সূত্র আকারে পরিণত হইয়া, বহুদূরবর্ত্তী শিষ্যের চিত্তকেও, তাঁহার অনন্ত মহান্ ভাবের সহিত যোগ করিয়া রাখে। এই সূত্র, মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্ম হইলেও, উহাই অবলম্বন করিয়া, গুরু-কৃপার প্রবল ধারা, তড়িত প্রবাহের মত বেগে আসিয়া, শিষ্যের অন্তরে সঞ্চরিত হয়। গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, ইহা নিয়ত মনে হওয়াতে, গুরুদেব আমার প্রতি প্রসন্ন, এইরূপ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইতেছে। গুরুদেব আমার প্রার্থনা শোনেন, কাতরভাবে বলিলে বা জেদ করিয়া আবদার করিলে, তাহা তিনি পূর্ণ করেন; এইরূপ সংস্কার প্রাণে আসিয়া পড়িতেছে, এবং তাহারই ফলে নিজের উপরে অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কয়েকটি ঘটনাতে, এ বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইলাম; তাহার দুই চারিটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

কিছুদিন হয় ছোট দাদার পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—'হঠাৎ বুকে বেদনা হইয়া তিন দিন শয্যাগত আছি। পড়াশুনা আর করিতে পারিতেছি না; ভয়ানক যন্ত্রণা সর্ব্বদা ভোগ করিতেছি। পরীক্ষা নিকট; এক একদিনে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, এবার আর বুঝি পাশ করিতে পারিব না। তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও।' ছোট দাদার পত্রখানা পড়িয়াই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'গুরুদেব! ছোট দাদার দেহের যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারি না; অচিরে তাঁর রোগটি তুমি দয়া করিয়া আমার ভিতরে সঞ্চার করিয়া দাও। আমি অবিচলিত মনে, সন্তুষ্ট প্রাণে, রোগ শেষ পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিব।' এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেবকে স্মরণ করিলাম; পরে, উদ্যমের সহিত প্রাণায়ামের প্রতিদমে, রোগকল্পনায়, বায়ু আকর্ষণ করিয়া, রেচকের সহিত নিজের স্বাস্থ্য ছোট দাদার রুগ্নদেহে সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলাম। এই প্রকার অনন্যমনে, প্রাণপণে ধ্যান ও প্রাণায়াম করিতে করিতে বুকে আমার বেদনার অনুভব হইল। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রণার ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল; তখন অন্তরে উৎসাহ পাইয়া, আগ্রহসহকারে পুনঃপুনঃ কুম্ভকপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত উহা চাপিয়া, বুকে ধারণ করিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যেই ঠাকুরের ইচ্ছায়, অসহ্য যন্ত্রণায়, শরীর আমার অবসন্ন হইল। আমি অমনই জয় গুরু, জয় গুরু, বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। তখনই ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম। যে দিন যে সময়ে আমার ভিতরে এই রোগের সঞ্চার হইল, ছোট দাদাকে পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম। ছোট দাদার জবাবে জ্ঞাত হইলাম, সেই দিন ঠিক সেই সময়েই, তাঁহার বেদনা কমিয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া! অধিক দিন এই পীড়া, আমার ভুগিতে হইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ছোট দাদার বি, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইল; পরীক্ষার তিন দিন পূর্ব্বে, ছোট দাদা ভয়ানক জ্বরে শয্যাগত হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি সোমবার বেলা ৯টার সময়ে কোন প্রয়োজনে জৈনসার গ্রামে চলিয়াছি, রাস্তায় ছোট দাদার পত্রখানা পাইলাম। বুঝিলাম, ঐ দিনই ছোট দাদার পরীক্ষা আরম্ভ। রোগমুক্ত হইয়া ছোট দাদা হয় ত পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, এই চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; জৈনসার যাওয়ার অর্দ্ধপথে, একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলে, আমি বসিয়া পড়িলাম; ছোট দাদার আরোগ্য লাভ এবং পরীক্ষার শুভফলের জন্য ব্যাকুল হইয়া, ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল একই অবস্থায় আকুল প্রাণে কাঁদিলাম; বিপদ ঘটিল মনে করিয়া, নিরুপায় হইয়া, ঠাকুরকে সব জানাইলাম। এই সময়ে ভিতরের ক্লেশে, হাহুতাশে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম; কিঞ্চিৎ পরেই ঠাকুরের কৃপায়ই বুঝিতে পারিলাম—'ঠাকুর ছোট দাদাকে দয়া করিবেন! ছোট দাদা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষাতে ছোট দাদা নিশ্চয় পাশ হইবেন।' আমি অমনি উঠিয়া জৈনসার গ্রামে চলিয়া গেলাম। তখনই পোষ্টাফিসে বসিয়া, ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম—'কোন চিন্তাই করিবেন না, গুরুদেব আপনার কল্যাণ করিলেন। নিশ্চয় পরীক্ষায় পাশ হইবেন। জ্বর বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে; কেমন আছেন লিখিবেন।' ছোট দাদা আমার পত্রের উত্তরে জানাইলেন—"পরীক্ষার দিনই (সোমবারে) পথ্য পাইয়া, অতি কষ্টে পরীক্ষা দিতে চলিলাম; রাস্তায় অকস্মাৎ আমার ভিতরে একটা তেজ যেন প্রবেশ করিল; আমার আর কোন অসুখ নাই; ভগবানের দয়ায় পরীক্ষা ভালই দিয়াছি।" ছোট দাদার পত্র পাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; গুরুদেবের অপরিসীম কৃপা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

প্রকৃতিপূজায় দুর্দ্দশা। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় দান।

বাড়ীতে আসিয়া, গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি যথামত প্রতিপালন করিয়া, সাধন ভজনে দিন রাত কাটাইতে লাগিলাম। গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং মুরুব্বিগণ, যাঁহারা এতকাল আমার উপর ব্যবহারিক অনাচারে বিষম বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাও শতমুখে আমার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। ভদ্র, অভদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকল লোকই আমাকে সদাচারী, চরিত্রবান, ভজননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দূর গ্রামবাসী এবং পাড়াপড়্‌সিগণও আমাকে তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক এবং সাংসারিক নানাপ্রকার দুরবস্থার ও দুর্ঘটনার কথা জানাইয়া, আশীর্ব্বাদ চাহিতে লাগিলেন; ভগবানের কৃপায় কেহ কেহ উৎকট রোগে, আপদে বিপদে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অযথা আমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আমার প্রচুর প্রশংসা প্রচার হইয়া পড়িল। আমার প্রতি গুণারোপ নিতান্তই অনর্থক, এইসব ব্যাপারে আমার কোনই সংস্রব নাই, ইহা পরিষ্কার জানিয়াও, সাধারণের স্তুতিবাদ আমার ভালই লাগিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দেখিতে লাগিলাম, যাঁহাদের ক্লেশ আমার প্রাণে স্পর্শ করে,

যাহাদের বিপদে আমি অভিভূত হই, আমি তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিলে, ঠাকুর তাঁহাদের শুভ করেন, উৎপাতের শান্তি করেন। এই সকল দেখিয়া আমার মনে হইল—কড়ায় গণ্ডায় নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছি, ভজন সাধনে দিনরাত অতিবাহিত করিতেছি। দশজনেও আমার চরিত্রের এবং অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন; সুতরাং সত্য সত্যই আমি ধন্য হইয়াছি। এই প্রকার ভাব অন্তরে আসাতে, নিজের উপরে আমার অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মিল; ভাবিলাম ঠাকুরের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কণিকা, আমার ভিতরে সঞ্চরিত হইয়াছে; তাঁহার অসাধারণ কৃপায় এবার আমি যথার্থই নিরাপৎ হইয়াছি। এইরূপ সংস্কারে আমি ধীরে ধীরে গর্ব্বিত হইয়া পড়িলাম; স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ করিয়া সকলেরই সহিত নির্ভয়ে মিশিতে লাগিলাম। আমার চরিত্রে সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাস হওয়াতে নিঃসঙ্কোচে যুবতীরাও স্বেচ্ছামত সজনে নির্জ্জনে আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই আপন আপন প্রাণের কথা আমাকে বলিয়া আরাম পাইতে লাগিলেন।

এক দিন একটি পরমা সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা ব্রাহ্মণকন্যা কাঁদ কাঁদ স্বরে আমাকে আসিয়া বলিলেন—"ভিতরের অসহ্য জ্বালা আর আমি সহ্য করিতে পারি না, তোমাকে মনে পড়িলেই আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়। ভোগের লালসায় অস্থির হইয়া পড়ি। আমার এই কামনার পরিতৃপ্তি কর।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—'এক সময়ে তোমার উপরেও আমার ভয়ানক লোভ ছিল। গুরুদেব তাহা এখন শান্তি করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি; চিরকালের জন্য ওসব কার্য্যে বঞ্চিত হইয়াছি। যুবতী বলিলেন—"তা হ'লে আমার এইভাব যাহাতে নষ্ট হয়, তাহার উপায় ব'লে দাও, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।" উঁহার ক্লেশের কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই লাগিল। আমি উঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—'তুমি নিশ্চিন্ত হও, নিশ্চয়ই আমি তোমার শান্তির ব্যবস্থা করিব।'

এই ঘটনার পরে, যুবতী সুবিধা পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া বসিতেন; আমিও তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রসঙ্গের নানা দৃষ্টান্তে, সংযমের উপদেশ করিতাম। কিন্তু অবসর পাইলেই, তিনি কাতরভাবে তাঁহার অসহ্য জ্বালার নিবৃত্তির উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদিও কামোন্মত্তা কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে দেবদুর্লভ ব্রহ্মচর্য্যের অতুলনীয় অমৃতফল, ইতিপূর্ব্বেই আমি হারাইয়াছিলাম, তথাপি বর্ত্তমানে গুরুর কৃপায় কামশূন্য অচঞ্চল অবস্থায় অতিরিক্ত গর্ব্বিত থাকাতে, আমি ভাবিলাম— শুনিয়াছি বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে, নির্ব্বিকার কামশূন্য অবস্থায়, কোন ব্যক্তি প্রকৃতির প্রতিমন্দিরে মহাশক্তির পূজা করিলে, তাহাতে কামিনীর কামের উপশম হয়, এবং উপাসকেরও প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা হয়। ভাল, আমি তাহাই করি না কেন? যুবতীর অঙ্গস্পর্শ করিতেই আমার নিষেধ, কিন্তু দূর হইতে পূজা করিতে আর দোষ কি? আমি এই প্রকার স্থির করিয়া, তাঁহাকে আমার সঙ্কল্প জানাইলাম; রমণী সন্তুষ্ট মনে সম্মতা হইলেন।

মাঘ মাসের কোন এক পবিত্র তিথিতে, বিশেষ একটি কার্য্য উপলক্ষে, পাড়ার সমস্ত লোকই

আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। ঐ দিনই, এই কার্য্যের প্রশস্ত দিন মনে করিয়া, আমি সঙ্কল্প অনুসারে শক্তিপূজার আয়োজন করিলাম। যজ্ঞ কাষ্ঠ সমেত ঘৃত, বিল্বপত্র, অতসী, জবা, অপরাজিতা, ধূপ, ধূনা ও চন্দনাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে যুবতীর নিকট উপস্থিত হইলাম; সঙ্কেত মাত্র অভিপ্রায় অবগত হইয়া, হৃষ্টমনে তিনি আমার অনুগামিনী হইলেন; জনপ্রাণী শূন্য কোন এক নিভৃত স্থানে অবিলম্বে আমরা পৌঁছিলাম। পরে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, কামিনীকে কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিতে বলিলাম। তৎপরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, স্থিরমনে কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ করিলাম। অতঃপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, একান্তভাবে নিজ ইষ্টরূপ, প্রদীপ্ত হুতাশনে ধ্যান করিতে লাগিলাম। তখন জবা, অপরাজিতা এবং বিল্বপত্র ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া, সাবিত্রীমন্ত্রে কয়েকবার অগ্নিতে আহুতি দানে, হোম সমাপন করিলাম। পরে করজোড়ে ঠাকুরের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—গুরুদেব! আজ আমি বিষম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, এখন আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, মনোমুখী, মোহযুক্ত, তোমার অভিপ্রায় কি, কিছুই আমি বুঝিতেছি না; তোমাকে আহ্বান করিলে তাহা তুমি জানিতে পার, তোমাকে কিছু বলিলে তাহা তুমি শুনিয়া থাক, তাই ঠাকুর, আজ তোমাকে ডাকিতেছি, তোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি; এ অবস্থায় যাহা কল্যাণকর তাহাই ব্যবস্থা কর। প্রকৃতি পূজা করি, ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, অকস্মাৎ কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটাইয়া এ চেষ্টায় আমাকে বাধা দাও; আরও পাঁচ মিনিট কাল আমি অপেক্ষা করিব। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে, সঙ্কল্পমত শক্তি-পূজায় প্রবৃত্ত হইব। এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া,একান্ত মনে ঠাকুরের পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। পাঁচ সাত মিনিট নির্ব্বিঘ্নে অতীত হইল; এই সময়ে অধারা রমণীকে, তিন চার হাত দূরে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে বলিলাম। কামিনী আমার ইঙ্গিতানুসারে প্রহৃষ্ট অন্তরে অমনি উলঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন দেবীর অভীপ্সিতা অতসী, অপরাজিতা, জবা, বিল্বদল অঞ্জলি পূরিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম। পরে চণ্ডীর 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, শান্তিরূপেণ সংস্থিতা,' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠনান্তর পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থিরভাবে মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—অকস্মাৎ উঁহার নাভিস্তর হইতে উরুদ্বয়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত, গোলাকৃতি নিবিড় কাল ছায়ায় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িল; মধ্যাহ্নে প্রশস্ত সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। আচম্বিতে গৌরাঙ্গীর অঙ্গবিশেষে মহাকালীর আবির্ভাব হইল। বহুক্ষণ বারংবার দৃষ্টি করিয়াও, ঘন কৃষ্ণ বর্ণের অন্তরালে দীপ্তিময়ী কাল বিজলীর ঝিকিমিকি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। মস্তকের পুষ্পাঞ্জলি, ভগবতীর চরণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িলাম। অদ্ভূত ভগবান গুরুদেবের লীলা! অদ্ভূত ভগবতী যোগমায়ার খেলা! কি দেখাইলে! কি দেখিলাম! স্তম্ভিত হইয়া আসনে বসিলাম। অবাক

হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। তখন দেখিলাম—রমণীর গৌর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে ; কুঞ্চিত নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছেন। উঁহার পানে তাকাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। উঁহার চঞ্চল কটাক্ষে, তড়িৎ বেগে আমার ভিতরে কামোত্তেজনায় সঞ্চার হইল। বিচলিত অবস্থায় শঙ্কট ভাবিয়া অবিলম্বে উঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলাম। যুবতী আমার কথায় বাক্যব্যয় না করিয়া হোমাগ্নিকে প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিলাম—'আমার যা হবার হোক্, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' অবিলম্বে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বস্ত্র পরিধানান্তর নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। যুবতী চলিয়া গেলে পর, আমার ভিতরে অদম্য কামের উত্তেজনা আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম, কুম্ভকাদিতে উত্যক্ত ভাবের শান্তি করিতে অকৃতকার্য্য হইলাম। অমনি বিপত্তি বুঝিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

এই দুঃসাহসিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার দুর্দ্দশার একশেষ আরম্ভ হইল। ভগবান গুরুদেবের অভিপ্রায় কি, জানি না। যুবতীর কাম বিকারের সম্পূর্ণ বিরাম হইল বটে, কিন্তু দিন দিন আমি কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। বোধ হয়, পরম দয়াল গুরুদেব অবলার অপূর্ব্ব সরলতা অবলোকন করিয়া, তাঁহার জ্বালার শান্তি করিলেন, এবং আমার বিষম দুরন্ত অনুষ্ঠানে, অতিরিক্ত স্পর্দ্ধা ও হঠকারিতা দেখিয়া, কামপীড়িতা কামিনীর কামভাব আমার ভিতরে সঞ্চরিত করিলেন। আমি অহর্নিশি কামাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলাম। কিসে যে এ জ্বালার শান্তি হয়, কি উপায়ে এ বিপদে রক্ষা পাই, সর্ব্বদা কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে স্থির করিলাম—অস্থি মজ্জা অঙ্গার করিয়া কঠোর সাধন করিব। সেই অনুসারে আমি পরিমিত আহারের (এক 'থাবা' অন্নের) এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া ফেলিলাম। আহারের চেষ্টায় সামান্য সময় ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট কাল নির্জ্জন জঙ্গলে যাইয়া, সাধন করিতে লাগিলাম। শয়ন একেবারে ত্যাগ করিলাম ; নিদ্রা এক প্রকার উঠাইয়া দিলাম। সম্মুখে ধুনি জ্বালিয়া, প্রাণপণ সাধনে রাত্রি শেষ করিতে আরম্ভ করিলাম। তন্দ্রাবেশের উপক্রম দেখিলে, একপদে দাঁড়াইয়া, কখন বা পদচালনা করিয়া, নাম করিতে করিতে রাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। অতিশয় নিদ্রাবেশ হইলে, কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতাম। তিন বেলা স্নান, অম্ল, কটু, মধুরাদি রস ত্যাগ, এবং লোক-সঙ্গ বর্জ্জনাদি, সমস্তই খুব কঠোর ভাবে করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার অহেতুকী উত্তেজনার অনেকটা উপশম হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা কিছুতেই আর ফিরিয়া আসিল না। আচম্বিতে, অতীত ঘটনার ছবি অন্তরে উদিত হইয়া, আমাকে অস্থির করিতে লাগিল ; আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। চারি দিক শূন্য দেখিলাম ; ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত আমার আর নিস্তার নাই বুঝিয়া, গুরুদেবকে এই কয়টি কথা লিখিয়া জানাইলাম—

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীগোস্বামী মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলেষু।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে আপনার আদেশমত অযোধ্যায় যাইয়া তথায় প্রায় দুই মাস কাল ছিলাম। পরে বাড়ী আসিয়া এতদিন বাড়ীতেই কাটাইলাম। এতকাল বেশ আনন্দেই ছিলাম। আজকাল আমার

অবস্থা সমস্তই আপনি দেখিতেছেন, সুতরাং লিখিয়া আর লাভ কি ? এ সময়ে আমার যাহা করিতে হইবে, অবিলম্বে জানাইবেন। আমার মনের উপরে এখন আর আমার কোনও অধিকার নাই। দয়া করিয়া এ সময় রক্ষা করিতে হয় করিবেন। আপনি রক্ষা না করিলে, এ সময়ে আর আমার কোনও ভরসা নাই। ব্রহ্মচর্য্য, আপনারই বাক্যে, আপনারই দয়া ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, লইয়াছি। এখন ব্রত নষ্ট হইলে, আমি দায়ী নহি। আমার প্রকৃতি পূর্ব্বে জানিয়াই তো এই ব্রত দিয়াছেন।

সেবক

শ্রীকুলদা।

পত্রখানা লেখার পরই, শ্রীবৃন্দাবন হইতে একেবারে ৪ খানা চিঠি আমার নিকট আসিয়া পড়িল। স্বামিজী হরিমোহন লিখিলেন—"ভাই, গুরুজী তোমার পত্রখানা পড়িয়া অমনি হাত নাড়িয়া—'মা ভৈঃ ! মা ভৈঃ। মা ভৈঃ।' উচ্চৈঃস্বরে তিন বার বলিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা' বলিয়া তোমাকে অভয় দিয়া, পত্র লিখিতে কহিলেন ; তোমার জ্ঞাতকারণ লিখিলাম। নির্ভয় হও।"

যোগজীবন লিখিলেন—"গোঁসাই তোমাকে লিখিতে বলিলেন—'যদি বাড়ী থাকতে অসুবিধা বোধ কর, সময়ে সময়ে গেণ্ডারিয়ায় যাইয়া থাকিবে। ব্যস্ত হইও না। আমরাও শীঘ্র যাইতেছি।"

এই প্রকার শ্রীধর এবং মাঠাকরুণও লিখিলেন—"তোমার প্রতি গোঁসাইয়ের অসীম কৃপা। কোন চিন্তাই নাই। নির্ভয় হও। আনন্দ কর।"

জানি না গুরুদেব ইঁহাদের পত্রে কি অলৌকিক শক্তি প্রেরণ করিলেন। পড়িবার সময় প্রত্যেকের পত্রের প্রতি অক্ষরে নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ, আশ্চর্য্যরূপে আমার হৃদয়ে সঞ্চরিত হইতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যেই আমার মনের মলিনতা বিদূরিত হইয়া, বিমল আনন্দ প্রবাহিত হইল। উৎসাহ, উদ্যমের সহিত উৎফুল্ল অন্তরে আবার আমি ভজনানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। গুরুদেবের অসীম কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। কবে আবার আমার দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন পাইব, আগ্রহ সহকারে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

মায়ের আশীর্ব্বাদ এবং গোঁসাই-চরণে আমাকে সমর্পণ।

অনেককাল পরে, এবার গঙ্গাস্নানের অতি দুর্লভ উৎকৃষ্ট (অর্দ্ধোদয়) যোগ পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাস্নানে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন ; মাতাঠাকুরাণীও এই প্রশস্ত যোগে গঙ্গাস্নান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারে বিস্তর প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, মাতাঠাকুরাণীকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইব সঙ্কল্প করিলাম। মাকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে ভরসা দিলাম। পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত তীর্থগুলি, এই সুযোগে মা'র দর্শন করিয়া আসিবার সুবিধা হইবে। মাতাঠাকুরাণী তীর্থদর্শনে যাওয়ার কয়েক

দিন পূর্ব্বে আমাকে বলিলেন—"আমি তো তীর্থে চলিলাম, আবার কবে দেশে আসিব তারও নিশ্চয় নাই; এখন আমার শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে, তোরও শরীর এখন নীরোগ; পশ্চিম হ'তে এসে এবার তোকে বিবাহ করা।" আমি তখন মাকে পরিষ্কার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের নিয়ম এবং আমার ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলাম। বিবাহ করিলে আবার আমার রোগগুলি দেখা দিতে পারে, ইহাও বুঝাইয়া বলিলাম। মা আমার সমস্ত কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া বলিলেন—"তুই বিবাহ বা চাকরী না করলে, সংসারের কিছুই ঠেকে থাকবে না। আমার আর আর ছেলেরা সকলেই ত সংসারী। তোর সুখের জন্যই তোকে বিবাহ করতে বলি, সংসার করতে বলি। তা তোর ভাল না লাগলে, দরকার নাই। সংসারে সুখ নাই; সুখ থেকে জ্বালাই বেশী। ধর্ম্ম নিয়ে যদি থাকতে পারিস্, তা তো ভালই। তোর ইচ্ছা হ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই থাক্।"

আমি বলিলাম—'তুমি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে অনুমতি করলে, আমি গুরুদেবের নিকটে থাকতে পারি; তিনি আমাকে তোমার সেবার জন্য পাঠাবার সময় বলেছিলেন—"মা'র সেবা কর গিয়ে। সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে, তিনি তাঁর কর্ম্ম-বন্ধন হ'তে তোমাকে মুক্তি দিলে, আমার নিকটে এসে থাকতে পারবে।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা তোর সেবায় তো আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি; আমার কর্ম্ম থেকে তোকে আমি খালাস দিলাম। বাড়ীতে থাকলে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না; গোঁসাইয়ের নিকটে গিয়ে থাক্। তাতে তোরও উপকার হবে, আমারও প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে।"

আমি বলিলাম—'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন—"সেবাদ্বারা মাকে সন্তুষ্ট ক'রে অনুমতি আনতে হবে; না হ'লে কোন প্রকার কৌশল ক'রে অনুমতি নিলে হবে না।" যদি তুমি যথার্থ ই আমার সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে থাক, তা হ'লে আমার ঠাকুরকে তুমি একবার জানাও। ধর্ম্মার্থে আমাকে যদি তুমি তাঁর চরণে অর্পণ কর, আমার পরম কল্যাণ হবে, আর তোমারও পুত্র-দানের মহাফল লাভ হবে।'

মা বলিলেন—"আমি নিজে তো ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই করতে পারলাম না। তোরা যদি কিছু করতে পারিস্, তাতেও আমার উপকার হবে। তোর এই আকাঙ্ক্ষায় আমি বাধা দিব কেন? সন্তুষ্ট হয়েই গোঁসায়ের হাতে তোকে দিলাম।"

আমি বলিলাম—তা হ'লে তুমি আমার গুরুদেবকে এই ব'লে একখানা পত্র লেখ যে, 'আমার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্রকে, ধর্ম্মার্থে আপনার চরণে সমর্পণ করলাম। যাতে ওর ধর্ম্মলাভ হয় আপনি তাই করবেন।'

মা বলিলেন—"আচ্ছা কাগজ কলম নিয়ে আয়। এখনই আমার নামে গোঁসাইকে পত্র লিখে দে।"

মা'র কথা শুনিয়াই আমি কাগজ কলম আনিয়া মা'র সম্মুখে রাখিলাম। মা, মেজবৌ-ঠাকুরাণীর দ্বারা নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখাইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কুলদা, আপনার আদেশমত বাড়ীতে আসিয়া, নানাপ্রকারে আমার সেবা শুশ্রূষার দ্বারা আমাকে বড়ই সুখী করিয়াছে। আমি তাহাকে আর আমার কর্ম্মপাশে বদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। ধর্ম্মার্থে আমি শ্রীমান্ কুলদাকে সন্তুষ্টচিত্তে সম্পূর্ণরূপে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। 'বিবাহাদি করিয়া সংসার করুক' উহার অবস্থা দেখিয়া আমি সেরূপ ইচ্ছা করি না; সুতরাং যাহাতে ধর্ম্মলাভ করিয়া এবং আপনার অনুগত থাকিয়া, শ্রীমান্ মনে সর্ব্বদা শান্তি পাইতে পারে, যে কোন প্রকারে হউক আপনি তাহা করিবেন। কুলদা যদি আনন্দে থাকে, তবেই আমি সুখে থাকিব। আপনার সঙ্গে উহাকে রাখিলে, আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে। ইতি—

নিঃ

শ্রীমান্ কুলদার মাতা।

পত্রখানা লেখাইয়া, মা আমাকে বলিলেন—'আমার দুইটি কথা তুই মনে রাখিস্—(১) আমার মৃত্যুর পর একটি ভুজ্যি তুই ব্রাহ্মণকে দান করিস্। (২) আর যতকাল বেঁচে থাক্‌বি পেট ভ'রে খা'স্।'

আমি বলিলাম—'ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কত অবস্থাই তো ঘট্‌তে পারে; পেটভরা খাবার যদি না জোটে?'

মা বলিলেন—'আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, পরমেশ্বর তোকে আহারে কষ্ট কখনও দিবেন না। চিরকাল তুই পেটভরা খাবার পাবি। পেট ভ'রে খা'স্; তাতে অন্তরাত্মা তুষ্ট থাক্‌বেন।'

আমি বলিলাম—'তোমার মৃত্যুর সময়ে যদি আমি কাছে না থাকি, বহুকাল পরে মৃত্যু সংবাদ পাই, ঐ সময় যদি হাতে আমার টাকা পয়সা বা চাউল ডা'ল না থাকে, তা হ'লে কি কর্‌বো?'

মা বলিলেন—'যদি তেমনই হয়, তা হ'লে যখন আমার মৃত্যু-সংবাদ পাবি, তখন সুবিধা মত একটি ভুজ্যি ব্রাহ্মণকে দিলেই হবে। হাতে যদি কিছু না থাকে, ভিক্ষা ক'রে দিস্।'

মা'র কথা শুনিয়া, আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমার পরম কল্যাণের পথ মাতাঠাকুরাণী আজ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। সংসারে আসার উদ্দেশ্য মা'র কৃপায়, আজই আমার সার্থক হইল। মা'র দয়াতেই আমি গুরুদেবের বিমল শান্তিপূর্ণ দুর্লভ চরণ-রেণুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইলাম। জয় গুরুদেব! তোমার কৃপা, সকল শুভ ও সৌভাগ্যের মূল, ইহা যেন কখনই আমি না ভুলি, এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে এক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'তোমার মা এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, তাঁকে আর এখন বাড়ীতে রাখা কেন? তাঁর সংসার ত শেষ হ'য়ে গেছে। এখন তোমার বৌ-ঠাক্‌রুণদেরই সংসার। তাঁরাই এখন বাড়ী ঘর দেখুন, সংসার করুন। তোমার দাদাদের উচিত, মাকে এখন তীর্থে রাখা। কাশীতে বা শ্রীবৃন্দাবনে এখন তাঁকে বাস কর্‌তে দিলেই, তাঁর যথার্থ উপকার হয়। শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা কাশীই তাঁর পক্ষে ভাল। তোমাদের এ বিষয়ে যত্ন করা উচিত।'

মাতাঠাকুরাণী—শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী দেবী। ১৪৮ পৃঃ
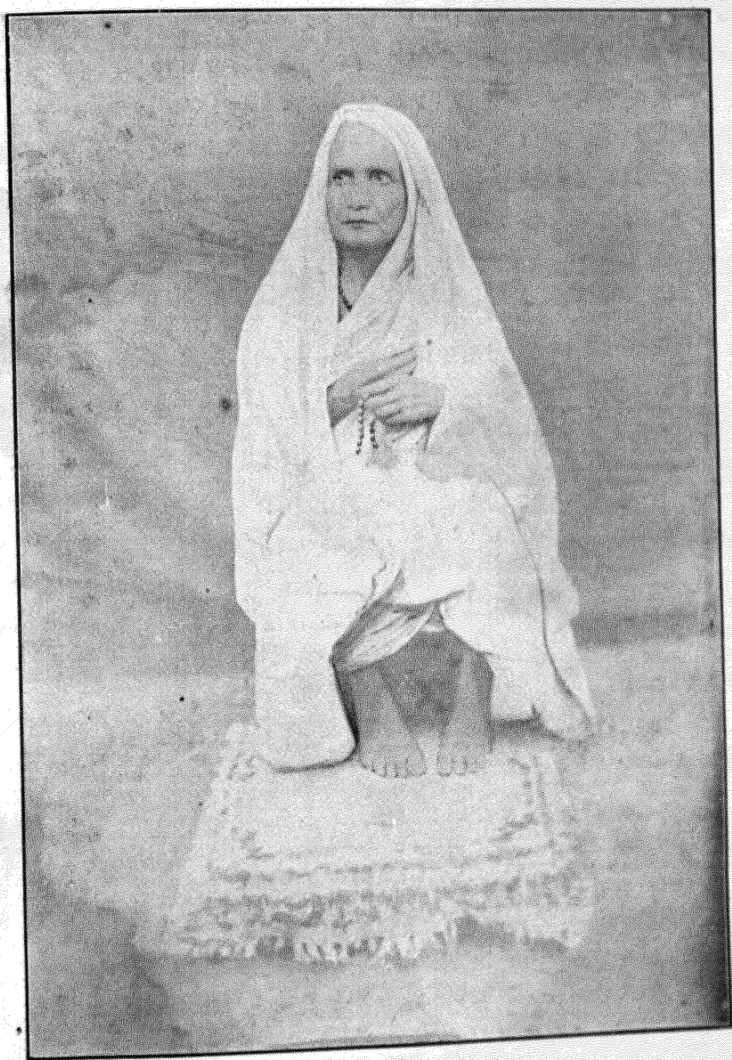
ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি, মাকে সংসারের গোলমাল হইতে সরাইয়া কাশীতে রাখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। বড় দাদাকেও এজন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এবার সুযোগ পাইয়া, বহু বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া মাকে তীর্থে পাঠাইলাম। মা সুস্থ শরীরে পশ্চিমে রওয়ানা হইলেন।

ছোট দাদার দীক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্তি।

মাতাঠাকুরাণীর পশ্চিমে যাওয়ার কিছুদিন পরেই, ছোট দাদা বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলেন। দুই একটা বিষয়ে ভাল লিখিতে পারেন নাই বলিয়া, পরীক্ষার সুফল সম্বন্ধে সন্দেহাপন্ন হইয়া, অতিশয় উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বলিতে লাগিলেন—"এবার পরীক্ষায় পাশ না হইলে আত্মহত্যা করিব।" আমি জেদ করিয়া ছোট দাদাকে বলিলাম—'আমি আপনার পাশের জন্য গোঁসাইয়ের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি। গোঁসাই নিশ্চয়ই আপনাকে পাশ করিয়া দিবেন।' ছোট দাদা বলিলেন—"গোঁসাইয়ের তেমন কোন অলৌকিক শক্তি আছে, আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা যদি তাই হয়, তবে আমি একটা 'প্রবলেম্' (problem) দিই, গোঁসাই তাহা (solve) ক'রে দিন দেখি।" আমি ছোট দাদার এ সকল কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না। ছোট দাদা, গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁকে যোগ সাধন পুস্তকখানা পড়িতে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া বলিলেন—"ব্রাহ্ম-ধর্মের মতের সঙ্গে যাহা মিলে না, তাহা কুসংস্কার। আমি ওসব কিছু মানি না। গোঁসাইকে ধার্ম্মিক ব'লে মনে করি, কিন্তু তাঁর শিষ্যগুলির কিছু হয়েছে বলে বিশ্বাস করি না।" আমি ছোট দাদার কথার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পরে কথায় বার্ত্তায় সুবিধা পাইলেই, গোঁসাইয়ের মহিমা ধীরে ধীরে বলিয়া, তাঁর দিকে ছোট দাদাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। গোঁসাইয়ের নানা প্রকার অসাধারণ অবস্থার কথা শুনিতে শুনিতেই, ছোট দাদার, গোঁসাইয়ের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভক্তি আসিয়া পড়িল। তখন আমি গোঁসাইয়ের নিকটে ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। দীক্ষার প্রয়োজন কি, এই বিষয়ে তিন চার দিন তর্কবিতর্ক আলোচনার পরে, ছোট দাদা বলিলেন—"আচ্ছা, যদি এবার আমি পরীক্ষায় পাশ হই, গোঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা লইব।" আমিও আগ্রহের সহিত ছোট দাদার পাশের খবরের অপেক্ষায় রহিলাম। কিছু দিন পরে, ছোট দাদা পাশ হইয়াছেন, খবর পাইলাম। তখন ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলাম। ছোট দাদা বলিলেন—"গোঁসাইয়ের কাছে দীক্ষা নিব যখন বলিয়াছি, তখন নিবই; কিন্তু এখনই যে নিব, এমন কথা ত আমি বলি নাই। এখন আমার শরীর অসুস্থ; শরীর সুস্থ হউক পরে নিব।" আমি বলিলাম—"আমি কত অসুস্থ ছিলাম তা তো সবই জানেন, গোঁসাইয়ের কৃপায় এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আপনিও দীক্ষা নিলেই সুস্থ হইবেন।"

ছোট দাদা বলিলেন—"যোগ সাধনের যেসকল নিয়ম আছে, আমি তাহা এখন প্রতিপালন করিতে পারিব না।"

আমি কহিলাম—"আপনি যাহা প্রতিপালন করিতে না পারিবেন, এমন কোন নিয়ম কথনই গোঁসাই আপনাকে আদেশ করিবেন না।"

শেষ কালে ছোট দাদা স্বীকার করিলেন, গোঁসাই গেণ্ডারিয়ায় আসিলেই, তাঁহার নিকটে যাইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিবেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

মাতা যোগমায়াদেবীর তিরোভাব। লালজীর দেহত্যাগ।

বড় দাদার পত্রে অবগত হইলাম 'মাঠাকরুণ যোগমায়াদেবীর শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১০ই ফাল্গুন, ১২৯৭ সাল, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, একদিনের ওলাউঠাতেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর এই সংবাদ, যোগজীবনের দ্বারা দাদাকে জানাইয়াছেন।' হঠাৎ এই খবর পাইয়া আমি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাঠাকরুণ আর ফিরিবেন না, সেই স্থানেই থাকিয়া যাইবেন, ঠাকুরের ও মাঠাকরুণের কথার ভাবে, বহুবার এই প্রকার সন্দেহ মনে জন্মিয়াছিল। কি ভাবে, কি অবস্থায় মাঠাকরুণ দেহ রাখিলেন, বিস্তারিতরূপে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে আবার সংবাদ পাইলাম, জীবন্মুক্ত জাতিস্মর গুরুভ্রাতা লালবিহারী বসু, প্রায় ঐ সময়েই, একদিন স্বেচ্ছাক্রমে, অকস্মাৎ গেণ্ডারিয়া অন্ধকার করিয়া পরমধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সকল দুঃসংবাদে এবং আরও দু' একটি উদ্বেগজনক কারণে, আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইব সঙ্কল্প করিয়া, ঠাকুরকে অভিপ্রায় জানাইলাম। ঠাকুর, যোগজীবনের দ্বারা উত্তর দিলেন—'শীঘ্র আমি গেণ্ডারিয়ায় যাইতেছি। সুবিধা বোধ করিলে এখন হইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।' পত্র পাইয়া আমি অবিলম্বেই গেণ্ডারিয়ায় যাইব স্থির করিলাম।

ছোট দাদার দীক্ষা ও বিস্ময়কর ঘটনা। নানা প্রশ্ন।

১২৯৭ সাল, ১৫ই চৈত্র; দ্বিতীয়া তিথি, শুক্রবার।

শেষ রাত্রে আসনে থাকিয়াই আমার প্রাণ অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় আসিয়াছেন, বারংবার মনে হইতে লাগিল। অদ্যই ঢাকা পঁহুছিব সঙ্কল্প করিলাম। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া, ছোট দাদাকে আমার সঙ্গে গেণ্ডারিয়ায় যাইতে বলিলাম। তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক রাজী হইলেন। এক মাসের মত চাউল, ডা'ল, লবণ, লঙ্কা, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি আহারের সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পরে বেলা প্রায় দশটার সময়ে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। মজুরের অভাব বশতঃ গুরুভার গাঁঠ্‌রিটি আমাকে বহন করিতে না দিয়া, ছোট দাদা রুগ্নশরীরে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন। তিন চার মাইল রাস্তা চলিয়া, আমরা সেরাজদিখায় 'গহনায়' (খেয়া নৌকায়) উঠিলাম। বেলা অপরাহ্ণে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বে গেণ্ডারিয়ায় পঁহুছিলাম। আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে, পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত হইয়াই খবর পাইলাম—গত কল্য ঠাকুর আশ্রমে আসিয়াছেন। দূর হইতে দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য। ঠাকুর আমগাছের তলায় বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব দুষ্কৃতির কথা এ সময়ে পুনঃপুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাই বহু জনতার ভিতরে, ঠাকুরের নিকটে যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। পণ্ডিত দাদার কুটীরে, বিষণ্ণ অন্তরে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া, দক্ষিণ দিকে পুষ্করিণীর ধারে প্রস্রাব করিতে গেলেন; তখন সকল লোক আমতলা হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি উহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ছোট দাদাকে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইলাম। ঠাকুর হাত মুখ ধুইয়া যেমন নিজের পায়ে জল ঢালিতেছিলেন, ছোট দাদা অমনি অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ এই মন্ত্র অস্ফুটভাবে আওড়াইতে আওড়াইতে ঠাকুরের চরণে গিয়া পড়িলেন। পরে করজোড়ে 'আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়' মাত্র বলিয়া কাঙ্গালের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর, ছোট দাদার দিকে চাহিয়া "কোথায় আছ? কবে এসেছ?" জিজ্ঞাসার পর, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন—'আচ্ছা তুমি যাও, আমি কুলদাকে বলব এখন।' ছোট দাদা পুনরায় ঠাকুরকে নমস্কারান্তর চলিয়া আসিলেন। আমি কিঞ্চিৎ দূরে, বৃক্ষের আড়ালে অবস্থানপূর্ব্বক এই সমস্ত দেখিলাম। ঠাকুর নিশ্চয় ছোট দাদাকে কৃপা করিবেন মনে করিলাম, এবং অবিলম্বে ছোট দাদার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ভরসা দিতে লাগিলাম।

তিন বৎসরের মধ্যে ঠাকুর, ছোট দাদাকে দেখেন নাই। বহু লোকের ভিতরে কোন সময়ে দেখিলেও, 'আমার দাদা বলিয়া' পরিচয় পান নাই। ঠাকুর, ছোট দাদাকে দেখিয়াই কি প্রকারে চিনিলেন এবং আমি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়াছি কিরূপে তিনি জানিলেন, এ সকল ভাবিয়া, ছোট দাদা বড়ই বিস্মিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই, আমতলায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িলাম। ঠাকুর আমার প্রতি খুব স্নেহের সহিত দৃষ্টি করিতে করিতে বলিলেন—'তোমার দাদাকে কুঞ্জের বাড়ী নিয়ে এস। এখনই তাঁর দীক্ষা হবে।'

ঠাকুরের আদেশ মত, আমি অমনি ছোট দাদাকে লইয়া ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ছোট দাদা, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ বাড়ীর পূবের-ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের কোন লোক ঘরের নিকটে না আসে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে ঠাকুর আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সাধনপ্রাপ্ত বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া, ঘরের ভিতরে বাহিরে যথায় তথায়, উৎফুল্ল মনে বসিয়া পড়িলেন। আর দীক্ষা প্রার্থী কত লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। পরিচিতের মধ্যে কুঞ্জ বাবুর পরিবারস্থ কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং বঙ্কিম নামে একটি কায়স্থ বালক, ছোট দাদার সহিত ঠাকুরের সম্মুখে সাধন লইতে

বসিয়াছেন দেখিলাম। ধূপ, ধুনা, চন্দন, গুগ্‌গুলাদির সুগন্ধি ধূমে ঘর পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর দীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সাধনের নিয়ম প্রণালী উপদেশ করিয়া, ঠাকুর যখন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-ভক্তগণের কলিজার বস্তু মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, তখন অদ্ভুত মহাশক্তির তরঙ্গ উঠিয়া সকলকেই কম্পিত করিয়া তুলিল। ঠাকুর প্রাণায়ামের প্রকরণ দেখাইয়া 'জয় গুরু!' 'জয় গুরু!' বলিতে বলিতে বাহ্য সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। তখন ঘরের অন্দরে বাহিরে সকলেরই ভিতরে এক মহাকাণ্ড আরম্ভ হইল। গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরা নানা ভাবে অভিভূত হইয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বহু লোকের হাসি কান্নার বিচিত্র রোল উঠিল। ছোট দাদা এই সময়ে চীৎকার করিয়া' 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' এবং 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' মন্ত্র দ্বয় বারংবার পড়িতে পড়িতে, ঠাকুরের চরণতলে লুটাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন— 'আহা! আহা!! আহা!!! কি চমৎকার! কি চমৎকার!! আজ সত্যযুগের ধ্বজা আকাশে উড়্‌ল, আজ হ'তে সত্যযুগ আরম্ভ হ'ল, আহা দেখ! কত যোগী, কত ঋষি, কত দেব দেবী, আজ সত্যযুগের নিশান হাতে ল'য়ে, নভোমণ্ডলে আনন্দে নৃত্য কর্‌ছেন; মহাপুরুষগণ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছেন। এরূপ শুভদিন আর হয় না। পঁচিশজন বৌদ্ধ যোগী লামাগুরু এ স্থানে উপস্থিত। সংসারের কল্যাণ কর্‌তে, আজ এই মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতরণ কর্‌লেন। আজ মহা আনন্দের দিন! ধন্য! ধন্য!! ধন্য!!!

ঠাকুর ভাবাবেশে এই সকল বলিতেছেন, অকস্মাৎ একটী অল্পবয়স্কা বালিকা, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং ভাববিহ্বল অবস্থায় করজোড়ে পুনঃপুনঃ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গদগদ স্বরে তিব্বতী ভাষায় ঠাকুরের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে এক একবার সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতপূর্ব্বক ঠাকুরকে দেখাইতে দেখাইতে বিবিধ ভাষায় অসামান্য তেজে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী লোকবিস্ময়কর বক্তৃতা করিলেন। ভাষা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া, যদিও উহার একটি শব্দেরও অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু তেজস্বিনীর তেজঃপূর্ণ প্রত্যেকটি শব্দের প্রভাবে, ভিতরে এক চমৎকার শক্তির প্রবাহ চলিতে লাগিল। বক্তৃতার মুগ্ধকরী শক্তিতে সকলেই প্রায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই প্রকার অসম্ভব ব্যাপার জীবনে আর কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, বালিকাটি কুঞ্জবাবুর শ্যালিকা, নাম অবলা; ইনিও অদ্যই দীক্ষা লাভ করিলেন। জীবনে কখনও ইনি তিব্বতী ভাষা শ্রবণ করেন নাই। কি প্রকারে ইনি অজ্ঞাত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিলেন, জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহল জন্মিল।

দীক্ষার পরে, ঠাকুর সকলকে ধীরে ধীরে শান্ত ও সুস্থির করিয়া, ঘর হইতে বাহির হইলেন। ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও চলিলাম। ভাবাবেশে বিভোর অবস্থায় গুরুভ্রাতারা ঢুলিতে ঢুলিতে আশ্রমে যাইয়া এক একজনে এক একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। দু' চারজনার সঙ্গে ঠাকুর কোঠা-ঘরে

যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি ছোট দাদাকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরের বারেন্দায় গিয়া বসিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে গুরুভ্রাতাদের কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র দশ এগার বৎসরের বালক ফণিভূষণ, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দীক্ষার সময়ে বুট বুট করে উনি যে অতক্ষণ বল্‌লেন, ওঁর ভিতরে কি কোনও স্পিরিট, (প্রেতাত্মা) প্রবেশ করেছিল? কি যে বল্‌লেন, কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

ফণীর কথা শুনিয়া, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—"যে সকল বৌদ্ধ যোগী দীক্ষা স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে ছিলেন। তিনি তিব্বতী ভাষায় বল্‌লেন, তাই তোমরা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না।"

ফণী বলিলেন—"আপনি ত ঐ ভাষা জানেন না। আপনি বুঝিলেন কিরূপে? অন্যের ভাষা বোঝবার কি কোন সাধন আছে?"

ঠাকুর বলিলেন—"এই সাধনেই সব হয়। শুধু সঙ্কেতটি জানা থাক্‌লেই হ'লো। সঙ্কেতটি এই, কারো ভাষা বুঝতে ইচ্ছা হ'লে সুষুম্নাতে প্রবেশ ক'রে, সম্বিৎ শক্তিতে মনটিকে স্থির রেখে শুন্‌তে হয়। এরূপ কর্‌লে, শুধু মানুষের কেন, সমস্ত জীব জন্তু, পক্ষী, বৃক্ষ লতারও ভাষার অর্থ অবগত হওয়া যায়। যখন সেই অবস্থা হবে, চেষ্টা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

ঠাকুর এইপ্রকার আরও অনেক তত্ত্বের কথা বলিলেন। আমি সে সকল কথা কিছুই পরিষ্কার বুঝিলাম না। কতক্ষণ রোয়াকের উপরে বসিয়া, বাহিরে চলিয়া আসিলাম; দেখিলাম কোথাও গুরুভ্রাতারা দু' চারজনে মিলিয়া আনন্দে ভজন গান করিতেছেন, কোথাও বা কেহ কেহ নীরবে বসিয়া নামানন্দে মগ্ন আছেন; আশ্রম আজ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রফুল্ল মনে নানাপ্রকার অবস্থায়, আলাপ আলোচনায় গান সঙ্কীর্ত্তনে, নির্জ্জন ভজনে, পরমানন্দে সময় কাটাইতেছেন; শুধু আমারই ভিতরে বিষম শুষ্কতা। আমি অস্থির হইয়া একবার গুরুভ্রাতাদের কাছে, আবার ঠাকুরের নিকটে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অহেতুকী শুষ্কতার জ্বালায় প্রাণ আমার ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। নিতান্ত অস্থিরভাবে ঠাকুরকে গিয়া বলিলাম—'সকলেই ত আপনার। আজ সকলের প্রাণে আনন্দ দিয়া, শুধু আমাকে শুষ্কতার জ্বালায় পোড়ায়ে মার্‌ছেন কেন? এ জ্বালা কিসে যাবে?'

ঠাকুর বলিলেন—"যার পক্ষে যেটি কল্যাণকর ভগবান তাকে তাই দিচ্ছেন। বহুভাগ্যে মানুষের ভিতরে এই শুষ্কতা আসে। ব'সে স্থির হ'য়ে গিয়ে নাম কর। ও সব দিকে লক্ষ্য রেখো না; নাম কর্‌তে কর্‌তেই উহা চ'লে যাবে।"

আমি কহিলাম—'আমার ভিতরটি সরস ক'রে দিন, ব'সে গিয়ে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন—"যার পক্ষে যা কুপথ্য, রোগী চাইলেই কি ডাক্তার তা দিয়ে থাকেন? একটু স্থির হও, নাম কর যেয়ে।"

আমি আর কিছু বলিতে সাহস পাইলাম না। বারেন্দায় ছোট দাদার কাছে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ ছেদনে ব্রাহ্মণোচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, গুরুভ্রাতাদের নিকটে, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের গল্পাদি করিলেন। ভিতরে বাহিরে বহুলোক বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। মহাপুরুষেরা কত স্থানে কত ভাবে অবস্থান করিতেছেন বলা যায় না। শ্রীবৃন্দাবনের রজলাভ মানসে, মহা মহা সিদ্ধ মহাত্মারা বর্ত্তমান সময়েও নানারূপে তথায় রহিয়াছেন। এ বিষয়ে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক কুঞ্জে, সুন্দর একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্জের কর্ত্তা ঐ বৃক্ষটিকে কেটে ফেল্‌তে অধীনস্থ লোকদের আদেশ কর্‌লেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি বৈষ্ণব বেশধারী ব্রাহ্মণ, তাঁকে এসে বল্‌ছেন—'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে বহুকাল-যাবৎ আছি। শ্রীবৃন্দাবনের রজলাভে ধন্য হওয়ার মানসেই, আমার বৃক্ষরূপ ধারণ। তুমি বৃক্ষটিকে ছেদন ক'রে, কখনও আমাকে এই রজস্পর্শ হ'তে বঞ্চিত ক'রো না। তুমি ওরূপ কর্‌লে আমাকে আবার জন্মাতে হবে, তাতে তোমারও শুভ হবে না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মনে ক'রে, তুমি আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করো না। তোমার বিশ্বাসের জন্য, কাল প্রত্যূষে আমি বৃক্ষের নীচে একবার দাঁড়াব; ইচ্ছা কর্‌লেই আমাকে দেখ্‌তে পাবে।' পরদিন ভোরে বৃক্ষের নীচে পণ্ডিতজী যথার্থই একটি ব্রাহ্মণকে দেখ্‌তে পেলেন কিন্তু, তাতেও তাঁর বিশ্বাস হ'লো না। গ্রাহ্যই কর্‌লেন না। তিনি বৃক্ষটিকে কাটালেন। যাঁরা এ সব কথা শুনেও বৃক্ষটিকে কাট্‌লেন, ওলাউঠা হ'য়ে তাঁরা মারা গেলেন। পণ্ডিতজীর স্ত্রী পুত্রাদিও কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ রোগে মারা পড়্‌লেন। পণ্ডিতজী বৃন্দাবনে দর্শনশাস্ত্রে মহা বিদ্বান্ ব'লে, বিশেষ খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে, হাবা হ'য়ে ব'সে আছেন। পূর্ব্বে সকলেই তাঁকে কত সম্মান কর্‌তেন, কিন্তু এখন কেউ তাঁকে আর গ্রাহ্য করেন না।"

ঠাকুরের মুখে এই প্রকার অনেক কথা শুনিয়া আমরা শয়ন করিলাম।

গোঁসাইয়ের মুখে শ্রীবৃন্দাবনের কথা।

সকালবেলা শৌচান্তে, স্নান তর্পণ সমাপন করিয়া পূবের-ঘরে, ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। রাত্রিতে আমরা কোথায় ছিলাম, কোনও প্রকার অসুবিধা হয়েছে কি না, ঠাকুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের রান্নাঘরে আমাদের রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি, ঠাকুরকে জানাইলাম। লোকের ভিড় কমিয়া গেলে, আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালায় ঠাকুর আমাদিগকে থাকিতে বলিলেন। ছোট দাদা আশ্রমেই দু' বেলা আহার করিবেন, আর আমি অপরাহ্ণে এক বেলা পূর্ব্ববৎ স্বপাক আহার করিব, ইহাই ব্যবস্থা হইল। ছোট দাদার কথা তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন—"আশ্চর্য্য! খুব সৎপাত্র, এরূপটি বড়ই দুর্লভ। দীক্ষামাত্রই মুহূর্ত্তমধ্যে গুরুনিষ্ঠার দিকটি, ওঁর খুলে গেছে। এরূপ বড় দেখা যায় না।"

১৫ই চৈত্র।

আজ অপরাহ্ণে নারায়ণগঞ্জ হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী একটি ব্রাহ্মণ, ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু! শ্রীবৃন্দাবনে অদ্ভুত কি কি দেখিলেন? শুনতে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম, সেখানে সকলই অদ্ভুত। শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সমস্তই অন্য প্রকার। অন্য কোন স্থানের সহিতই উহার তুলনা হয় না। সেখানকার সমস্ত বৃক্ষেরই শাখাপত্র সকল নিম্নমুখী। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষ সকল, লতার মত রজসংলগ্ন হ'য়ে আছে। দেখলে পরিষ্কার মনে হয়, সাধু বৈষ্ণব মহাত্মারাই ব্রজরজ পাবার জন্য, বৃক্ষাকারে রয়েছেন। আপনা আপনি, বৃক্ষে দেব দেবীর মূর্ত্তি পরিষ্কার রূপে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নামের অক্ষর আপনা আপনি বৃক্ষে উৎপন্ন হ'চ্ছে। কোথাও 'রা' কোথাও বা 'কৃ' মাত্র হ'য়ে আছে। বৃক্ষের শিরায় শিরায় এ সকল স্বাভাবিক অক্ষর দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি।"

বৈষ্ণবটি জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! এ সকল কি সকলেই দেখ্‌তে পায়? না আপনিই মাত্র দেখতে পেয়েছিলেন?'

ঠাকুর বলিলেন—"এ সব সকলেই দেখেছেন। কালীদহের উপরে বহু প্রাচীন একটি কেলিকদম্বের বৃক্ষ আছেন; তাঁর শাখায়, প্রশাখায় 'হরেকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পরিষ্কার রূপে লেখা রয়েছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে দেখে আস্‌তে পারেন। বন পরিক্রমার সময়ে, একদিন একটি বনের ধারে ব'সে আছি, সম্মুখে একটি গাছের পাতা দেখে, হাতে তুলে নিলাম; চেয়ে দেখি, দেবনাগর অক্ষরে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পাতাটির শিরায় শিরায় লেখা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান করতেই বৃক্ষটিকে পেলাম, তখন একে একে ভারত পণ্ডিত মশায় ও সতীশ প্রভৃতি যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, সকলকে ডেকে দেখালেম;

সকলে একই প্রকার নাম, বৃক্ষের পাতায় পাতায় দেখ্‌তে পেলেন। অনুসন্ধান করলে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়।"

"পরিক্রমার সময়ে আর এক দিন একটি বনের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। শুন্‌লাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বনের কদম্ব বৃক্ষের পত্রে 'দোনা' প্রস্তুত করেছিলেন। এখনও ভগবান সেই লীলার নিদর্শন সময়ে সময়ে ভক্তদের দর্শন করান। আমরা বনের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, খুঁজে খুঁজে হয়রান। দোনা কোন বৃক্ষেই দেখ্‌তে পেলাম না। পরে সাষ্টাঙ্গ:নমস্কার ক'রে, কাতরভাবে সকলে ব'সে আছি, চেয়ে দেখি সম্মুখেই একটি কদম গাছের পাতা, দোনার মত দেখা যাচ্ছে। নিকটে যেয়ে দেখি, বৃক্ষের সমস্ত পাতাগুলিই দোনার আকার। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন সকলেই বৃক্ষের পাতায় পাতায় দোনা দেখ্‌লেন।"

"চরণপাহাড়ীতে যেয়ে দেখ্‌লাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু বাছুর এবং মনুষ্যের অসংখ্য পদচিহ্ন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে বংশী ধ্বনিতে সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হ'তো, সেই মধুর বংশীরবে এক সময়ে ঐ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ধেনু, বৎস ও রাখাল বালকগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন, সকলেরই পদচিহ্ন ঐ প্রস্তরে অঙ্কিত হ'য়ে পড়্‌ল। আজও সে সকল চিহ্ন পাহাড়ে পরিষ্কার রয়েছে। দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহা কখনও মানুষের খোদা নয়। ওরূপটি মনুষ্যের দ্বারায় কখনও হ'তে পারে না।"

এ সকল কথা বার্ত্তা হইতে হইতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সহর হইতে দলে দলে স্কুলের ছাত্র এবং বাবুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিলাম।

সন্ধ্যার সময়ে আমগাছের তলে, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শুনিয়াছিলাম, প্রায়ই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে, আশ্রমের বুড়ো লাল কুকুরটির মহাভাব উপস্থিত হয়। আজ বুড়োকে সঙ্কীর্ত্তন কালে, ভাবাবেশে সংজ্ঞা শূন্য অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। 'হরেকৃষ্ণ' নাম বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বুড়োর কানে বলিতে বলিতে তাহার চৈতন্য লাভ হইল।

গোঁসাইয়ের জটা ও দণ্ড।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের মস্তকে মহাদেবের যে শিরোবস্ত্র সর্ব্বদা জড়ান থাকিত, এখন আর তাহা নাই। মস্তকের দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে তিনটি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত পরম সুন্দর জটা দেখিতেছি। পশ্চাদ্দিকে বেণীর আকারে, একটি জটা পৃষ্ঠদেশে লম্বমান; ব্রহ্মতালুর চতুর্দ্দিকের চুলের গাঁথুনিতে অপর একটি সুন্দর জটা। সর্ব্বশুদ্ধ ঠাকুরের মস্তকে

১০ই চৈত্র, ১২৯৭;

পাঁচটি জটার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্মুখের বড় জটাটির বিস্তৃত অগ্রভাগ নৃত্যকালে আশ্চর্য্য প্রকারে ঠাকুরের কপালের উপরে যখন দাঁড়াইয়া উঠে, তখন মহাদেবের শিরোফণীর কথা মনে হয়। আবার সমাধি সময়ে ঐ জটাটিই যখন বামে হেলিয়া কিঞ্চিৎ দুলিয়া মস্তকোপরি অবস্থান করিতে থাকে, তখন দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ময়ূর শিখার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রাণে আসিয়া উদয় হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক জটা এত সুন্দর, এত মনোহর কোথাও দেখি নাই। ঠাকুরের শরীরের বর্ণ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু হস্ত পদ ও মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত কাল। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন— 'শ্রীবৃন্দাবনে শীত অত্যন্ত বেশী। গায়ে সর্ব্বদা 'আল্‌খাল্লা প'রে থাক্‌তাম্‌। যে সব স্থান খোলা থাক্‌তো, শীত লেগে তাহাই কাল হ'য়ে গেছে।'

শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবাসী।

আজ একটি ভদ্রলোক ব্রজভূমির নানা প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃতই হউক, আর যাহাই হউক, সেখানের লোকগুলি কিন্তু বড় ভয়ানক। টাকা টাকা করিয়া যাত্রীর উপরে যে বিষম অত্যাচার করে, তাহা শুনিয়াই ত প্রাণে ত্রাস উপস্থিত হয়।' ঠাকুর বলিলেন— "টাকার জন্য ব্রজবাসীরা নরহত্যাও করেন, এরূপ ঘটনা কয়েকটি শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা যথার্থ ব্রজবাসী কি না, বলা কঠিন। আগ্রা, দিল্লী, জয়পুরাদি নানাস্থানের অনেক লোক, তিন চার পুরুষ থেকে ব্রজভূমে বাস কর্‌ছেন। তাঁরাও ব্রজবাসী ব'লে পরিচয় দেন। লোকেও তাঁদের ব্রজবাসী ব'লেই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনের পল্লীগ্রামে ঘুর্‌লে, যথার্থ ব্রজবাসীদের সরলতা, উদারতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। যে সকল ব্রজবাসী যাত্রী যজমানদের উৎপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেন, তাঁরা ঐ টাকার দ্বারায় কি করেন তাও ত দেখ্‌তে হবে। বন পরিক্রমার সময়ে, সহস্র সহস্র সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রীদের ভরণ পোষণ তাঁরাই ত করেন। অর্থ তাঁরা জমা করেন না। তোমাদের হ'তে টাকা নিয়ে, তোমাদেরই সেবা করেন। পূর্ব্বে ব্রজবাসীরা আহারের অভাবে অর্থের অনটনে কোথাও ঘোরাঘুরি কর্‌তেন না। যাত্রীর উপরেও তাঁহাদের কোন উপদ্রব ছিল না। তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আমাদেরই দুর্ব্যবহারে এখন তাঁদের এই দুর্দ্দশা।"

যে লালা বাবুর নাম কীর্ত্তন করিয়া, আজ সমস্ত বাঙ্গালার লোক কৃতার্থ হইতেছেন, তিনিও এক সময়ে কিরূপ ছিলেন? পরে, শ্রীধাম বাসের গুণে, ভগবৎ কৃপায় কত দুর্লভ অবস্থা লাভ পূর্ব্বক জন সাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন, ঠাকুর তাহা বলিতে লাগিলেন—

"প্রথম অবস্থায় লালা বাবু, আর দশ জন জমীদার যেমন, তেমনই ছিলেন। ব্রজবাসীরা ভোলা। ভাং ও লাড্‌ডু পেলে তাঁরা আর কিছু চান না। ওতেই তাঁদের পরম

আনন্দ। লালা বাবু ইহা দেখে তাঁদের খুব ভাং ও লাড্‌ডু খাওয়াতে লাগ্‌লেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত লিখিয়ে নিলেন। এখনও ব্রজবাসীরা অনেকে দুঃখ ক'রে বলেন, লালা বাবুই আমাদের শেষ করেছেন। পরে ভগবানের কৃপায় যখন লালা বাবুর বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি রাধাকুণ্ডের একটি সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হ'য়ে গেলেন। সিদ্ধ বাবাজী, লালা বাবুকে খুব তিরস্কার ক'রে বল্‌লেন—'যাঁদের সঙ্গে তোমার পরম শত্রুতা, নেংটি মাত্র প'রে কাঙ্গাল বেশে তাঁদের চরণে প'ড়ে আগে যেয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর। পরে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসো। আর তাঁদের ঘরেই মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে সেবা করবে।' লালা বাবু যখন কাঙ্গাল বেশে নেংটি মাত্র প'রে, মথুরায় চৌবেদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হ'তে লাগ্‌লেন, তখন সকলে ভেবেছিল লালা বাবুকে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। কিন্তু চৌবেরা তাঁর অবস্থা দেখে, চোখে জল রাখ্‌তে পার্‌লেন না, বল্‌লেন—'আহা! তোমার এই অবস্থা, ভিক্ষা করতে আমাদেরই দ্বারে এসেছ? তোমাকে কি ভিক্ষা দিব বল? আমাদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও তুমি নাও।' চৌবেরা প্রাণের সহিত তাঁহাকে ক্ষমা ক'রে আশীর্ব্বাদ করলেন। পরে তাঁর দীক্ষা হ'লো। দীক্ষার পরে তিনি যেরূপ কঠোর বৈরাগ্য কর্‌লেন, তা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। প্রত্যহ ভিক্ষার সময়ে লোকে তাঁকে চিন্‌তে পেরে, ভাল ভাল খাবার দিতেন; এজন্য তিনি কত কঠোরতাই করেছিলেন। আদর যত্ন প্রশংসা তাঁকে বিষের ন্যায় জ্বালা দিত। লোকে তাঁকে চিন্‌তে না পারে, এজন্য কত ভাবেই পাগলের মত বেড়াতেন। লোকে আদর ক'রে ভিক্ষা দিত ব'লে, তিনি ভিক্ষা করা ছেড়ে দিলেন। অবশেষে ঘোড়ার 'লাদে' (বিষ্ঠা) যে সব দানা পেতেন, তাই মাত্র খেয়ে, কোন প্রকারে জীবন্ ধারণ করতেন। এক দিন ঐরূপ ঘোড়ার লাদ ঘেঁটে দানা সংগ্রহ কর্‌ছিলেন, অকস্মাৎ ঘোড়া বিষম এক লাথি মার্‌লো, তাতেই লালা বাবুর মৃত্যু হয়। এপ্রকার অদ্ভুত বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন এখন আর দেখা যায় না।"

পরিক্রমাকালে ব্রজমায়ীদের ব্যবহার।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের কথা বলিতে বড়ই আনন্দ পান। এতকাল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়া দর্শকগণও আসিয়া ঠাকুরকে শ্রীবৃন্দাবনের কথাই জিজ্ঞাসা করেন।

১৭ই চৈত্র।

আজ একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রজ পরিক্রমার সময়ে অসংখ্য যাত্রীদের আহারাদি কি প্রকারে চলে? সঙ্গে সঙ্গে কি বাজার যায়? না জিনিস

পত্র যাত্রীদের নিয়ে চল্‌তে হয়? রাস্তায় চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না কি? ঠাকুর বলিলেন—"চোর ডাকাতের উপদ্রব ত সর্ব্বত্রই আছে। পরিক্রমার সময়ে সঙ্গে জিনিস পত্র নিয়ে যাওয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাজার চলে, আবার পথের স্থানে স্থানে আড্ডাও আছে। সেখানে সমস্ত জিনিসই জোটে। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা আড্ডায় গিয়ে প্রয়োজন মত জিনিস খরিদ ক'রে আহারাদি করেন। আর সাধুরা লুটপাট ক'রে খাবার সংগ্রহ ক'রে নেন। পরিক্রমার সময়ে গ্রামে গ্রামে ব্রজমায়ীরা দধি দুগ্ধাদি, ভারে ভারে একখানা ঘরে সাজায়ে রাখেন। পরে অন্য ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এঘর, ওঘর ক'রে দধি দুগ্ধ খুঁজে বা'র করেন। সেই সময়ে ব্রজমায়ীরা, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে, হাতে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া করতে থাকেন। সাধুরা দধি দুগ্ধাদি লুটপাট ক'রে, হাঁড়ি পাতিল ভেঙ্গে দৌড় মারেন। ইহাতে ব্রজমায়ীদের বড়ই আনন্দ। তাঁরা এ সময়ে রাখাল বালকসহ শ্রীকৃষ্ণের দধি দুগ্ধ চুরির কথা মনে ক'রে সেইভাবেই মুগ্ধ হ'য়ে থাকেন। চুরি ক'রে বা জোর ক'রে এরূপ লুটপাট ক'রে কেহ কিছু নিলে, ব্রজমায়ীদের যে আনন্দ, তা আর বল্‌বার নয়। এই আনন্দ কর্‌বার জন্যই তাঁরা প্রতিদিন কত চেষ্টা ক'রে দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি নানা সুখাদ্য বস্তু ঘর ভ'রে সাজায়ে রাখেন। যে সকল সাধুরা লুটপাট করেন না, আসনেই থাকেন, ব্রজমায়ীরা তাঁদের নিকটে যেয়ে, বাৎসল্যভাবে কত গালি দেন। হাতে ধ'রে টেনে বাড়ীতে নিয়ে যান। সাধুদের গলা জড়ায়ে ধ'রে, কত আদর ক'রে, ঘরে যা থাকে স্বহস্তে সাধুদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান। ব্রজমায়ীদের এ সব ভাব দেখ্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়।

ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, এখনও সেই ভাবই বর্ত্তমান। বেলা শেষ হ'লে, ব্রজমায়ীরা উৎকণ্ঠিত প্রাণে, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়ায়ে থাকেন। কতক্ষণে রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে ফির্‌বে, তাই দেখেন। চেনা, অচেনা জ্ঞান নাই। ঘরের ভাল ভাল জিনিস নিয়ে, কত আদর ক'রে, রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'লে, স্নেহভরে তাদের কত গালাগালি করেন। ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রজমায়ীদের ভিতরে এখনও পূর্ব্বের সেই ভাব, সেই অবস্থা সমস্তই রয়েছে।

ঠাকুরের সঙ্গে এবার মাঠাকুরাণী, সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি অনেকেই ব্রজ পরিক্রমা করিয়াছেন। ইঁহারাই ধন্য। আমার অদৃষ্টে অল্প দিনের জন্য উহা ঘটিল না। ঠাকুর, সতীশকে চৌরাশি ক্রোশ শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিতে বলিয়াছিলেন। সতীশও তাহা লিখিয়া মধ্যে

মধ্যে ঠাকুরকে শুনাইতেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার সমস্ত ঘটনাই, এই পুস্তকখানায় থাকিবে আশা করি। সতীশ উপস্থিত এই আশ্রমেই রহিয়াছেন।

জীবপ্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা।

১৮ই চৈত্র।

আহারান্তে সাড়ে বারটার সময়ে, ঠাকুর আমগাছের তলায় নিজ আসনে যাইয়া বসেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একই ভাবে, আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নে চৈত্রের বিষম উত্তাপে ঘর হইতে কেহ বাহির হন না। ঠাকুরও এই সময়ে গরমে কখন কখনও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়েন। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে, আমিও একখানা পাখা হাতে লইয়া আমতলায় যাইয়া বসি। ঠাকুরের বাম দিকে, দুই হাত অন্তরে থাকিয়া, বাতাস করিতে আরম্ভ করি। ঠাকুর প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অনিমেষ নয়নে, নিস্পন্দ ভাবে, পূর্ব্ব দিকে বৃক্ষ পানে তাকাইয়া থাকেন। কখন কখন বা নয়ন মুদ্রিত করিয়া একই ভাবে সমাধি অবস্থায় তিন চার ঘণ্টা কাল অবস্থান করেন। অপরাহ্নে প্রায় পাঁচটার সময়ে, আমতলায় লোক জন আসিয়া পড়ে। তখন ঠাকুর, তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করেন। নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে, আমতলা পরিপূর্ণ হয় দেখিয়া, বড়ই আনন্দ লাভ করি। আজ মধ্যাহ্নে, আমতলায় নিজ আসনে বসিয়াই, ঠাকুর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। আমি নিকটে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকিয়া, বেলা প্রায় তিনটার সময়ে, ঠাকুর অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তভাবে আমাকে বলিলেন—"দেখ ত! দেখ ত! ওদের তাড়ায়ে দাও, পাখীরা ভয় পেয়ে ডাকছে।" আমি বলিলাম—পাখী কোথায় ডাক্‌ছে? কাদের তাড়িয়ে দিব? ঠাকুর বলিলেন—'যেয়ে দেখ কুঞ্জ ঘোষের বাড়ীর বড় আমগাছে।' এইমাত্র বলিয়াই ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও অমনি ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম। বড় আমগাছটির নিকটে যাইয়া দেখি, কয়েকটি দুষ্ট বালক শালিক পাখীদের বাসা লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছে। তিন চারিটি শালিক, গাছের উপরে এ ডালে ও ডালে, ব্যস্ত হইয়া উড়াউড়ি করিতেছে আর ডাকিতেছে। বালকদের আমি ধমক দেওয়া মাত্রই, সকলে পলাইয়া গেল। পাখীরা স্থির হইল। আমিও ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলাম এবং পাখা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর অমনি মাথা তুলিয়া চোখ মেলিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি দেখ্‌লে?' আমি দুষ্ট ছেলেদের শালিকের ছানা পাড়িবার দুশ্চেষ্টা ও শালিক তাড়াইবার জন্য ঢিল ছোড়ার কথা বলিতে লাগিলাম। ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না, এরূপ ভাবে থাকিয়া, খুব মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতে লাগিলেন। বলা শেষ হইলে পর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি ত এখানেই ব'সেছিলাম, পাখীদের শব্দ ত কিছুই শুনতে পাই নাই। আপনি ধ্যানাবস্থায় থেকে অত দূরে পাখীদের ডাক কিরূপ শুন্‌লেন?'

ঠাকুর বলিলেন—'নিকটে, দূরে কি ক'র্‌বে ? যেখানে যে অবস্থায় থাকা যাক্, কোন আপদে প'ড়ে কেহ ডাক্‌লে, তা এসে প্রাণে বাজে।

এই সময়ে ঠাকুরের আসনের পাশ দিয়া, এক সারি পিঁপ্‌ড়া দ্রুতপদে চলাচল করিতেছিল। ঠাকুর উহাদের দিকে একটু তাকাইয়া, মাথাটি নোয়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, কান পাতিয়া, যেন উহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন এবং উহাদের কথা যেন বুঝিতেছেন এইরূপ ভাবে, সময়ে সময়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—'পিঁপ্‌ড়ারাও কি কথা বলে ? পিঁপ্‌ড়াদের কথাও কি শুনা যায় ?'

ঠাকুর বলিলেন—'পিঁপ্‌ড়া কেন, বৃক্ষ লতাও কথা বলে। চিত্তটি একটু স্থির হ'লে, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা সকলের কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়।'

ঠাকুর আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে না দিয়া অমনি বলিলেন—'সে যাউক, তুমি পিঁপ্‌ড়াদের কিছু খাবার এনে দাও না। আটা ও চিনি মিলায়ে দিলে পিঁপ্‌ড়াদের খেয়ে বড় আনন্দ হয়।' আমি আটা না পাইয়া, শুধু চিনি আনিয়া, ঠাকুরের কথামত তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে ছড়াইয়া দিলাম। ঠাকুর তখনই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এক একবার চোখ মেলিয়া পিঁপ্‌ড়াদের দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'এদের ভিতরেও এলোমেলো কিছু হয় না। সমস্ত কার্য্যেরই সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। এদের মধ্যেও চালক আছে, শাসন আছে, বিচার ও দণ্ড আছে। মানুষ বড় ব'লে কিসে অভিমান করে ? পিঁপ্‌ড়ার মত, বালি হ'তে এইরূপে চিনি পৃথক ক'রে নিক্ দেখি ?'

শ্রীবৃন্দাবনে "রাধাশ্যাম" পাখী।

মধ্যাহ্নের গরমে সকলেই আপন আপন ঘরে বিশ্রাম করেন; চারিদিক নিস্তব্ধ! সেখানকার পাখী সকল ছায়াতে বৃক্ষডালে বসিয়া নানাপ্রকার রব করে; শুনিয়া বড়ই আনন্দ হয়। আজ অপরাহ্ণে, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের একপ্রকার আশ্চর্য্য পাখীর গল্প করিলেন। শুনিয়া অবাক্ হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কোন বিষয়েরই কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই। সে জন্য এখন আক্ষেপ হয়। ঠাকুর আজ শ্যামাপাখীর কথা বলিতে লাগিলেন —'কোন একটি ঋতুতে, উত্তর দেশ থেকে এক শ্রেণীর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ঐ পাখী সকল, 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাকেন। এমনই সুস্পষ্টস্বরে 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' বলেন যে, শুনে অন্য কিছু মনে করা যায় না। শ্রীবৃন্দাবনে ঐ পাখীকে 'রাধাশ্যাম' পাখী বলে। একবার একটি ব্রজবাসী,

কৌশলক্রমে দু'টি রাধাশ্যাম পাখী ধর্‌লেন। কিন্তু একটি উড়ে গেলেন, অপরটিকে ব্রজবাসী একটি পিঞ্জরায় পূরে রাখ্‌লেন। খাবার দিলেন, পাখীটি পিঞ্জরায় বদ্ধ হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ কর্‌লেন। আর সে ডাকও নাই, পাখীর স্ফূর্ত্তিও নাই। পরদিন প্রত্যুষে দলে দলে রাধাশ্যাম পাখী এসে ব্রজবাসীর কুঞ্জে প'ড়ে, 'রাধাশ্যাম' 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। পাড়ার সব ব্রজবাসীরা তখন ঐ ব্রজবাসীকে ধমক্ দিয়ে বল্‌লেন, অবিলম্বে তুমি ঐ পাখীটি ছেড়ে দাও। না হ'লে তোমার সর্ব্বনাশ হবে! দেখ দলের সমস্ত পাখীগুলি এসে উহার জন্য 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্‌ছে। তখন ব্রজবাসী পাখীটি ছেড়ে দিলেন।'

শ্রীবৃন্দাবনে হিংসা।

শ্রীবৃন্দাবনে কাক কোথাও দেখ্‌লাম না। আমিষ ভক্ষণ নাই ব'লেই, ওখানে কাক নাই। আমিষ খাওয়া আরম্ভ হ'লেই কাক যেয়ে উপস্থিত হবে। ব্রজভূমির ন্যায় হিংসাশূন্য স্থান, আর কোথাও দেখা যায় না। এজন্য বনের পশু পক্ষীও, মানুষের গা ঘেঁসে চল্‌তে কোন শঙ্কা করে না। যার ভিতরে হিংসা, তারই নিকটে ভয়।

শুনিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে হিংসা নাই বলিয়া সমস্ত ব্রজভূমে পশু পক্ষী শিকার করাও সরকার হইতেই নিষেধ আছে। কিছুকাল হয়, কোন এক পুলিশ সাহেব সরকারের হুকুম অমান্য করিয়া, শিকার করিতে গিয়াছিলেন। শিকারের চেষ্টা করা মাত্রই তিনি মারা পড়িলেন। ঘটনাটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

'পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চ'ড়ে যমুনা পার হ'য়ে 'বেলবাগের' দিকের এক জঙ্গলে উপস্থিত হ'লেন। অনেকেই নিষেধ করেছিলেন, কারো কথাই তিনি গ্রাহ্য কর্‌লেন না। বনে যেয়ে একটি শূকর দেখে বন্দুক ছুড়্‌লেন; শূকর অমনি দুই লাফে সাহেবের নিকটে এসে পড়্‌লো। ঘোড়া অমনি সাহেবকে ফেলে দিয়ে পালালো। শূকর তৎক্ষণাৎ সাহেবকে চিরে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্‌লো।'

হোমের ব্যবস্থা।

মধ্যাহ্নে, আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

২৯ চৈত্র।

'বৈশাখ মাসের পহেলা হইতে তিন মাস কাল তোমায় হোম কর্‌তে হবে।'

আমি বলিলাম—'হোম কিরূপে কর্‌বো, আমি ত কিছুই জানি না।'

ঠাকুর বলিলেন—'বেল, বট, অশ্বত্থ বা যজ্ঞডম্বুরের কাষ্ঠদ্বারা হোম কর্‌বে। একশ আটটি ত্রিদল বিল্বপত্র নিয়ে, ঘৃতে মিলায়ে এই……মন্ত্র পাঠ ক'রে একশ

আট বার আহুতি দিবে। প্রতিদিন সকালে, স্নানের পর গায়ত্রী জপ ক'রে, তিন মাস এই প্রকার হোম ক'রো। স্বপাক আহার চা'রটার পরে করাই তোমার পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম—'দেশে দেখিয়াছি, হোম করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা যন্ত্রাদি আঁকিয়া কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া নেন্, আর হোম-স্থানে বালি ছড়াইয়া দেন, আমায় কি ঐরূপই করতে হবে?'

ঠাকুর বলিলেন—'না, না, কিছু না। আসনের সম্মুখে—এইরূপ একটি কুণ্ড প্রস্তুত ক'রে নিয়ো, প্রত্যহ ওতেই হোম ক'রো।'

এই বলিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া গোলাকার কুণ্ড দেখাইলেন। বৈশাখ মাস আরম্ভের আর বেশী দিন বাকী নাই। হোমের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত ও কাষ্ঠ এখানে সংগ্রহ করা বিশেষ অসুবিধা বুঝিয়া, আগামী কল্যই বাড়ী যাইব স্থির করিলাম।

ফকির আলিজান। প্রাণায়ামের প্রকারভেদ।

২৩শে চৈত্র, ১২৯৭।

এক দিন মাত্র বাড়ী থাকিয়া, হোমের জন্য উড়ুম্বর কাষ্ঠ ও গব্য ঘৃত লইয়া গেণ্ডারিয়ায় আসিয়াছি। দেখিলাম, নানা দিক হইতে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ গুরুভ্রাতা-ভগিনীরা আসিয়া, আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় আসার পর হইতে, নানা শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী এবং খৃষ্টান ও মুসলমান্ ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিভাগের কাপ্তেন, পেন্সন প্রাপ্ত কাবেল সাহেব, বহুকালযাবৎ উদাসীন ভাবে, সাধন ভজনে, জীবন যাপন করিতেছেন। মধ্যাহ্নে, নির্জ্জন পাইলেই তিনি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া, কিছু সময় কাটাইয়া যান। লোকজন দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়েন। সমুদ্র বাবা নামক একটি সাধু কয়েকদিন-যাবৎ আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরের বারেন্দায় তিনি থাকেন। বাবাজীর সাধন ভজন কিছুই দেখি না। কি করেন, তাহাও জানি না। কিন্তু লোকটির কথা বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার বড়ই মিষ্টি লাগে। ঠাকুরের প্রতি ইনি বড়ই শ্রদ্ধাবান্। ঠাকুরের যে দর্শন পাইয়াছেন, ইহাতেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

একটি মুসলমান্ ফকির প্রায় অনেক সময়েই ঠাকুরের নিকটে আসেন। ঠাকুরের এখানে আসার পূর্ব্বে, তিনি গেণ্ডারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিতেন। ফকির সাহেবের নাম আলিজান। কথা বার্ত্তা যাহা বলেন, একটিরও অর্থ বুঝি না। চাল চলনও প্রায় অনেক সময়ে পাগলের মত মনে হয়। কিন্তু আলিজান কাহারও কোন অনিষ্টকর কার্য্য করেন না। ছেলে, বুড়ো সকলেই আলিজানকে লইয়া খুব আমোদ করেন। আলিজানও সকলের সঙ্গে খুব মিশিয়া থাকেন। ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, বেলা প্রায় ২টার সময়ে ৩।৪ খণ্ড ইক্ষু দণ্ড লইয়া, বৃদ্ধ আলিজান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আসন করিয়া খুব আঁট্ সাঁট্ হইয়া বসিলেন। পরে একখানা বড় ইক্ষুখণ্ড খাওয়ার উদ্দেশ্যে, হাতে লইয়া যেমনই উহা দন্ত সংলগ্ন করিলেন, অমনি অকস্মাৎ উচ্চলম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া

পড়িলেন। এবং চারি দিকে চঞ্চলভাবে দৃষ্টি করিয়া, ইক্ষুদণ্ডখানা দক্ষিণে বামে প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। আর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ! আল্লা! হালারা তিতা কইরা দিল। খাইবার দিল না। আরে হালারা, লাট তো আইচে। লাটের মস্তবড় জাহাজও আইচে, ইয়াতে কি ওইল। লাটের কাছে কামের ইসাব দিবি না। হালারা য্যাম্বায় অই যাইবি? তা পার্‌বি না। দিক্ কর্‌তে আইচ! নেকাল! নেকাল! নেকাল!" এই বলিয়া ফকির সাহেব কয়েকবার গোঁসাইয়ের সম্মুখে ইক্ষুদণ্ড ঘুরাইয়া লম্ফ ঝম্ফ দিতে দিতে, দৌড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুর এই সময়ে মৃদু মৃদু হাসিয়া ফকির সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব চলিয়া গেলেন। পরে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আলিজান এরূপ করিলেন কেন? শূন্যের উপরে ইক্ষুদণ্ড দ্বারা কাহাকে মারিলেন? কে আলিজানের আখ্ তেতো করিল? এসব কি আলিজানের শুধু পাগলামী?'

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—'আলিজানকে তোমরা পাগল মনে কর? ইনি পাগল নন, ইনি খুব ভাল ফকির। সিদ্ধ পুরুষ। লোকের নিকটে পাগল না সাজ্‌লে আজ কাল রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। আলিজান যা বলেন, যা কিছু করেন, সকলেরই সঙ্গে তাঁর নিজের ক্রিয়াটির যোগ রাখেন। ইনি অনর্থক কিছুই করেন না। ভূত প্রেতাদির দৃষ্টিতেও খাদ্য বস্তু নষ্ট হয়, উচ্ছিষ্ট হয়। আলিজানের সে সমস্ত পরিষ্কার নজরে পড়ে। শূন্যে আখ্ ঘুরায়ে যে লম্ফ ঝম্ফ কর্‌লেন, উহা একপ্রকার প্রাণায়াম। আলিজান অনেক রকম জানেন। ফকির সাহেবকে সাধারণ মনে ক'রো না।'

আমি বলিলাম—'লাফালাফি করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, নানাপ্রকার বিকট শব্দে মুখভঙ্গি পূর্ব্বক চীৎকার করিয়াও আবার প্রাণায়াম হয় নাকি? শ্বাস প্রশ্বাসের কোন প্রকার ক্রিয়া করিতেই ত উহাকে দেখিলাম না। প্রাণায়াম কত প্রকার আছে?'

ঠাকুর বলিলেন—"মানুষের শরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে। ঐ সকল নাড়ীতে প্রাণ-বায়ুকে চালনা কর্‌বার যে সকল প্রক্রিয়া, তাহাকেই প্রাণায়াম বলে। এক এক নাড়ীতে এক এক প্রকার প্রক্রিয়ায় এই প্রাণবায়ু চলে। এইজন্য প্রাণায়ামও বাহাত্তর হাজার প্রকারের। নানারূপ অঙ্গভঙ্গীতে এবং নানাপ্রকার শব্দতেও প্রাণায়াম হয়। কি প্রকার চেষ্টাতে কোন্ নাড়ীতে কি ভাবে প্রাণায়ামের ক্রিয়া হয়, লোকে তার সন্ধান জানে না। আজ কাল ও সব প্রাণায়াম আর দেখা যায় না। ঐ সব প্রায় সমস্তই লোপ পেয়েছে। ফকিরদের মধ্যে এখনও এ সব প্রাণায়াম কতকটা আছে দেখা যায়।"

এ সকল কথা হইতে হইতে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। ঠাকুরও তাঁহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিয়া আসিলাম। প্রতিদিনই সন্ধ্যা-কীর্ত্তনে, মহা আনন্দ উৎসব চলিতেছে।

প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিতে সিদ্ধ মহাত্মগণের লোকবিরুদ্ধ ব্যবহার।

২৪শে চৈত্র।

আজ ঠাকুর বলিলেন—'ধর্ম্মার্থীদের প্রতিষ্ঠায় ও প্রশংসাতে যত অনিষ্ট করে, এত আর কিছুতেই নয়। এইজন্য কত ভাল ভাল সাধু মহাত্মারা, কত প্রকার উপায় অবলম্বন ক'রে, লোকের চোখ্ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য আত্মগোপন করেন, বলা যায় না। একবার শ্রীবৃন্দাবনের একটি ভদ্রলোক, এক দিন সাধু বৈষ্ণবদের সেবা করালেন; আমিও দর্শন করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, টিকেট দেখিয়ে বৈষ্ণব বাবাজীরা কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করছেন। একটি কাঙ্গাল ভিতরে যেতে চাইলেন, কিন্তু টিকেট ছিল না ব'লে দ্বাররক্ষক তাঁকে গালি দিয়ে সরিয়ে দিলেন। পুনরায় ঐ ব্যক্তি ভিতরে যাবার চেষ্টা করা মাত্র, দ্বার-রক্ষক তাঁকে খুব কয়েক ঘা মারলেন। লোকটি প্রহারে কোন প্রকার ক্লেশ প্রকাশ না ক'রে, প্রফুল্ল মুখে ঐ স্থান হ'তে চলে গেলেন। দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। আমি উঁহার জন্য কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। তিনি যমুনার তীরে তীরে অনেক দূর যেয়ে, বনের ভিতরে একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি গুহার ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর নিকটে যেয়ে, তাঁকে নমস্কার ক'রে খাবার দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'লোকালয় হ'তে এত দূরে থেকে, আপনার ভিক্ষাদির কিরূপে সুবিধা হয়; সহরেও ত কোন স্থানে থাকতে পারেন।' বাবাজী বললেন, লুকায়ে থাকাই নিরাপৎ। একবার মাত্র প্রত্যূষে উঠে যমুনায় স্নান করি, আর পাকিতে একবার 'মাধুকরী' (ভিক্ষা) ক'রে রুটির টুক্‌রা নিয়ে আসি। তাই যমুনার জলে গুলে, সেবা করি; এতে আমার কোন উৎপাত নাই। বেশ আছি। বাবাজী পরম বৈষ্ণব। এই ভাবে বহুকালযাবৎ নির্জ্জন গুহায় থেকে, দিন কাটাচ্ছেন। শ্রীবৃন্দাবনে এরূপ গোপনে আরও কত আছেন, কে আর সে সকলের খোঁজ নেয়?"

ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"এবার হরিদ্বারে একটি সাধুকে দেখলাম। তিনি খুব ভাল সাধু ব'লে চারি দিকে প্রচার হওয়াতে, সর্ব্বদা তাঁর নিকটে লোকের ভিড় হ'তে লাগ্‌লো। লোকের গোলমাল হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, তিনি সাধুর বেশ পরিত্যাগ

কর্‌লেন। লোকে তাতেও তাঁর সঙ্গ ছাড়্‌লো না। সাধু তখন 'পেণ্টালুন কোট' প'রে, ছড়ি হাতে নিয়ে বাবুর বেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। মানুষ তাতেও ভুল্‌লো না। সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় চল্‌লো। তখন সাধু অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন। লোকসঙ্গ ত্যাগের জন্য একটা দুর্নাম রটাতে, রাত্রিতে এক মুদির দোকানে যেয়ে, চাউল চুরি কর্‌লেন। পুলিশ তাঁকে ধ'রে চোর ব'লে চালান দিল। বিচারে তাঁর তিন টাকা জরিমানা হ'লো। তখন মুদি তাঁকে জান্‌তে পেরে, তিনটি টাকা জরিমানা দিয়ে খালাশ্‌ করে নিয়ে এলেন। করজোড়ে তাঁর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাইলেন। অনেক সময়ে মহাত্মারা প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য, এমন সমস্ত কাজ করেন, যাতে চার দিকে ভয়ানক দুর্নাম রটনা হয়।"

"অযোধ্যার হরিদাস বাবাজী একজন সিদ্ধ মহাত্মা। তিনি লোকালয় ত্যাগ ক'রে, বহু দূরে জঙ্গলের ভিতরে একখানা জীর্ণ কুটীরে থাক্‌তেন, আর নিজের মনে, আনন্দে ভজন কর্‌তেন। সেখানে যেয়েও অনেকে তাঁর দর্শন কর্‌তেন। এবং ঐহিক আপদ বিপদের কথা জানাইয়া বাবাজীর নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করিতেন। বাবাজী নানা প্রকারে তাঁদের বুঝায়ে বল্‌তেন যে, ও সব তিনি কিছুই জানেন না। বাবাজী তখন অশ্লীল গালাগালি ক'রে, তাঁদের তাড়ায়ে দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। কেহ তাঁহার নিকটে না যায়, এইজন্য তিনি লোকদের ভয় দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে পাথর ছুঁড়েও মার্‌তেন।"

"শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে, কয়েক দিন কাশীতে ছিলাম। সে সময়ে পূর্ণানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে অত্যন্ত ইচ্ছা হ'লো। তিন দিন তাঁকে দর্শন কর্‌তে যাওয়ার উদ্‌যোগ কর্‌লাম। তিন দিনই লোকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন—মশায়, আপনি সেখানে যাবেন, সেই মাতাল বেটার কাছে! না তা হবে না। কাশীর সকলেই তাঁকে মাতাল ও ভয়ানক বদ্‌মায়েস ব'লে জানেন। কিন্তু ও সব কথা শুনেও আমার ভিতরে তেমন স্পর্শ [illegible] না। যাওয়ার জন্য প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি কারো কথা না শুনে, স্বাম[illegible] আশ্রমে গেলাম। স্বামিজীকে নমস্কার কর্‌তেই তিনি একটু হেসে বল্‌লেন— 'কি মাতাল ব্যাটার কাছে এসেছিস্‌ ব'স্‌।' তখন তিনি একটি স্ত্রীলোককে, নানা প্রকার অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে, বল্‌তে লাগ্‌লেন—'আরে তোকে শিষ্যা ক'রে কি হবে, তোর যে বয়স বেশী হয়েছে। আমি সুন্দরী যুবতী পেলে শিষ্যা করি। তোকে

দীক্ষা দিব না ; তুই চ'লে যা। অন্যের নিকটে যেয়ে দীক্ষা নে।' স্ত্রীলোকটি খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন স্বামিজী বললেন, আচ্ছা আমার কথামত চলতে পারবি ? দিব্যি কর, তা হ'লে শিষ্যা করি। স্ত্রীলোকটি বললেন 'আপনার দয়া হ'লে পারবো না কেন বাবা ?' স্বামিজী তখন বললেন—'বেশ তা হ'লে একটু অপেক্ষা কর, আমি কারণ ক'রে নেই। পরে তোকে ঐ বড় রাস্তায় নিয়ে বেইজ্জৎ করবো। তার পর তোর দীক্ষা হবে। স্বামিজী তখন চীৎকার ক'রে তাঁর ভৈরবীকে বললেন—'ওগো এক বোতল কারণ নিয়ে আয় দেখি। আর দ্যাখ্ হারামজাদি না পালায়,বাইরের দরজায় খিল দে।"

"স্ত্রীলোকটি তখন ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। স্বামিজী মন্ত্রপূত ক'রে কারণ পান করলেন। পরে আমাকে বললেন—'ওরে দ্যাখ্ এ মাতাল ব্যাটার নিকট এসেছিস্ কেন ? আমি যে মাতাল ব্যাটা, মদ খাই, কত বদমাইসি করি, তা তুই জানিস্ ? আমার বাড়ীও শান্তিপুরে ছিল, ছেলে বেলা যাত্রার দলে মেথরাণী সাজতাম, কি ভাবে নেচে নেচে তখন গান করতাম শুনবি ? এই ব'লে তিনি নেচে নেচে গান করতে লাগলেন—'নিশিতে দেখেছি স্বপন, কাল এক পুরুষ রতন।' এই গানটি করতে করতে স্বামিজীর বাহ্যজ্ঞান লোপ হ'য়ে গেল। দেখ্তে দেখ্তে মহাদেবের রূপ হ'য়ে গেলেন। স্বামিজী কাল, কিন্তু তিনি একেবারে শুভ্র হলেন। কপালে আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় অৰ্দ্ধচন্দ্র প্রকাশিত হ'লো। যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলেই দেখে অবাক্। স্বামিজী সংজ্ঞা লাভ ক'রে বললেন—'দ্যাখ্ মদ খেয়ে, মদের বোতল বগলে নিয়ে, রাস্তায় প'ড়ে থাকি, কত মাতলামি করি, যারা নিকটে আসেন কত অশ্লীল ভাবে গালাগালি করি, কখন কখন খাঁড়া নিয়ে তাঁদের কাটতে যাই, কিন্তু তবু এখানে মানুষ আসে, আমাকে বিরক্ত করে, সিদ্ধ পুরুষ ব'লে, কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসে। আমি একটু স্থির হ'য়ে থাকতে পারি না। এদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে, আমি আর কি করবো বল দেখিনি ?"

"যোগজীবনকে দেখে তিনি বললেন—'ওর এত বয়স হয়েছে, এখনও পৈতা হয় নাই, আচ্ছা আমি ওকে পৈতা দিয়া দিব।' পরে স্বামিজীই যথামত যোগজীবনকে একদিন পৈতা দিয়ে দিলেন। স্বামিজীর ওখানে আমরা সকলেই খুব আনন্দ পেলাম।'

অযাচিত দান অগ্রাহ্য করায় দুর্দ্দশা।

এবার শ্রীবৃন্দাবনে অৰ্দ্ধকুম্ভমেলার সময়ে, প্রায় ছয় সাত হাজার বৈষ্ণব সাধু, যমুনার চড়াতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিদিন সকালে তাঁহাদের সকলকে পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া

আসিতেন। এক দিন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইয়া, জমাতের মধ্যে একটি সাধু, অনাবৃত শরীরে শীতে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে একখানা কম্বল দিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—'আপনার শীতবস্ত্র কিছুই নাই, দয়া ক'রে এই কম্বলখানা গ্রহণ করুন। কম্বলখানা সাধারণ রকমের ছিল। সাধুর পছন্দ হইল না। তিনি একবার উহার দিকে চাহিয়াই, হাতে লইয়া বিরক্তির সহিত ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং খুব ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন "আরে, য্যায়্‌সা কম্বলি মেই নেহি লেতা হ্যায়, ইস্কো বিক দেও।" ঠাকুর জোড়হাতে সাধুকে অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক বলিলেন, কিন্তু সাধু উহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। ঠাকুর উহা অগত্যা অপর একটি সাধুকে দিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে, ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চড়ায়, বিষম শীতে যখন সাধুরা সকলে কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন ঐ সাধুটি শীতে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া, শীত নিবারণের জন্য ধুনি জ্বালিবার অভিপ্রায়ে কাষ্ঠ সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। কাষ্ঠ অন্য কোথাও না পাইয়া লাকড়ির গোলা হইতে কয়েকটি কুন্দা চুরি করিলেন। লাকড়িওয়ালা তাঁহাকে চোর বলিয়া পুলিশের হাতে দিল। সাধুর জেল হইল। ঠাকুর এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"অভাবে পড়্‌লে অযাচিতরূপে যা আসে, তাহাই ভগবানের দান মনে ক'রে, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কর্‌তে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য কর্‌লে, বিষম অনর্থ ঘটে। ঐ সাধু যখন কম্বল ছুড়ে ফেল্‌লেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল, ইনি বিষম গোলে পড়্‌লেন। অভিমান ক'রে শ্রদ্ধার দান অগ্রাহ্য কর্‌লে অপরাধ হয়।"

অনাহারী সাধুরপ্রতি ঠাকুরের আকস্মিক টান।

এক দিন অপরাহ্নে, ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি যমুনার চড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর সাধুদের মধ্য দিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল সাধু বৈষ্ণবদের আগ্রহের সহিত দর্শন করিয়া নমস্কারাদি করেন, ঐ দিন আর সে সকল সাধুদের স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহাদের দিকে তাকাইবারও অবসর পাইলেন না। দক্ষিণে বামে সাধুদের রাখিয়া, জমাতের মধ্য দিয়া অপর প্রান্তে একটি অকিঞ্চন সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সাধু তখন সহাস্য মুখে, প্রফুল্ল মনে কয়েকটি লোকের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন। ঠাকুর একটু সময় তাঁহার নিকটে বসিয়া, অবসর মত সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আজ আপকা সেবা হুয়া হ্যায়?" সাধু বলিলেন 'নেহি।' ঠাকুর বলিলেন, 'কাল হুয়া হ্যায়?' সাধু কহিলেন—'নেহি।' ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সাত দিন তিনি একেবারে অনাহারে আছেন। ক্রমান্বয়ে সাত দিন আহার না করিয়া, অক্লান্ত শরীরে প্রফুল্লমুখে আলাপাদি করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর অবাক্ হইয়া গেলেন। শুন্‌তে

পাই, প্রাণ গেলেও তিনি কারো নিকটে কিছু যাচ্ঞা করেন না। এরূপ সাধু বড়ই বিরল। ঠাকুর কুঞ্জে আসিয়া অমনি তাঁকে খাবার পাঠাইয়া দিলেন।

জমাতের সাধুদের অর্থাগম ও বিপদের কথা।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে পরে, জিজ্ঞাসা করিলাম—'সহস্র সহস্র সাধু কুম্ভমেলায় একত্র হন, উঁহাদের আহারাদি প্রতিদিন কি প্রকারে চলে?'

আবার বলিলেন—'সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই মহান্ত আছেন। সাধুরা আপন আপন সম্প্রদায়ের মহান্তদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সব মহান্তদের এক একজনার জমাতে তিন চার হাজার সাধুও থাকেন। রাজা মহারাজা ও বড় বড় ধনারা, ঐ সকল মহান্তদের, প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। উট, ঘোড়া ও হাতীর উপরে বোঝাই ক'রে, মহান্তরা তাঁদের ভাণ্ডার নিয়ে চলেন। আহারাদির কোন ক্লেশই সাধুদের পেতে হয় না। যাঁরা কোন মহান্তের আশ্রয় না নিয়ে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন, তাঁহাদেরই ভিক্ষাদি ক'রে চালাতে হয়।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহান্তদের সঙ্গে বিস্তর মাল এবং অর্থাদি যখন থাকে, তখন জমাতের ভিতর চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না?'

ঠাকুর বলিলেন—'তা খুব হয়।' এবার শ্রীবৃন্দাবনে অৰ্দ্ধকুম্ভের মেলাতে, একটি মহান্তের উপর ভয়ানক অত্যাচার হ'লো। তাঁর সঙ্গে তিন চার শত টাকা ছিল। হরিদ্বারে যেয়ে ঐ টাকার প্রয়োজন হবে ব'লে, তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। সাধুর সঙ্গে দশ বার জন লোক ছিলেন। একটি সাধু, যিনি মহান্তের সেবা করতেন, তিনিই মাত্র ঐ টাকার কথা জানতেন। এক দিন তিনি রুটির সঙ্গে বেশী পরিমাণে ভাং ধুতুরা মিশায়ে, মহান্তকে খাওয়ালেন; মহান্ত খেয়ে নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। ঐ সাধু তখন টাকা নিয়ে পালালেন। মহান্ত দু' দিন পর্য্যন্ত নেশায় জ্ঞানশূন্য ছিলেন। পরে আর আর সাধুরা উহা জানতে পেরে তাঁকে ঘৃত গরম ক'রে খাওয়ালেন। তাতেই মহান্তের নেশা ছুটলো। পরে প্রকাশ পেল, মহান্তের সেবকই অর্থ লোভে ঐ কাণ্ড করেছেন।

সোনা প্রস্তুতকারা সাধু।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'শুনতে পাই, সাধুদের মধ্যে নাকি এমন লোকও আছেন, যাঁরা ইচ্ছা করলে অনায়াসে সোনা প্রস্তুত করতে পারেন?'

ঠাকুর বলিলেন—'হাঁ! এবার শ্রীবৃন্দাবনে একটি সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তিনি সোনা প্রস্তুত করতেন। তাঁর প্রতি তাঁর গুরুর হু[illegible]ছিল, প্রতিদিন অন্ততঃ বারটি সাধুর সেবা

করাতে হবে। অর্থের অভাব হ'লে, বার জনার সেবার মত যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণের সোনা তিনি প্রস্তুত করতে পারবেন। অন্য প্রয়োজনে অথবা নিজের জন্য সোনা প্রস্তুত করতে তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে এসে, তিনি আবশ্যক মত সোনা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাহা প্রচার হওয়াতে, পুলিশের লোক টের পেল। এক দিন মথুরা হ'তে পুলিশ সাহেব এসে, ঐ সাধুটিকে ধরলেন। সাধু সোনা প্রস্তুত ক'রে সাহেবকে দেখালেন। সাহেব ঐ সোনা পরখ ক'রে জানলেন, অতি উৎকৃষ্ট সোনা। পরে সাহেব সোনা প্রস্তুতের প্রণালী শিখবার জন্য, সাধুকে বহু টাকার লোভ দেখালেন। দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। সাধু বললেন—'আমি দশ মিনিটের মধ্যে দশ হাজার টাকার সোনা, অনায়াসে প্রস্তুত করতে পারি। আমাকে অর্থের লোভ দেখাচ্ছেন কেন ? আমার এই বিদ্যা আমি কারুকে শিখাব না।' পরে সাহেব তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাতে লাগলেন। সাধু বললেন—'আমি ঝুঠা মাল দিয়ে প্রতারণা ক'রে অর্থ নেই কি না, আপনি শুধু তাহাই পরীক্ষা করতে পারেন। আমার বিদ্যা আমি অপরকে শিক্ষা দিব না। এ বিষয়ে কারো জেদে আমি বাধ্য হ'বো না।'

'এক দিন ঐ সাধু দাউজীর মন্দিরে এসে, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বললেন—আমার গুরুজী আমাকে হুকুম করেছিলেন—'আমার আদেশ রক্ষা ক'রে চলতে পারে, এমন একটি সাধুকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিও।' কিন্তু আমি এরূপ সাধু পাইতেছি না। অথচ এক জনকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেই হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এ বিদ্যা আপনাকে শিক্ষা দিই। এই ব'লে তিনি আমার সম্মুখেই একটু তামা নিয়ে, উহাতে একটি পাতার রস মিলায়ে, আগুনে ফেলে দিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে, উহা আগুন হ'তে তুললেন। দেখলাম, উৎকৃষ্ট সোনা হয়েছে। আমি সাধুকে বললাম—'এসব শিখে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। এই বিদ্যা আপনি জানেন ব'লে, দেখুন কত লোক আপনার পিছনে সর্ব্বদা লেগে আছে। এ সব উৎপাত নিয়ে প্রয়োজন কি ? এক 'মুট' (মুষ্টি) অন্ন ভগবান্ যখন দিবেনই, তখন আর সকলে কি দরকার ?' সোনা প্রস্তুত করার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। কিন্তু এই সাধুটি যে প্রণালীতে করলেন, তাহা খুব সহজ। এরূপ সহজে সোনা প্রস্তুত করতে আর কোথাও দেখি নাই। এ সব শিখতে নাই। এ সব শিখলে, সর্ব্বদা লোককে নানা প্রকার উৎপাতে, আপদে বিপদে পড়তে হয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত চুলায় যায়। ভগবানের কৃপা যাঁরা লাভ করতে

চান, এ সকল তাঁদের পক্ষে বিষম প্রলোভন। এ সমস্ত প্রলোভন উপস্থিত হ'লে থু থু দিয়ে অগ্রাহ্য কর্‌তে হয়।

সুখময় বৃন্দাবন

২৫শে চৈত্র।

শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাত্মাদের কথা, ঠাকুর অনেক সময় বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে, একটি বৈষ্ণব আশ্চর্য্যরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঠাকুর আজ তাঁহার কথা বলিলেন—'এক দিন একটি মহোৎসব উপলক্ষে, বৃন্দাবন পরিক্রমা ক'রে, সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে লাগলেন। গানের পদ ছিল—'সুখময় বৃন্দাবন যমুনাপুলিন।' একটি বৈষ্ণব মহাত্মা, সঙ্কীর্ত্তনে মহাভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হ'লেন। তিন দিন তিন রাত্রি তিনি একই অবস্থায় রইলেন। বাবাজীর মগ্ন অবস্থার সময়ে, আমি তাঁর বুকের উপরে কয়েকবার কাণ পেতে শুন্‌লাম ভিতরে পরিষ্কার শব্দ উঠ্‌ছে 'সুখময় বৃন্দাবন।' বাবাজী ঐ অবস্থায়ই দেহ রাখ্‌লেন।'

অজ্ঞাত সাধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণে বিপদ।

এবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায়, পাহাড়পর্ব্বত হইতে অনেক মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ আসিবেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানহইতেই সাধু সন্ন্যাসীরা এই মহামেলায় আগমন করিবেন, এরূপ একটা কথা পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানহইতে অনেক ভদ্রলোক এবং স্কুলের ছেলেরাও হরিদ্বারে এই মেলায় উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তিন চার জন স্কুলের ছেলে, কোন সন্ন্যাসীর বাহিরের বেশ এবং সাধুতার আড়ম্বরে ভুলিয়া, তাঁহাকে মহাপুরুষ স্থির করিয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদের দীক্ষা দিয়াই, বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইয়া কৌপিন পরিতে দিলেন এবং সেবাকার্য্যে লাগাইলেন। ভদ্রসন্তান কয়টি নিয়ত বাসন মাজা, লাকড়ি কাটা, জল টানা ইত্যাদি পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী উঁহাদের পীড়িতাবস্থা দেখিয়াও, অতিরিক্ত পরিশ্রমহইতে অবসর দিলেন না, বরং আরও তাড়না করিতে লাগিলেন। উঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথামত না করিলে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিবেন, এরূপ ভয়ও দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছেলে কয়টি যেন পলাইয়া না যান, সে জন্য তাঁহাদের উপরে অন্য অন্য সন্ন্যাসী শিষ্যদের দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। উঁহাদের কাজ কর্ম্মে কোনপ্রকার শিথিলতা দেখিলে, তাঁহারাও উঁহাদের উপরে অত্যাচার করিতেন। পীড়িত শরীরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কার্য্য দিনরাত করিবার সামর্থ্য নাই, পলাইবারও উপায় নাই। সুতরাং ছেলে কয়টি বিষম বিপদে

পড়িলেন। এক দিন ঠাকুর হঠাৎ ঐ সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ছেলে কয়টি ঠাকুরকে দেখিয়া, কাঁদিয়া তাঁহাদের সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ঠাকুর উঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী, ঠাকুরের অনুরোধ গ্রাহ্য কর্‌লেন না। নানাপ্রকার গালাগালি দিয়া, তেজ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—'এ লোক হামারা চেলা হুয়া হ্যায়, মন্ত্র লিয়া হ্যায়, হাম কভি এ লোকন্‌কো ছোড়েঙ্গে নেহি।' ঠাকুর চলিয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উঁহাদের উদ্ধার সাধন করাইলেন। আরও কয়েকটি স্কুলের ছেলে ঐ প্রকার ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, অজ্ঞাত-কুলশীল সন্ন্যাসীদের নিকট দীক্ষা লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বিপন্ন ছেলে কয়টির কথা বলিয়া, তাঁহাদের সেই সঙ্কল্প নিরাপৎ নয়, জানাইলেন এবং অবিলম্বে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

অনধিকারীর গৈরিক ধারণে অপরাধ।

আর একদিন কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, গৈরিক বসন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস বা অন্য কোন আশ্রম গ্রহণ করেন নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দীক্ষাও হয় নাই। ঠাকুর তখন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা গৈরিক বসন গ্রহণ করেছেন কেন? গৈরিক ধারণের একটা উপযোগিতা আছে। অনধিকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৈরিক গ্রহণ করেছেন জান্‌তে পার্‌লে, এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁরা সহ্য কর্‌বেন না। চিম্‌টে দিয়ে, ভয়ানকরূপে প্রহার ক'রে ঐ বসন ছিনিয়ে নিবেন।'

ভদ্রলোকগুলি বল্‌লেন—'মশায়, সাদা কাপড় দু' চার দিনেই ময়লা হ'য়ে যায়। হাতে পয়সা নাই যে ধোয়ায়ে লই, তাই এই রং ক'রে নিয়েছি।'

ঠাকুর তাঁহাদের কথা শুনিয়া বার আনা পয়সা তাঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন—'কাপড় ধোয়াবার জন্য এই কয় আনা পয়সা নেন্। আজই যেয়ে গৈরিক ত্যাগ করুন।'

ভদ্রলোককয়টি তাহাই করিলেন। অবিলম্বে গৈরিক ত্যাগ করিয়া সাদা বস্ত্র পরিলেন।

কুম্ভমেলার কথা।

কুম্ভমেলায় অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মিলনের কথা শুনিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'গঙ্গাস্নান করিবার জন্যই কি সাধু মহাত্মারা কুম্ভমেলায় আসেন?'

ঠাকুর বলিলেন—'কুম্ভযোগে তীর্থস্থানে গঙ্গাস্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য, তাহা ত আছেই। কিন্তু, কুম্ভমেলার উদ্দেশ্য শুধু স্নান নয়। এই মেলা তিন বৎসর অন্তর এক একটি স্থানে হ'য়ে থাকে। হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে এবং উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভযোগ

উপলক্ষ ক'রে নানা স্থানের, এমন কি পাহাড় পর্ব্বতবাসী মহাপুরুষেরাও নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র হন। কুম্ভযোগটি সাধু মহাত্মাদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হওয়ার সময় মাত্র। সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই ইহা জানেন। সাধুদের সাধন ভজনে যে সকল সঙ্কট, সংশয় উপস্থিত হয়, এই সময়ে মহাত্মা মহাপুরুষদের নিকটে তাহা ব্যক্ত ক'রে, মীমাংসা ক'রে নেন্।'

'সাধন ভজন বিষয়ে যার যা প্রয়োজন, সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করাই এ মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময়ে মহাপুরুষেরা একত্র হ'য়ে সাধু সন্ন্যাসীদের এবং দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মভাব কিরূপ তাহার খবর নেন্। যে প্রকার ব্যবস্থা কর্‌লে, যে দেশের লোকের কল্যাণ হয়, তাই স্থির ক'রে এক এক দেশের ভার এক একটি মহাত্মার উপর অর্পণ ক'রে প্রস্থান করেন। এবার চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার, মহাপুরুষেরা, রামদাস কাঠিয়া বাবার উপরে দিয়েছেন। তাঁহাকে মহাপুরুষেরা 'ব্রজবিদেহী মহান্ত' উপাধি দিলেন। এই প্রকার ভারতবর্ষের সকল দেশের জন্যই এইরূপ এক একজন মহাত্মা নির্দ্দিষ্ট আছেন। দেশে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, তাঁহাদিগকে সমস্ত ভার গ্রহণ কর্‌তে হয়। সর্ব্বদা খাট্‌তে হয়।'

আমি অমনি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মসংস্থাপনের ভার কাহার উপরে আছে? ঠাকুরকে এই প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সুতরাং আমাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

শান্তিসুধার মাতৃশোকে ঠাকুরের সান্ত্বনা।

২৩শে চৈত্র।

শ্রীবৃন্দাবনে মাঠাকৃরুণের দেহত্যাগের বিষয় বিস্তারিত জানিবার একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না, সাহসও পাইতেছি না। মাঠাকৃরুণের দেহত্যাগের পরে, ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে শান্তিসুধা প্রভৃতিকে উহা জ্ঞাত করাইতে স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিস্তারিত কিছুই লেখা নাই। ঐ পত্রখানা পাইয়া আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাভগিনীরা ঐ ঘটনাটি তখন শান্তিসুধাকে বলিতে সাহস পাইলেন না। পত্রখানা গোপনেই রাখিলেন। ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া শান্তিসুধাকে ঐ খবর দিবেন, সেই সময়ে তিনি সান্ত্বনাও দিতে পারিবেন, এইরূপ ভাবিয়া গুরুভ্রাতাভগিনীরা সকলে নীরবে রহিলেন। ঠাকুর এই প্রকার লিখিয়াছেন—

"ওঁ হরি"

'কল্যাণবরেষু

গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে। কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্যলাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে সে যেন শোক না করে। ইহা শোকের ব্যাপার নহে, অতি আনন্দের কথা। বহু ভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়।'

আগামী ২১শে ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে উৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব। শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়াইয়া দেয়।'

'মা শান্তিসুধা! শোক করিও না, আনন্দ কর, যত শীঘ্র পারি আমরা যাইতেছি।'

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে, শান্তিসুধা অষ্টম মাস গর্ভ সময়ে সুলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ছেলে লইয়া শান্তিসুধা পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এবং অচিরে পিতামাতা আসিবেন ভাবিয়া, উল্লসিত মনে, তাঁহাদের আসিবার দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে ঠাকুর হরিদ্বারহইতে কলিকাতা হইয়া, অবিলম্বে ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। যোগজীবন, কুতুবুড়ি, দিদিমা প্রভৃতি সকলেই, আশ্রমে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'বাবা! মা কই?' ঠাকুর বলিলেন—'শান্তিসুধা! আমি তোমার মাকে শ্রীবৃন্দাবনে রেখে এলাম। তিনি এলেন না, ওখানেই রইলেন। আমরাও কিছুকাল পরে আবার সেখানে যাব।

শুনিলাম, ঐ সকল কথা শুনিয়া শান্তিসুধা পরিষ্কার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঠাকুরও শান্তিসুধাকে সম্মুখে বসাইয়া মহাভারতের ও পুরাণাদির উপাখ্যান বলিতে বলিতে মাঠাকুরুণের দেহত্যাগের বিষয়ও বলিয়া ফেলিলেন। শান্তিসুধা শুনিয়াই মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ঠাকুর উঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া চেতনা করিলেন। শান্তিসুধার শরীর খুব অসুস্থ ছিল; সুতরাং মাতৃশোকে মস্তিষ্কের অবস্থা বিষম বিকৃত হইবে, সকলেই এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কিছুই হইল না। ঠাকুরের শীতল করস্পর্শে শান্তিসুধার ভিতর এতই ঠাণ্ডা হইয়া গেল যে, মাতার দেহত্যাগ জনিত দারুণ যন্ত্রণাদায়ক শোকও উঁহাকে তেমন কিছুই স্পর্শ করিতে পারিল না।

মাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবরণ।

আজ মধ্যাহ্নে, আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় বসিলেন। আমি তখন মাঠাকরুণের দেহত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে গেলে আর উনি ফিরবেন না জেনেই, ওঁর যাওয়ার পূর্ব্বেই কতবার নিষেধ পত্র লিখেছিলাম; কিন্তু তা উনি শুন্‌লেন না। আমার শরীর অসুস্থ জেনে, তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পঁহুছিবার পরেও ওঁকে ঢাকা পাঠাতে কত কৌশল করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই উনি এখানে এলেন না। দেহত্যাগ যেদিন হবে, পূর্ব্বেই টের পেয়েছিলেন। দু'বার দাস্ত হ'তেই শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌লো। ঐ সময়ে পরমহংসজী আমাকে বল্‌লেন—'তুমি অবিলম্বে কুঞ্জ হ'তে অন্যত্র চ'লে যাও; তুমি এখানে থাক্‌লে ওঁকে নেওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হ'য়ে গেলে কুঞ্জে এসো।' আমি পরমহংসজীর আদেশ মত অমনি আসন হ'তে উঠ্‌লাম। পাশের ঘরে উনি ছিলেন, একবার দেখে যাই মনে ক'রে, ঐ ঘরে গেলাম। উনি সবই বুঝেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ঐ সময়ে কাছে থাকি; তাই হাতে ধ'রে টেনে পাশে আমাকে বস্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লেন। কিন্তু পরমহংসজীর আদেশ মত আমি আর অপেক্ষা না ক'রে কুঞ্জ হ'তে চলে গেলাম। পরে উঁহার দেহত্যাগ হয়েছে জেনে, কুঞ্জে এসে উপস্থিত হলাম।'

শুনিলাম, ঠাকুর মাঠাকরুণের দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কুঞ্জের গুরুভ্রাতাভগিনীরা মাঠাকরুণের শবদেহ বারেন্দায় রাখিয়া চাৎকার করিয়া কান্দিতে-ছিলেন। ঠাকুর সেই স্থানে যাইয়াই যোগজীবনকে বলিলেন—'যোগজীবন! মৃতদেহ এতক্ষণ রেখেছিস্ কেন? যমুনার তীরে নিয়ে সংস্কার ক'রে আয়।' এই বলিয়া ঠাকুর ঐ দিকে আর না তাকাইয়া আপন আসনটি বিছাইয়া বসিলেন। যেমন অন্যান্য দিন থাকেন, ঠাকুর তেমনই আসনে একভাবে বসিয়া রহিলেন। কোন প্রকার বৈলক্ষণ্যই দৃষ্ট হইল না। যোগজীবন, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীধর, অশ্বিনী ও সতীশ প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা মায়ের পরম পবিত্র দেহ অবিলম্বে যমুনাতীরে লইয়া গিয়া, কেশীঘাটে অগ্নিসাৎ করিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় মত চিতা নির্ব্বাণের পরে, যোগ-জীবন মাঠাকরুণের তিন খণ্ড অস্থি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে একখানা শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত করিলেন। অপর দুই খণ্ড হরিদ্বারে ও গেণ্ডারিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাখিলেন।

ভক্তবিচ্ছেদে মহাত্মাদের অসাধারণ জ্বালা।

মাঠাকরুণের শোকে দিদিমা দিনরাত দগ্ধ হইতেছেন। সময়ে সময়ে ঠাকুরের কৃপায় দিদিমা মাঠাকরুণের দর্শন পাইয়া থাকেন। তাহাতেই রক্ষা, তা না হইলে এতদিনে তিনি পাগল হইতেন।

দিদিমা যখন 'যোগমায়া' 'যোগমায়া' বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে থাকেন, সমস্ত আশ্রম তখন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। শুনিয়া, আমাদেরও শরীর অবসন্ন হইয়া আসে। দিদিমার চীৎকার শুনিয়া, আমরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিলে, ঠাকুর নিষেধ করিয়া বলেন—'শোকের সময়ে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে দিতে হয়, তাতে শোক পাতলা হ'য়ে যায়। শোক পেয়ে কাঁদ্‌তে না পেরে অনেকে পাগল হয়। এমন কি, অনেকের উৎকট রোগ হ'য়ে মারাও পড়ে।'

মাঠাকুরুণের নাম লইয়া, দিদিমা যখন হৃদয়-বিদারক শব্দে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন, সেই সময়ে, ঠাকুরের মুখশ্রীর কোন প্রকার ভাবান্তর হয় কি না, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমি তাহা লক্ষ্য করিতে থাকি। একটি দিনও ঠাকুরের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'যাহারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, কারো জন্যই কি তাঁহারা শোক যন্ত্রণা পান না?'

ঠাকুর বলিলেন—'হাঁ খুব পান। ভক্ত বিচ্ছেদে তাঁরা যে জ্বালা ভোগ করেন, তার আর কোথাও তুলনা হয় না। আত্মার সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ জন্মে, তাঁদের বিচ্ছেদে যে যন্ত্রণা, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে, তাহা কল্পনা করে। সে জ্বালার আঁচও সাধারণের সহ্য কর্‌বার সামর্থ্য নাই। সে অতি বিষম।'

আমি বলিলাম—'যাঁহারা ভক্ত বা মহাপুরুষ, তাঁহাদের শোকের কোন লক্ষণ কি বাইরে প্রকাশ পায় না?'

ঠাকুর বলিলেন—'কখন হয়, কখন বা একেবারেই হয় না। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর, রূপ সনাতনাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণের বাইরে কোন প্রকার শোক চিহ্ন না দেখে, অনেকের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, এঁরা আবার কেমন ভক্ত? এক দিন একটি বৃক্ষতলে ভাগবৎ পাঠ হ'চ্ছে। সকলেই পাঠ শুন্‌ছেন। হঠাৎ ঐ বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্র, রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়্‌লো। পাতাটি গায়ে পড়ামাত্র, দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌লো। তখন উহা দেখে সকলে বুঝ্‌তে পার্‌লেন, মহাপ্রভুর বিরহ-অগ্নিতে তাঁর ভক্তগণ কি প্রকার দগ্ধ হচ্ছেন।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'কত কথাই ত এইরূপ শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থই কি ওরূপ হয়? শোকেতে মানুষের শরীরে যথার্থই কি উত্তাপ উঠে?'

ঠাকুর বলিলেন—'খুব উঠে। শ্রীবৃন্দাবনে ওঁর (যোগমায়াঠাকুরাণীর) দেহত্যাগের পরে, কুতু অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন। কুতুকে সান্ত্বনা কর্‌তে, উঁহার পিঠে যেমনই হাত দিয়েছি, অমনি কুতু 'উঃ উঃ' ক'রে চম্‌কে লাফায়ে উঠ্‌লেন। আমি তখনই বুঝ্‌লাম। একটু পরেই দেখা গেল, কুতুর পিঠে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ, আগুনে-পোড়া ফোস্কার মত উঠে পড়েছে।'

শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।